সাবিত্রী রায়

মডার্ণ পাবলিশার্স

প্রকাশক
শরৎ দাস
মডার্ণ পাবলিশার্স
৬, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ, ১৩৫।

দাম
তিন টাকা আট আনা

মুদ্রাকর
কালীপদ চৌধুরী
গণশক্তি প্রেস, ৮ই, ডেকার্স লেন
কলিকাতা ১

পিসীমা, মা ও বাবা-কে

একটা প'ড়ো ভিটা,—বহুকাল হইল উহা হইতে মানুষের বাস উঠিয়া গিয়াছে। ভিটাটা আগাছা ও বন্যগুল্মে ভরিয়া গিয়াছে। কিছুদূরে একটা ছোট দীঘি। কোন কালে তার সমৃদ্ধি ছিল, তাহারই প্রমাণ একটা ভাঙ্গা বাঁধান সিঁড়ির ধ্বংসাবশেষ। কৃষ্ণাভ শেওলায় ফাটলধরা সিঁড়িটা নিজের রং হারাইয়া ফেলিয়াছে।

দীঘিটার প্রায় তিনদিক জুড়িয়া মস্ত মস্ত বেত ঝোপ। কাঁটা ঝোপগুলি মাটি পর্য্যন্ত ঢাকিয়া ফেলিয়া একটা ভয়াবহ অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছে। ঝোপের ভিতর হইতে দুই একটা পাখীর ডানা ঝাপটার খুট খুট শব্দ শোনা যায়, নিশাচরের অশুভ ইঙ্গিতের মত।

দীঘি ও ছাড়া ভিটাটার মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটা তেঁতুল গাছ—বিস্তর শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সবেমাত্র তেঁতুলে পাক ধরিয়াছে। ছড়ায় ছড়ায় তেঁতুল ঝুলান একটা মস্ত ডাল ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে পরিত্যক্ত ভিটাটার উপর।

তাহারই ঠিক নীচে বহুক্ষণ ধরিয়া একটি ছোট ছেলে প্রতীক্ষমান দৃষ্টিতে কাহার উদ্দেশ্যে যেন তাকাইয়া আছে। তাহার চোখে মুখে

স্পষ্ট ভয়ের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। নিঝুম নিস্তব্ধ ভিটাটার দিকে ভাল করিয়া তাকাইতেও সাহস হইতেছে না—যদি কিছু দেখিয়া ফেলে।

এই ভরদুপুরেইত' ভূতেরা সব গরু সাজিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় ; তারপর সুবিধা পাইলে ছোট ছেলেমেয়েদের ঘাড় মটকায়।

তাহার ছোট্ট বুকটা টিপ টিপ করিতে থাকে। কোনও দিকে তাকাইতেও যেন সাহস হয় না।

হঠাৎ তাহার মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

"এত দেরি করলি কেন—আমি সেই কখন থেকে একা একা দাঁড়িয়ে আছি!"

"কি করবো—দাদুভাই নাক ডাকতে থাকলেত' আসবো।" বিরক্তির সুরে উত্তর দেয় আট নয় বছরের একটি মেয়ে। কোমরে সাড়ীব আঁচল শক্ত করিয়া জড়ানো—দুইহাতে দুইটা পিতলের চুড়ি।

আঁকশীটা খুজিয়া বাহির করিয়া মেয়েটী বলে—"চল এবার তেঁতুল পাড়ি।"

"দিদি নুন এনেছিস্?"।

একটা উঁচু ঢিবির উপর দাড়াইয়া ছোট্ট আঁকসীটা দিয়া তেঁতুল পাড়িতে পাড়িতে পাকা গিন্নীর মত সুর করিয়া শঙ্করী ভাইকে ধমকাইয়া উঠে, "হ্যাগো হ্যা। এত ছোঁছলা ছেলে—বাপরে। আগে তেঁতুল পেড়েই'নি—তারপরত' নুন।"

সাধ্যমত পা উঁচু করিয়া আঁকসী দিয়া তেঁতুলের ছড়াগুলি টানিয়া নামায় সে। টানের চোটে মাথার ঝাকড়া চুলগুলি বার বার মুখের উপর আসিয়া পড়ে। ছোট ভাই দুখু নীচে ছুটাছুটি করিয়া সেগুলি জড়ো করিতে থাকে।

তেঁতুল পাড়া শেষ হইয়া গেলে শঙ্করী তার সাড়ীর ছোট্ট আঁচল ভর্ত্তি করিয়া লইয়া ভাইকে বলে, "চল এবার।" ভয়ে ভয়ে দুখু দিদিকে বলে, "দিদি বাড়ী নিয়ে যেওনা এগুলো। মাসী তা'হলে মারবে তোমাকে।"

"বোকা কোথাকার! বাড়ী কেন নিয়ে যাব? বুড়ীমাকে দিয়ে যাব। দেখিস আজ কি চমৎকার একটা গল্প বলবে!"

দুইজনে ছাড়াভিটাটা হইতে বাহির হইয়া সামনের দিকে চলিতে থাকে।

চৈত্রমাসের রোদ॥ মাটি আগুনের মত তাতিয়া উঠিয়াছে। ছোট্ট নরম পাগুলি যেন পুড়িয়া যায়।

"দুখু, মাসীকে আবার বলে দিসনা যেন। তুইত যা বোকা ছেলে—একটু ধমকালেই বলে ফেলিস। আর মার খাওয়ার বেলায়ত' আমি।" শঙ্করী ভাইকে সতর্ক করে।

"আমি বুঝি বলি কখনও।" দুখু অভিমানের সুরে বলে।

এরই মধ্যে দুইজনে বুড়ীমার বাড়ী আসিয়া পড়ে। এতক্ষণে দুখুর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠে—যাক, গরুভূতে আর নাগাল পাইবেনা তাহাদের। বড়রা থাকিলেত' আর ভূত ঘেষিতে পারে না।

বুড়ীমার বাড়ী যাইবার পথে একটা আমগাছের গুঁড়ি পড়িয়া আছে। বাঁ দিকেই পুকুর। দুই ভাইবোন আসিয়া গুঁড়িটার উপর পা ঝুলাইয়া বসে।

শঙ্করী ভাইকে একটা ছড়া তেঁতুল দিয়া, নিজেও একটা খোসা ছাড়াইয়া লয়।

"মাত্র একটা।" দুখু খুশি হয় না।

সাড়ীর আঁচলে বাঁধা নুনের মোড়কটা খুলিতে খুলিতে শঙ্করী ভাইকে

বকুনি দেয়, "না আর পাবেনা তারপর জ্বর হ'য়ে আবার বিছানায় পড়।"

তেঁতুল খাওয়া শেষ হইলে শঙ্করী পুকুরে নামিয়া হাত ধুইয়া আসে। আঁচল ভরিয়া জল আনিয়া ভাইটির হাতও ধোওয়াইয়া দেয়।

"চল এবার বুড়ীমার বাড়ী।"

ছোট্ট একখানি মাটির ঘর—ছনের ছাউনি উপরে। তারই দাওয়ায় বসিয়া বৃদ্ধা কাঁথা শেলাই করিতেছে। দাওয়াটা জুড়িয়া কাঁথা বিছান। বাবুদের বৌরা বুড়ীকে দিয়া কাঁথা শেলাই করায়। ঘরে বসিয়াই তাহার সামান্য কিছু উপার্জ্জন হয়। লাল নীল সূতা দিয়া সে কাঁথায় নক্সা তোলে—বৌ কাপড়ের পাড় হইতে সূতা খুলিয়া দেয়।

বাহিরে উঠানে রৌদ্র খাঁ খাঁ করে। ভাইবোনে সেখানে হাজির হয়।

"বুড়ীমা তোমার জন্য তেঁতুল পেড়ে এনেছি। মাসীকে আবার বলে দিওনা কিন্তু!"

বৃদ্ধা তাকাইয়া দেখে—শিশু দুইটীর চোখ মুখ রোদে ঘুরিয়া ঘুরিয়া লাল হইয়া উঠিয়াছে। ব্যাকুল হইয়া সে বলে—"বলেইত' দেবো। এই রোদ্দুরে মানুষ ঘর থেকে বার হয়। দাদু বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে না?"

শঙ্করী ভয়ে ভয়ে বলে "কিন্তু তুমি বলেছিলে গল্প বলবে; তাইত এলাম।"

দুখুও বুড়ীমার কথা শুনিয়া ভীত হইয়া উঠে—মাসীকে যদি সত্যি বলিয়া দেয়!

সে কান্নার সুরে বলে—"বুড়ীমা, মাসীকে বলে দিওনা; তা'হলে দিদিকে মারবে।"

তাহার চোখ ছল ছল করিয়া উঠে।

তাহার অবস্থা দেখিয়া বৃদ্ধা হাসিয়া ফেলে, "নারে আমি বলবোনা। কিন্তু তোমরা এই রোদে রোদে আর কোনদিন ঘুরোনা বাছা।"

"সেই গল্পটা এবার বল—দুয়োরাণী সুয়োরাণীর গল্পটা।" শঙ্করী কিছুটা অভয় পাইয়া বলে।

"না না—পক্ষীরাজ ঘোড়ায় রাজপুত্রের গল্প।"—দুখু আবদার ধরে।

শঙ্করী বাধা দেয় ভাইকে, "এমন বোকা ছেলে আর দেখিনি! রোজ রোজ এক গল্প শোনা।"

রাজপুত্রের গল্প শুনিতে চাহিলে তাহার মূর্খত্ব প্রমাণ হয় দিদির কাছে, কাজেই দুখু আর প্রতিবাদ করিতে সাহস পায় না। সে চুপ করিয়া যায়। কিন্তু তাহার কাল চোখ দুইটি অভিমানে ছল ছল করিয়া উঠে—দিদিকে সে এত ভালবাসে আর দিদি তাহার কথা একটুও শোনে না।

গল্প শোনা শেষ হইলে দুইজনে বাড়ীর পথে চলিতে থাকে। রোদ পড়িয়া গিয়াছে এতক্ষণে। কল্পনাবিলাসী শিশুমনগুলি এক অজানা অচেনা গল্পরাজ্যে ছুটিয়া চলে। পক্ষীরাজ ঘোড়ার চাইতেও অনেক অনেক বেশী দ্রুতগতিতে। কত নদী প্রান্তর বনবনানী ডিঙ্গাইয়া একেবারে নিরালা রাজকন্যার স্বপ্নপুরীতে।

বাড়ী ঢুকিতে ঢুকিতে শঙ্করী আবার ভাইয়ের কানে কানে বলে—"মনে আছে ত?"

দুখু মাথা নাড়িয়া নিঃশব্দ উত্তর জানায়।

দাদুর ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহার ঘরে কাহার যেন গলা শোনা যায়। দুইজনে চুপি চুপি ঘরের দুয়ারে গিয়া দেখে একজন অচেনা

ভদ্রলোক। তাহাদের পায়ের শব্দ শুনিয়া দাদুভাই ডাক দেন, "এইযে 'দাদুদিদিরা! শুনে যাও ত একটু। এতক্ষণ বুঝি গল্প শুনে আসা হ'ল!"

"প্রণাম কর"—নূতন ভদ্রলোকটিকে দেখাইয়া দাদু ইঙ্গিত করেন।

দুইজনে নত হইয়া আগন্তুক ভদ্রলোকটীর পায়ের ধূলা নেয়।

সন্ধ্যা হইতে না হইতেই দুখুর চোখমুখ লাল হইয়া গা গরম হইয়া উঠে। শঙ্করীর মুখ শুকাইয়া যায়। সে বারে বারে ভগবানকে ডাকিতে থাকে, "হরিঠাকুর, দুখুর যেন জ্বর না হয়। আমি আর তেঁতুল পারবোনা।"

কিন্তু তাহার সকল প্রার্থনা ব্যর্থ করিয়া দুখু বমি করিতে আরম্ভ করে। বমির শব্দে মাসী দৌড়াইয়া আসে। বমির ভিতর তেঁতুলের ছিবড়া দেখিয়া গর্জ্জিয়া উঠে, "আবার তেঁতুল খেয়েছিস তোরা?"

দুখুর গায়ে হাত দিয়া আঁতকাইয়া উঠে, "উঃ—জ্বরে যে গা পুড়ে যাচ্ছে।"

কাঁথা গায় দিয়া দুখুকে শোয়াইয়া দেয় তাড়াতাড়ি। মা হারা ছেলেমেয়ে দুইটীকে মাসীই বড় করিয়া তুলিয়াছে। বিধবা হওয়ার পর হইতে সেও পিত্রালয়েই আছে।

বিপত্নীক পিতার পরিচর্য্যা করা ও এই শিশু দুইটিকে লালনপালন করা—এই তাহার একমাত্র কাজ। এই এখন তাহার নিজ সংসার। দুখু ও শঙ্করী সাজনপুরে মামার বাড়ীতেই মানুষ।

সাতদিন পর দুখুর জ্বর ছাড়ে। এখনও ভাত দেওয়া হয় নাই—

শঙ্করী বসিয়া বসিয়া ভাইকে গল্প শোনায়। আজ সে একটা নূতন গল্প শুনিয়া আসিয়াছে।

হঠাৎ তাহার কি একটা কথা মনে পড়িয়া যায়। সে ভাইয়ের কাছ ঘেসিয়া চুপি চুপি বলে—"জানিস দুখু তুই ভাল হলে তোকে দাদুভাই মার কাছে পাঠিয়ে দেবে। সেখানে তোকে নাকি রাজপুত্র করে দেবে।"

•

লক্ষ্মীপুরের জমিদাররা দুই শরিক। দশআনির হরিশঙ্কর রায়ের দুই পুত্র—শিবশঙ্কর আর গৌরীশঙ্কর।

ছয়আনির উমাশঙ্কর রায় হরিশঙ্করেরই ভ্রাতুষ্পুত্র। শিশু বয়সেই সে পিতামাতা দুজনকেই হারাইয়াছে। পিতৃব্য হরিশঙ্করই নিজ সন্তানের ন্যায় উমাশঙ্করের অভিভাবকত্ব করেন।

উমাশঙ্করের আঠার বৎসর পূর্ণ না হইতেই হরিশঙ্কর রায় তাহার এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর বার বছরের ভ্রাতুষ্পুত্রী বনলতার সহিত তাহার বিবাহ দেন। লক্ষ্মীপুরের ছোট শরিকের নূতনবৌর রূপের প্রশংসায় দশ গ্রামের লোক সাতমুখ হইয়া উঠে, "সুন্দরী একেই বলে। লক্ষ্মীপ্রতিমার মত রূপ।"

কিন্তু বনলতার ভাগ্যবিধাতা তাহার প্রতি ক্রূরদৃষ্টি হানিল। দশমাস যাইতে না যাইতেই উমাশঙ্করের মৃত্যু হয়।

হরিশঙ্কর শোকে ভাঙ্গিয়া পড়েন। কিন্তু বালিকা বনলতা কিছুই বুঝিল না—তাহার জীবনে যে কি নিদারুণ অভিসম্পাত পড়িল।

ক্রমে শিবশঙ্করেরও বিবাহের বয়স হইল। এইবার হরিশঙ্কর রায় শুধু রূপ দেখিয়াই পুত্রবধূ আনিলেন না। সুপণ্ডিত জ্যোতিষী দিয়া ভাবীবধূ চারুবালার হাত গণনা করাইয়া সর্ব প্রকারে সুলক্ষণা কন্যার সঙ্গেই ছেলের বিবাহ দিলেন।

শিবশঙ্করের বিবাহেব অল্পদিন পরেই হরিশঙ্কর রায় মারা যান।

ওদিকে মেয়ের নিরাভরনা বৈধব্য বেশ দেখিয়া বনলতার মা চোখের জল ফেলেন আব মেয়ের সংসার গোছান।

এত ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবে কে? তাহারই কপাল পোড়া—না হইলে মেয়ের আজ কিসের অভাব ছিল!

দীর্ঘনিশ্বাসের ভিতর দিয়া বছরের পর বছর কাটিয়া যায়। ক্রমে বনলতাও বড় হইয়া উঠে—তাহার দেহের শ্রী যেন ফাটিয়া পড়ে। একপিঠ কালচুল —কি নিখুঁত দেহের গড়ন!

বনলতা দেবর আর দেবরপত্নীকে দেখে—আর নিজের ভাগ্যেব কথা স্মরণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। সাজসজ্জায় স্বামীসোহাগে ভবপুর ছোটবৌ। আর এত রূপ নিয়াও তাহার ভাগ্য কি ভয়ানক ফাঁকিতে ভরা।

সুন্দর সৌম্য চেহারা শিবশঙ্করের। প্রশস্ত ললাট। কথায় বার্ত্তায় আভিজাত্যের স্পষ্ট পৌরুষভাব।

লোকে বলে—উমাশঙ্কর নাকি দেবতুল্য সুন্দর ছিল। কিন্তু বনলতা অনেক চেষ্টা করিয়াও স্বামীর চেহারা মনে করিতে পারে না।

শিবশঙ্কর বৌঠানকে শ্রদ্ধা করে। বালবিধবা ভ্রাতৃবধূর প্রতি সহানুভূতিভরা ব্যবহার দেখাইতে সর্বদাই উন্মুখ। কিন্তু বৃদ্ধা জেঠীশাশুড়ী 'সোয়ামীথাকী' বৌটাকে দুইচক্ষে দেখিতে পারে না।

"আহা রূপসী না—কপালপোড়া রাক্ষসী।"

উমাকে নিজে বুকে করিয়া বড় করিয়াছিলেন তিনি।

বনলতা শোনে সব। স্তব্ধ হইয়া থাকে সে, কি উত্তর আছে তাহার!

দশআনির নায়েবই দুই শরিকের মহাল দেখাশুনা করে। একদিন শিবশঙ্করকে ডাকিয়া বলে "একটা কথা—ছয়আনির একজন আলাদা নায়েব নিযুক্ত করা দরকার। মহালও আলাদা। তাছাড়া ছোটকর্ত্রীরও এখন সব বুঝে নেবার বয়স হ'য়েছে। এখন তাঁর একজন আলাদা নায়েব থাকাই ভাল—না হ'লে আপনার দুর্নাম হ'তে পারে, এভাবে চললে।"

শিবশঙ্করও তলাইয়া দেখে—কথাটা ঠিকই। পাঁচজনের মুখ ত আর বন্ধ করা যাইবে না। কি দরকার ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে থাকিয়া?

সেই হইতেই শশীনাথকে ছয়আনির নায়েব নিযুক্ত করা হয়। নূতন নায়েব ছয়আনির কাগজপত্র সব বুঝিয়া লয়।

কাছারি ঘর ঝাড়িয়া পুঁছিয়া নূতন ফরাশ পাতা হয়। বহু বছর পর আবার ছয় আনির কাছারিঘর মাঝি, বাগ্‌দীদের হাকডাকে, প্রজাদের সেলাম ও স্তোতবাক্যে সরগরম হইয়া উঠে।

এতদিনে বনলতা একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করে ভিতরে ভিতরে। প্রজারা আসিয়া তাহাকে কর্ত্রীমা বলিয়া সেলাম জানাইয়া যায়। বনলতার আভিজাত্যব্যঞ্জক সুডোল গ্রীবাতে জমিদার পত্নীর তেজস্বিতা ফুটিয়া উঠে।

মুখরা জেঠীশাশুড়ীর পায়ে মাথা নত করিয়া থাকিবার দিন শেষ হইল এতদিনে।

জেঠীশাশুড়ীর ছেলেদের চাইতে কোন অংশে ছোট নয় বনলতা। পূর্ণস্বাধীন সে।

লক্ষ্মীপুরের জমিদারবাড়ীর কর্ত্রী সে—কিসের জন্য সাতগ্রামের লোকের কাছে মাথা নত করিয়া থাকিবে বনলতা? বৈধব্য? সে দুঃখ তাহার অন্তর্দেশের। সেজন্য আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া সারাজীবন পাত করিতে হইবে নাকি? বনলতার ব্যক্তিত্ব সজাগ হইয়া উঠে। তবু একটা অতি সূক্ষ্ম ঈর্ষা কুণ্ডলী পাকাইয়া মনের আনাচে কানাচে ঘুরিতে থাকে। চারুবালা কত সুখী—অমন চমৎকার স্বামী—দু'দিন পর সন্তান আসিবে কোলে।

কিন্তু চারুবালা পরমুখাপেক্ষী। শাশুড়ীর অধীন। বনলতা কাহারও আজ্ঞার অধীন নয়। চারুবালার সঙ্গে ইচ্ছা করিয়া বনলতা গল্প করে—"উঃ—'কর্ত্রীমা' 'কর্ত্রীমা' শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা। এতদিন পর প্রজারা কি সুখী তাদের জমিদারের কাছারিঘর খোলা পেয়ে।"

বনলতা পুরান সাবেক ঘর ভাঙ্গিয়া নূতন ধরণের দোতালা ঘর তোলে। একখানা গাড়িবারান্দা সংযুক্ত হালফ্যাসানের ঘর। সিলিং এর উপর নিজের আঁকা একটা পদ্মলতা ঘুরাইয়া দেওয়ায়। ঘটা করিয়া গৃহপ্রবেশের নিমন্ত্রণ খাওয়ায় রায়ত জনদের।

নূতন করিয়া নিত্যনিমন্ত্রণের উপযুক্ত বড় বড় ডেগ, কড়াই, পরাত বানাইতে দেয়, ক্রিয়াকর্মে যেন কাহারও বাড়ীতে হাত পাতিতে না হয়। মেহগনি কাঠ দিয়া খুনখারাপি রংয়ের বার্নিশ করা বড় বড় আলমারি বানাইয়া ঘর সাজায়। বিয়ের বাণারসী, স্বামীর গায়ের জোড়াশাল সযত্নে পরিপাটী করিয়া সাজাইয়া রাখে আলমারির ভিতর; উপরের কাচবসান তাকে চীনামাটির শিবগৌরী, রামসীতা, নলদময়ন্তীর মূর্ত্তি দিয়া সাজায়। নিখুঁত পরিপাটি গৃহকর্ম। সমান দক্ষ বনলতা কি সংসারী কাজে কি শৌখীন কাজে।

বিয়ের সময় বনলতার জেঠামশায় ক্ষ্যান্তঝিকে কনের সঙ্গে দিয়া দিয়াছিলেন। সে সেই যে আসিয়াছে আর যায় নাই। তাহারও আপনজন বলিতে কেহই নাই। তাই সে বোনদির বাড়ীকেই নিজের বাড়ী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ঠাকুর চাকর চাকরাণী সকলের উপরই তাহার অবাধ কর্ত্রীত্ব।

কর্ত্রীর বাপের বাড়ীর লোক, তাই তাহার কথা কেহ অমান্য করিতে সাহস পায়না। ক্ষ্যান্ত প্রশংসমানদৃষ্টিতে দেখে বোনদির বাড়ীঘর সাজান। কি সুন্দর শ্রী ফিরিয়াছে এতদিনে এই পোড়া বাড়ীটাতে।

নূতন নায়েবটিকেও বেশ ভাল লাগে ক্ষ্যান্তর। মাঝে মাঝে নায়েব অন্দরমহলে আসিয়া ক্ষ্যান্তকে ডাকে, "ছোট কর্ত্রীঠাকরুনকে বল একটা নাম সই কবতে হবে"।

কি সব বলিয়া যায় নায়েববাবু মৌজা ফৌজা ক্ষ্যান্ত বোঝেনা। তাড়াতাড়ি সে বোনদিকে ডাকিয়ে দেয়।

বনলতা মাথায় কাপড় টানিয়া দোয়াত কলম লইয়া বসে। কোন্‌জন্মে বর্ণপরিচয় শেষ করিতে না করিতেই বিবাহ হইয়া যাওয়ায় লেখাপড়া শেষ; পোড়ার অক্ষব কি আর মনে আছে। সঙ্কুচিত হইয়া উঠে বনলতা: নূতন নায়েব কি মনে করিবে তাহার এই অজ্ঞতায়। ধীরে ধীবে কলম ঘুরাইয়া নামটা সই করিয়া দেয় বনলতা।

বিধবা হওয়ার পব যখন একটু বয়স হইল,—দেওবের কাছে একটু লেখাপড়া শেখার ইচ্ছা প্রকাশ কবে সে। শিবশঙ্করও রাজী হয়। কিন্তু জেঠীশাশুড়ী শুনিয়া আগুন—"আবার লেখাপড়ার সখ! রাঁড়ী মানুষের আবাব লিখতে পডতে শেখার দরকার কি? সোয়ামীকেত খেয়ে রেখেছিস তবে আবাব কার কাছে চিঠিপত্তর লেখা হ'বে শুনি! স্বভাব-চরিত্র নষ্ট করাব যত সব মেমসাহেবী বুদ্ধি!"

সেইদিন হইতে বনলতা লেখাপড়া শিখিবার আশা চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিয়াছিল।

এতবছর পর ছয়আনির কর্ত্রী আবার বই লইয়া শোয় দুপুরবেলা। শিবশঙ্করের লাইব্রেরী হইতে দুর্গেশনন্দিনী, বিষবৃক্ষ আনাইয়া বনলতা পড়া আরম্ভ করে।

চারুবালার মনে নানা সন্দেহ উঁকিঝুঁকি মারে—নূতন নায়েব ও বড়জার সম্বন্ধে। চারুবালা তাহার স্বামীর এই গায়ে পড়িয়া বড়জায়ের শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়াটা পছন্দ করেনা। কি দরকার ছিল আলাদা নায়েব রাখার—সম্পত্তি যখন তাহার স্বামীই পাইবে।

ছয়আনির অন্দরে নূতন নায়েবের অত আসা যাওয়াটা বড় চক্ষুশূল লাগে চারুবালার। মেয়েমানুষ হইয়াও জমিদারীর কাগজপত্রে নাম সই করে বনলতা;—একটা ক্ষীণ ঈর্ষা রেখাপাত করে ছোট জায়ের মনে।

ক্ষ্যান্তকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে "রাত্রেও আসে নাকি নূতন নায়েব নাম সই করতে?" কুটিলমৃদু হাসি খেলিয়া যায় তাহার পাতলা ঠোঁট দুইটিতে।

ঘুরিয়া ফিরিয়া বনলতার কানেও যায় কথাটা। একটু আনমনা হইয়া কি যেন ভাবে বনলতা।

১৯১৪ সাল—বাংলা দেশে তখন এক নূতন স্বদেশী ভাবধারার বন্যা দেখা যায়। সন্ত্রাসবাদীদের গুপ্ত আন্দোলনে যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। স্থানে স্থানে লাঠিখেলার, কুস্তীখেলার আখড়া করিয়া ব্যায়ামচর্চা শিক্ষা দেওয়া হইতে থাকে। আর তলে তলে

বৈপ্লবিক কাজকর্ম, বৈপ্লবিক পুস্তকপড়া ইত্যাদি চলিতে থাকে। শিবশঙ্করও এই নূতন স্বদেশী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে তাহার এক অন্তরঙ্গ বাল্যবন্ধুর প্রেরণায়। সেও তাহার গ্রামে একটি ব্যায়ামের আখড়া গড়িয়া তোলে। দূর দূর গ্রাম হইতে নামকরা—লাঠিয়ালরা আসিয়া লাঠিখেলা শিখাইতে থাকে। শিবশঙ্করের হাতও খুব পাকা হইয়া উঠে লাঠি খেলায় ও বর্শা ছোড়ায়।

ইতিমধ্যে শিবশঙ্করের একটি পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে। শিশুর নাম রাখা হইয়াছে সুজিৎ রায়। পৌত্র হওয়ার অনতিকাল পরেই শিবশঙ্করের মা তীর্থ করিতে গিয়া সেখানেই মারা যান। শিবশঙ্কর তখন বৈষয়িক ব্যাপার হইতে স্বদেশী আন্দোলনেই বেশী মত্ত। কিন্তু বাড়ীর কেহই সে বিষয়ে খোঁজ রাখেনা। চারুবালাও জানেনা। চারুবালা তাহার ছেলে ও সংসার নিয়াই ব্যস্ত। কিন্তু হঠাৎ একদিন পুলিশ আসিয়া তাহার সুখের সংসার কালমেঘে ঢাকিয়া দিয়া গেল। শিবশঙ্করকে তিনবছরের জন্য সুন্দরবনের একগ্রামে অন্তরীণ করিয়া রাখা হয়। চারুবালা দুইবছরের শিশুটিকে লইয়া শূন্য ঘরে দীর্ঘ তিনবছর কাটায়। গৌরীশঙ্কর তখন কলিকাতায় কলেজে পড়ে।

মাঝে মাঝে শিবশঙ্করের পত্র আসিত। আবার কখনও কখনও নানারূপ গুজবে চারুবালার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। কেহ বলিত শিবশঙ্করকে আন্দামানে পাঠান হইয়াছে। কেহ বলিত শিবশঙ্কর ফেরার হইয়াছে।

অন্তরীণ হইতে ফিরিয়া আসিয়া শিবশঙ্কর বৈষয়িক কর্মে মন দিল। ছেলেকে মানুষ করিতে হইবে কাজেই সম্পত্তিরক্ষা ও সম্পত্তিবৃদ্ধির জন্য পূর্ণ মনোযোগ দিতে হইবে এখন হইতেই।

মাঝে মাঝে পুরান স্বদেশী বন্ধুরা তাহার বাড়ীর অতিথি হয়।

তাহাদের আন্দোলনে টাকা দিয়া সাহায্য করে মাঝে মাঝে শিবশঙ্কর ; কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আর সংশ্লিষ্ট হয়নি সে।

কিছুদিনের জন্য কালোমেঘে ঢাকিলেও দশআনির সংসার আবার রৌদ্রোজ্জ্বল হইয়া ওঠে।

শিবশঙ্কর এখন বেশীর ভাগ সময় তাহার সখের ফুল বাগান লইয়া থাকে। গরুবাছুর, ধানেরগোলা, রায়তজন সর্বত্রই ভরপুর।

ছয়আনির সংসারও ঠিক একভাবেই ভরপুর। তবু কিসের একটা অভাবে বনলতার মনটা খচ খচ করিতে থাকে। চারুবালাব ছেলের কথাগুলি কি মিষ্টি। যাদুমাখা চাউনি ছেলেটার। বনলতার বুকের ভিতরটায় হুহু করিয়া উঠে কিসেব এক শূন্যতা।

চারুবালা তাহার ছেলেকে সাজাইয়া গোছাইয়া কাজলের টিপ পবাইয়া চুমায় চুমায় অস্থির করিয়া তোলে। বনলতা তাকাইয়া তাকাইয়া দেখে আর ভাবে সেও ত' অমন একটি ছেলে আনিয়া তাহার ঘব আলো কবিতে পারে।

বনলতা জানিত তাহার স্বামীকে দিয়া দত্তক লইবার অনুমতি লিখাইয়া রাখা হইয়াছিল তাহার মৃত্যু সময়ে। নায়েবকে ডাকাইযা সে মনের ইচ্ছাটা প্রকাশ করে। "না হলে এই সম্পত্তি ভোগ কববে কে? স্বামীর ভিটাটা ত' ছারখারে দেওয়া চলে না। আপনি আর পাঁচজনের সঙ্গে পরামর্শ করুন।" মনে মনে ভাবে বনলতা—চারুবালাব ছেলে এ সম্পত্তি ভোগ করবে তাহা সে কিছুতেই হইতে দিবেনা।

কথাবার্ত্তা সব ঠিক। দুখুকে লক্ষীপুরের ছয়আনির কর্ত্রী দত্তক লইতেছে।

ছয়আনির নায়েব পাল্কী লইয়া দত্তক ছেলেকে লইতে আসিয়াছেন সঙ্গে ক্ষ্যান্তও আসে।

মাহেন্দ্রক্ষণে মাতামহ বিশ্বেশ্বর দুখুকে স্নান করাইয়া কপালে চন্দনের তিলক আঁকিয়া দেন। মাথায় ধানদূর্বা দিয়া আশীর্বাদ করেন "ভাগ্য সুপ্রসন্ন হউক।"

যাত্রাকলস আঁকা উঠানে আম্রপল্লব দেওয়া পূর্ণকলসী। গ্রামের এয়োস্ত্রীরা কলকণ্ঠে উলুধ্বনি দিয়া দুখুকে আশীর্ব্বাদ করে।

ছয়আনির নায়েব দত্তকছেলের জন্য লালপোশাক মাথার জরির পাগড়ি পায়ের জরির কাজ করা নাগরা জুতা লইয়া আসিয়াছেন। মাসীমা দুখুকে সাজাইয়া দেয়। তাহার চোখ জলে ভরিয়া উঠে—তবু তাহার কিছু বলিবার অধিকার নাই.

বিশ্বেশ্বরের বুকেও যেন আজ নিশ্বাসগুলি জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছে, তবু চোখ ভিজিয়া উঠিতেছে না। দৌহিত্রের ভাবি মঙ্গলের জন্য আজ তাহাকে কঠিন মমতাহীন হইতে হইবে। কাঁদিবেন কেন? রাজপুত্র হইতে চলিতেছে তাহার আদরের ছোট দাদুটী। তাহার ভবিষ্যৎ জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিবে।

দুখু রাজপুত্রের মত পোশাক পরিয়া বারে বারে নিজেকে দেখে আর ভাবে—দিদিকে বলিয়াছিল সে রাজপুত্র হয়ে মার কাছে যাইবে। তবে কি মেঘের আড়ালের দেশে তার হারান মায়ের সঙ্গেই দেখা হইবে আজ? সে শুনিয়াছিল তার মা মরিয়া গিয়াছে। আবার দাদু যে বলেন সে তার মার কাছে যাইতেছে। কি রকম সে মা! কেমন করিয়া কথা বলিবে! দুখুর ভাবনার শেষ নাই।

অদ্ভুত বিস্ময়ে, কৌতুকে, আনন্দে, ভয়ে দুখুর ছোট্ট বুকটা টিপ টিপ

করিতে থাকে একটা আধাবোঝা, আধজানা ভাবনায়, আর নূতন পোশাকের গরমে সে ঘামিয়া উঠে।

হঠাৎ তাহার চোখ পড়ে দিদি দূরে দাড়াইয়া চোখ মুছিতেছে।

একমুহূর্ত্তে তাহার ছোট্ট মনটুকু একটা দিশাহারা দুঃখে ভিজিয়া উঠে। দিদিকে কেন নেয়'না সঙ্গে। সেত' একমুহূর্ত্তও দিদিকে ছাড়া থাকিতে পারে না। দুখু কাঁদিয়া ফেলে।

দাদুভাই আসিয়া তাহাকে আদর করিয়া বুঝাইতে থাকে ন"মায়ের কাছে যাচ্ছ ভয় কি দাদু। এইত আমিও যাব তোমার সঙ্গে। মানিক আমার কাঁদে না লক্ষীটি।"

পাল্কী তখন বেহারাদের কাঁধের উপর নড়িতেছে। দুখু সজল চোখে দিদির দিকে তাকাইয়া থাকে।

পাল্কীটা যতক্ষণ দেখা যায় শঙ্করী চোখের জল মুছিয়া স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখে। মাঠের শেষপ্রান্তে বনবনানীর অন্তরালে পাল্কীটা মিলাইয়া যায়।

শঙ্করী তখন সেখান হইতে চলিয়া আসে, কিন্তু বাড়ী যায় না। বুড়ীমার বাড়ীর দাওয়ায় গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া কতক্ষণ কি ভাবে! আবার সেখান হইতে উঠিয়া পুকুর পাড়ে গিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। কিছুই ভাল লাগে না।

বাড়ী আসিয়া পুতুলের বাক্সটা খুলিয়া বসে। ভাঙ্গা চীনামাটির পুতুলটায় চোখ পড়িতে আবার তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠে। একদিন দুখু এই পুতুলটা ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় সে মাসীকে বলিয়া তাহাকে মার খাওয়াইয়াছিল।

ভাঙ্গাপুতুলটাকে শঙ্করী কাঁটাঝোপের মধ্যে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়—"ওটার জন্যইত তুখু সেদিন মার খেয়েছিল।"

ভয় পাইলে তুখুর চোখতুইটি কি রকম হইয়া যায় বেশ লাগে দেখিতে। সুন্দব বড় বড় চোখের পিছিগুলি ওর। যা ভীতু ছেলে ও যে কি কবিয়া একা একা থাকিবে! উহাকে তাহার মতই ভালবাসবে ত নূতন মা?

অফুরন্ত এলোমেলো চিন্তায় শঙ্করী খেই হারাইয়া ফেলে।

মাসীমা গৃহকর্ম শেষ করিরা ঘরে আসিয়া দেখে পুতুলের সাড়ী বালিশ তোশকেব পাশে শঙ্করী কখন ঘুমাইয়া পরিয়াছে। তাহার চোখের কোনে তখনও জল লাগিয়া রহিয়াছে।

বিপুল সমারোহ ছয় আনির নাট মন্দিরে। শিবশঙ্কর নিজে বৌঠানের এ কাজেব দায়িত্ব নিয়াছে। প্রজারা সবাই খাটিতেছে তাহাদেব ভাবী-জমিদাবের প্রথম ক্রিয়া উপলক্ষে।

দূব সম্পর্কেব আত্মীয় স্বজনে বাড়ীটা ভরিয়া গিয়াছে।

চারুবালার সর্বাঙ্গে গহনা। একখানা জরি পাড় আশমানী রংয়ের মাদ্রাজী সাড়ী পবিয়া ববণকুলা সাজায় সে।

বাহিবে কানাঘুষা নানা কথা রঞ্জিত অতি রঞ্জিত হইয়া গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পবে। কেহ বলে "দশ আনির কর্তার কিন্তু বড় আপত্তি ছিল ছোট কর্ত্রীব দত্তক নেওয়ায়। এ সম্পত্তি ত তাঁর ছেলেই পেত কিনা।"

প্রজাদেব একজন জিজ্ঞসা করে—"শুনলাম খুব নাকি নীচু বংশের ছেলে।"

ছয় আনির লাঠিয়াল সর্দারভাই জোর আপত্তি করিয়া উঠে,—"নিচু বংশ কি রকম! আমি নিজে গিয়েছিলাম ছেলে দেখতে—কি চমৎকার

দেখতে ছেলে—এই ডাগব চোখ।" লাঠিযাল সর্দাব তাহাব খইনিটেপা হাতটা ঝাড়িয়া লয়, "আব বংশ বলিস ত, আমাদেব মনিবেব চাইতে কোন অংশে ছোট নয। বিশ্বেশ্বব মজুমদাবেব আজ সেই অবস্থা নেই বলে।"

সর্দাবভাই আগে বিশ্বেশ্ববেব প্রজা ছিল। পবে শিবশঙ্করেব লাঠি খেলাব আখডায লাঠিয়াল হইযা আসে। সেই হইতেই সে এই বাডীতে থাকিয়া যায়।

এবই মধ্যে চলনবাদ্য আসিয়া উপস্থিত। দূব হইতে ইংবাজী বাদ্যেব শব্দ শুনিযা পার্শ্ববর্তী গ্রাম হইতে বহুলোক ছেলে দেখিতে ছুটিযা আসে।

বেল লাইনেব ধাব দিযা সরু পথ। পথেব দুই ধাবে লোকেব ভিড জমিয়া যায—ছয আনিব কর্ত্রীমাব ছেলে দেখাব জন্য।

পাল্কীর ভিতবে ক্ষ্যান্তব কোলে বসিযা, এই বিবাট লোকেব ভীডে, ব্যাণ্ড পাটিব সাজসজ্জায ও জয ঢাকেব শব্দে দুখু হতভম্ব হইযা যায। কপালেব চন্দন ঘামে ভিজিযা একাকাব।

পাল্কী আসিয়া মঙ্গলঘট দেওযা মণ্ডপেব দুযাবে নামে। এয়োতিবা উলু দিয়া ছেলে ববণ কবে। পাডাব বৌ-ঝিবা ছেলে দেখিতে ভিড কবিয়া দাডায়।

বনলতাব মনটা একটু বিমর্ষ হইবা যায—ছেলেব বং চারুবালাব ছেলেব মত ফবসা নয়।

মাঙ্গলিক ক্রিয়া কর্ম যাগযজ্ঞাদি শেষ হইয়া গেলে উকিলবাবু ও সাক্ষীবা বসেন বেজিষ্টাবীব কাগজ লইযা।

ছেলেব বাবা ও দাদামশাই আসিযাছেন—আব এই দিকেব বনলতাব এক দূর সম্পর্কেব ভাই ও শিবশঙ্কব উপস্থিত। এছাড়া অন্যান্য গণ্যমান্য বিশিষ্ট ভদ্রলোক, ও আত্মীযদেব মধ্যে অনেকেই উপস্থিত।

ছেলের নূতন নামকরণ হয় গোত্রান্তরের সঙ্গে। শিবশঙ্করই তাহার দাদার ছেলের নামকরণ করে—বিশ্বজিৎ রায়।

সলজ্জ বনলতা মাথার কাপড় টানিয়া উকিল ও সাক্ষীদের সম্মুখে নাম সই করে রেজিষ্টারী কাগজে। মনে মনে ইষ্টদেবকে প্রণাম করে বারে বারে—বুকটা একটু ঢিপ ঢিপ করিতে থাকে। যজ্ঞের হাঙ্গামা মিটিয়া গেলে নিমন্ত্রিত আত্মীয় কুটুম্বরা সবাই যার যার বাড়ী চলিয়া যায়। এতদিনে ছোটকর্ত্রী যেন একটু দম লইবার সময় পায়।

দশ আনির ছোট-জা ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে। মাঝে মাঝে অনুযোগ ও দেয়, "ও দিদি, ছেলে পেয়ে আমাদের যে ভুলে গেলেন দেখি—সাড়াই পাইনা যে।"

"কই বিশ্বজিৎ, দেখি, ডাকত একটু মাকে শুনি।" চারুবালা বিশ্বজিৎকে আনিয়া তাহার মায়ের কোলে বসাইয়া বলে, "সন্দেশ পাবে—যদি মা বলে ডাক। কই ডাক,—ভয় কি? এই ত তোমার মা।"

বিশ্বজিৎ আড়ষ্ট হইয়া উঠে। কেমন যেন জড়সড় হইয়া আস্তে আস্তে বলে, "মা"।

চারুবালা হাসিয়া খুন। "কি দিদি, এবার ত মা ডাকে প্রাণটা জুড়োবে। ছেলে কোলে এদ্দিনে ঘরের আঁধার ঘুচলো তবে।"

বনলতা ছেলের আড়ষ্ট ভাব লক্ষ্য করে। মনে মনে ভাবে—দুই একদিনেই বশ করিতে পারিবে সে ছেলেকে। সাজসজ্জা, ভাল মিষ্টি মেঠাই দিলেই বশ মানিবে। ঐটুকু ছেলেকে বশ করিতে আর কি লাগে? তবে শাসনেও রাখিতে হইবে—নষ্ট হইয়া না যায়। হাজার হউক গরীবের ঘরের ছেলে ত।

সেইদিনই নায়েবকে ডাকাইয়া ছেলের জন্য 'আকাশী' রংয়ের সিল্কের পোশাক, আর সোনার বোতাম বানাইতে দেয়। কাঁসারীর কাছে লোক

পাঠান হয়, ইসলামপুরী ছোট ছোট থালা গ্লাসের ফরমাইস লইয়া। রাধি বাগ্দীকে বাসন মাজার কাজ হইতে সরাইয়া আনিয়া ছেলে রাখার কাজ দেওয়া হয়।

বিশ্বজিৎ তবু মনমরা হইয়াই থাকে। একটু ফাঁক পাইলেই চুপি চুপি গিয়া দাঁড়াইয়া থাকে ঝাউ গাছটার তলায়। যদি দাদুভাই আসে তাহাকে লইয়া যাইতে। এই পথ দিয়াই ত তাহার দাদুভাই চলিয়া গিয়াছে। এতদিনেও তাহাকে নিতে আসিতেছে না কেন—বিশ্ব ভাবিয়া পায় না। তাহার বড় বড় চোখ দুইটিতে একটা কাতর ছায়া পড়ে। দিদির জন্য মন কেমন করিতে থাকে।

রাত্রিতে গুটিসুটি হইয়া বিছানার একধারে গিয়া শুইয়া থাকে সে। মা বারে বারে টানিয়া কাছে লইয়া বলে "জড়াইয়া ধরিয়া শোও আমাকে।" বিশ্ব তাহার ছোট্ট হাত দুটি দিয়া মার গলা জড়াইয়া ধরে আড়ষ্টভাবে।

বনলতা তাহার চোখেমুখে আদর করিয়া স্তনটা ছেলের মুখে দেয়। বিশ্ব সেই দুধ ছাড়িয়াছে কবে মনে নাই। আস্তে আস্তে সে মুখটা সরাইয়া লয়।

মা আবার আদর করিয়া বলে, 'ভয় কি, আমিইত তোমার মা।"

সুন্দরী যুবতী সপ্তবিংশতি বছরের বনলতা—এক অপূর্ব্ব শিহরন অনুভব করে রক্তের মধ্যে। এক বিস্ময়কর মাতৃত্বের লালসা হু হু করিয়া উঠে— সন্তান কামনাতুরা নারীর একান্ত ঈপ্সিত শিশু।

তবু বনলতার মনে কিসের যেন একটা ফাঁক থাকিয়াই যায়। বারে বারে সে ছেলেকে টানিয়া লয় স্তূপায়িত ব্যর্থ কামনাভরা বুকের মধ্যে। বিশ্ব যেন আরও আড়ষ্ট হইয়া পড়ে।

একটা ভয়মিশ্রিত জড়তা শিশুমনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

শুইয়া শুইয়া সে ভাবে—"দিদি হয়তো এতদিনে আরও কতগুলি গল্প শুনিয়া ফেলিল।"

আস্তে আস্তে ঘুমাইয়া পরে শিশুটি বনলতার বুকের মধ্যে।

সর্দারভাইর সঙ্গে বিশ্বজিতের খুব ভাব হইয়া যায়। সর্দারভাই খোকাবাবুর জন্য তীর ধনুক বানায়, আর গল্প বলে "ডোরা ডোরা সুন্দরবনের বাঘ, তার এত বড় বড় গোল গোল আগুনের মত চোখ। খোকাবাবু, তুমি বড় হ'য়ে বাঘ শিকার করতে যাবে আমি তোমার সঙ্গে যাব—"

বিশ্ব খুশি হইয়া প্রশ্ন করে, "সর্দারভাই এই ধনুক দিয়ে বাঘ মারা যাবে না?"

সর্দারভাই মোটা গলায় সুর করিয়া বলে, "বাঘ কি, বাঘের মাসী মারা যাবে।"

এরই মধ্যে রাধি আসিয়া হাজির হয় খোকাবাবুর সন্ধানে। "আমি খুঁইজ্যে খুইজ্যে হয়রান হনু—আর খোকাবাবু কিনে এইখেনে বইসে আছে। মোর ত বুক ক্যেইপে ক্যেইপে উঠছিল।"

রাধি খোকাবাবুকে হাত পা ধোওয়াইতে লইয়া যায়। যাইবার সময় বিশ্ব বলিয়া যায়, "সর্দারভাই কাল আরেকটা গল্প বলো।"

"হুঁ। কাল হ'বে কালুডাকাতের গল্প। বাপরে সে কি চেহারা কালুসর্দারের—এই বুকের ছাতি, এতবড় নাক।" সর্দার হাত দিয়া দেখায়।

রাধি হাসিয়া খুন।

রাধি যোগীন বাগ্দীর বৌ।

মাঝি আর বাগ্দীরা জমিদারদের চাকরান। বহু বছর আগে শিবশঙ্করের ঠাকুরদার আমলে বাগ্দীরা পশ্চিম বঙ্গ হইতে আসিয়া এ বাড়ীর চাকরান হয়। সেই হইতে বংশ পরম্পরায় উহারা এখানে ঘর বাঁধিয়া আছে। একটি করিয়া ছোট ছোট ছনের ঘর প্রত্যেকের। কোনও আড়ম্বর নাই তাহাদের জীবন যাত্রায়। ঐ একখানি ঘরের মধ্যেই পূর্ণ সংসার। পুরুষেরা জোগান খাটে—মেয়েরা বাড়ীতে বাড়ীতে বাসন মাজে, 'বাইরের' কাজ করে। সাঁওতালদের মত করিয়া খোঁপা বাঁধিয়া, কোমরে আঁট সাট করিয়া কাপড় জড়াইয়া কাজ করে মেয়েরা।

যোগীন বাগ্দীর মন পড়িয়া আছে রাইয়ের মেয়ে হারাণীর উপর। হারাণী তাহার স্বামীকে 'ছাড়ান' দিয়া আসিয়াছে কয়েকদিন হইল। রাধিদের পাড়াতেই সে ঘড় তুলিয়াছে। কালো কুচকুচে দেহে নিটোল স্বাস্থ্য যেন উপছাইয়া পড়ে। হারাণী তার সদ্য তোলা ঘরের পিঁড়া সমান করে। ঝুড়িতে ঝুড়িতে মাটি টানে সে।

যোগীন আগাইয়া আসে, "দে কোদালটা, একি মেয়েলোকের কাম!" কোদালটা টানিয়া লয় হাত হইতে। রাধি অদূরে একটা পোড়ো ভিটা হইতে পাতা ঝাড় দেয় আর আড় চোখে দেখে। মনে মনে জ্বলিয়া উঠে। আর ভাবে, "মরুক গিয়া ব্যাটা হারাণীরে লয়ে। যদ্দিন মনিব বাড়ীর ধলাঠাকুর আছে তদ্দিন আমারও দুঃখ নাই।"

রাধি খোকাবাবুকে জামাজুতা পরাইয়া কুমারবাড়ীতে বেড়াইতে যায়। খামার বাড়ীর কিছু দূরেই কয়েকঘর কুমারের বাস। মস্ত একটা উঠানের চার পাশ ঘিরিয়া ছোট ছোট দোচালা ঘর।

সকাল বেলা একপেট পান্তা খাইয়া স্ত্রী-পুরুষ সকলেই কাজ আরম্ভ করে।

ছোট, বড় নানা আকারের মাটির তালগুলি চাকার মধ্যে ঘুরিয়া হাঁড়ি, কলসী, গামলা হইয়া যাইতেছে। বিশ্ব অবাক হইয়া দেখে একমনে। বৌ, ঝিয়েরা বসিয়া নকশা আঁকে মাটির হাঁড়ি, কলসীর গায়ে।

মাস দুই পরই "পুন্যার" মেলা আসিতেছে। কুমার-মেয়েদের কাজের চাপ পড়িয়া গিয়াছে; মেলার জন্য নানা রকমারি রঙ্গিন পুতুল, সিংহ, বাঘ, ছোট ছেলেমেয়ের খেলিবার জন্য ছোট ছোট হাঁড়ি, কড়াই, তৈয়ার করিতে হইবে।

বিশ্ব বসিয়া বসিয়া কুমার-বৌয়ের শরা চিত্রন দেখে। শরার চারদিক ঘুরাইয়া একটা টুনি-লতা আঁকে কুমার বৌ। বিশ্ব কিছুক্ষণ মন দিয়া দেখিয়া আবদার ধরে—তাহাকে একটা শরা আঁকিয়া দিতে হইবে।

রাধি হাসিয়া বলে, "পুরুষ মানুষে আবার শরা দিয়ে কি করে? তার চাইতে খোকাবাবুকে একটা সিংহ এন্যে দাও।" রাধি আঁচলের খুঁট্ হইতে পয়সা বাহির করে। কিন্তুকুমার চাকা ঘুরাইতে ঘুরাইতে চেঁচাইয়া বলে, "না না পয়সা নিস্না—তানদেরটা খাইয়াই মানুষ, খোকাবাবুর কাছ থেইকা পয়সা লইতে পারি!"

বিশ্ব মুখ ভার করিয়া থাকে। সিংহ পাইয়াও তাহার মন উঠেনা। টুনি-লতাটাই তাহার খুব পছন্দ হইয়াছিল।

কুমার-বৌ হাসিয়া বলে,"খোকাবাবু রাগ কইরোনা; বড় হইয়া রাঙ্গাবৌ যখন আসবে, তখন খুব সুন্দর লাল পদ্মফুল আঁইকা দিমু বরণ-কুলায়।"

মনিব বাড়ীতে তাহার সুখের কাজ। শুধু খোকাবাবুকে লইয়া থাকা। তাহাকে সাবান মাখিয়া ধোয়াইয়া পোঁছাইয়া জামা জুতা পরাইয়া দেয় রাধি।

ছোট ছেলে খাইতে বসিয়া জামা কাপড় "এঁটো" করিয়া দেয়, বনলতা তাই স্নানের পর আর ছেলেকে ছোঁয় না। রাধিই সব করে।

রাধি পাড়ায় গল্প করে, "ত্থাথ্ না ত্থাথ্ খোকাবাবু কোথায় যে হারাইয়ে যায়—খুইজ্যে খুইজ্যে হয়রানী। পরে ত্থাথ কি নে বাইর বাড়ীর ঝাউ গাছের তলায় খোকাবাবু চুপটি ক্যইরে বইস্তে আছে। কর্ত্রীমা এত কিছু করেন, তাও খোকাবাবুর মুখে হাস্ নাই। খালি একলা একলা থাকে পলাইয়ে পলাইয়ে।"

কি একটা কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় রাধির চোখ দুইটা বড় বড় হইয়া উঠে। সে বলিতে থাকে, "সেদিন হাট থেইকে আইতেছি—দেখি কিনে—খোকাবাবু রেললাইন ধইরে একলা একলা হেঁইটে চল্‌ছে। কি সর্বনাশ যে হইত সেইদিন আমি না দেখলে!"

রাধির বুকটা যেন কাঁপিয়া উঠে। এরই মধ্যে কেমন একটা মায়া হইয়া গিয়াছে খোকাবাবুর উপর।

পাড়ার বৌ, ঝি, সকলেরই একটা মায়া পড়িয়া গিযাছে এই ছোট শিশুটির উপর। তাহাদের সন্তানকেও যদি কেহ এইভাবে লইরা যায় অচেনা অজানা দেশে! বুকটা অলক্ষ্যে কাঁপিরা উঠে যেন।

বিশ্বজিতের কাল চোখে কিসের এক বিষণ্ণতা ফুটিয়া উঠে। স্বতঃস্ফূর্ত শিশুর চপলতা যেন সে হারাইয়া ফেলিয়াছে।

চুপ করিয়া একা একা বসিয়া থাকিতেই ভালবাসে সে। ঝাউ গাছের তলায় একলা বসিয়া থাকে। সাজনপুবেব সেই জনহীন ভিটাটার অস্পষ্ট এক ছায়া পড়ে শিশুমনে।

আবছা সন্ধ্যায় তেঁতুল গাছটার উপর লক্ষ্মী পেঁচকগুলি কিচির

মিচির করিয়া উঠিত একসঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে আকন্দ ফুলের গাছগুলিতে ঝিঁঝি পোকার ডাক আরম্ভ হইরা যাইত।

আগাছাভরা ভিজা উঠানের সেই অতি পরিচিত স্পর্শ! ছায়াভরা গ্রাম্য পথের হাতছানি। বিশ্বজিতের ডাগর চোখের মণিদুইটী স্থির হইয়া যায়।

অনেক দূরে তালগাছের সারির আড়ালে মায়ায় ঘেরা নিবিড় প্রান্তর, স্নেহমাখা বনবনানী।

এখানকার লোকজনে সরগরম সকালসন্ধ্যাগুলি যেন এক অজানা বিস্ময়ভরা। বিশ্বজিৎ তাহার শিশুমন দিয়া উহার 'নাগাল' পায়না।

চারুবালা মাঝে মাঝে বলে, "দিদি, তোমার ছেলে যে কথাই বলে না মোটে। সুজিতের সঙ্গে খেললেই ত পারে।"

বনলতা ছেলেকে বলিয়া দেয়, "যাও সুজিতের সঙ্গে খেলা কর; কিন্তু ঝগড়াঝাটি করোনা যেন।" .

সুজিৎকে ভাল লাগেনা বিশ্বজিতের। সে তাহার ট্রাইসাইকেলটাতে একবারও চড়িতে দেয়না। অযথা কুকুরগুলিকে মারিতে থাকে —নির্জীব প্রাণীগুলির করুণ চোখগুলি দেখিয়া বড় কষ্ট লাগে তাহার।

সুজিতের বাবাকে তাহার খুব ভাল লাগে। কাকাবাবু তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দেয়—আদরপ্রিয় শিশুমনে যাদুমাখা স্নেহের স্পর্শ লাগে। বড় বড় করিয়া সে তাকাইয়া দেখে—খদ্দর পরিহিত কাকাবাবুর হাঁটাচলার পৌরুষভঙ্গী, তাঁহার প্রশস্ত ললাটের সাম্য স্নিগ্ধ তেজস্বিতা—বালক বিশ্বজিৎ মুগ্ধ হয়।

একদিন শিবশঙ্কর প্রকাণ্ড এক গোখুরা সাপ মারিয়া আনে বল্লম দিয়া। বিশ্বজিৎ ভয়মিশ্রিত সম্ভ্রমভরা দৃষ্টিতে দেখে তাহার কাকাবাবুর বীরত্ব। মনে মনে ভাবে—সেও বড় হইলে ঠিক কাকাবাবুর মতই হইবে।

বালক বিশ্বজিতের জীবনের প্রথম নায়ক !

সুজিৎ কিন্তু তাহার বাবার চাইতে কাকারই প্রিয় বেশী। কাকার সাজসজ্জায় আধুনিক ফ্যাশানদুরস্ত সৌখীনতায় আকৃষ্ট হয় সে। তীক্ষ্ণধী চঞ্চল, ছটফটে সুজিতের সঙ্গে কল্পনাবিলাসী বিশ্বজিতের খাপ খায় না।

বাস্তব-সচেতন বনলতার মনে কোন কল্পনাময় অনুভূতির ছায়াপাত করে না। সে তাহার ব্যক্তিত্বপ্রখর মন দিয়া ছেলের এই বোকা বোকা স্বপ্নালু দৃষ্টির কোন মনস্তাত্ত্বিক অর্থ তলাইয়া দেখিতে পারে না। মনে মনে ভাবে বনলতা—সুজিতের মত চৌকস ছেলে নয়। তবু ঘসিয়া মাজিয়া চেষ্টাচরিত্র করিয়া দেখিতে হইবে...চালাকচতুর করা যায় কিনা ছেলেকে।

বিশ্বকে সেদিন ঘুম হইতে ডাকিয়া তোলে ক্ষ্যান্ত, "ও বিশু দেখ কে এসেছে!" বিশ্বজিৎ জাগিয়া দেখে দাদুভাই আসিয়াছে—খুশিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠে সে। ছুটিয়া গিয়া দাদুভাইয়েব কোলের মধ্যে মুখ লুকায়।

দাদুভাইও তাকাইয়া দেখে তাহার আদরের দাদুটিব কি সুন্দর শ্রী ফিরিয়াছে। সাজসজ্জায় কেমন আভিজাত্যের রুচি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বনলতা লক্ষ্য করে ছেলে কেমন সহজভাবে গা ঘেষিয়া আছে তাহার দাদুভাইয়েব কাছে। বুকের মধ্যে কেমন একটু খচ্ খচ্ করিয়া উঠে। কিসের একটা অজ্ঞাতজ্বালা অন্তর্দেশে।

নায়েববাবু আসিয়া জানায়, "বিশ্বেশ্বর বাবুত বিশ্বকে নিতে এসেছিলেন।" ছোটকর্ত্রী মনে মনে একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করে—

ছেলে এখন তাহারই! তাহারই সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছেলেকে দেওয়া না দেওয়ার।

ছোটকর্ত্রী নিচুস্বরে অথচ বিশ্বেশ্বরও যাহাতে শুনিতে পায় এইরূপ জোরেই বলে, "ছেলেকে স্কুলে ভর্ত্তি করে দেবার কথা সামনের শ্রীপঞ্চমী দিনে। লেখাপড়া এখন থেকেই আরম্ভ করা দরকার। তবে ছেলের দাদামশাই যদি নিতে চান তবেত আর আমার আপত্তি করা চলেনা, হাজার হউক ছেলে তাদেরই।"

বিশ্বেশ্বর ব্যস্ত হইয়া বলে, "না, না, সেকি কথা, ছেলে আপনারই। আপনিই তার এখন সবকিছুর মালিক। থাক তবে এখন না-ই নিলাম লেখাপড়ার বাধা দেওয়াটা ঠিক হবে না।"

ছোটকর্ত্রীর মনের জ্বালাটা যেন কিছু লাঘব হয়। ছেলের উপর সম্পূর্ণ কর্ত্রীত্ব তাহারই – দাদুর কাছে কাছে অত ঘেষিলে কি হইবে।

সরস্বতীপূজাদিন নায়েববাবু বিশ্বকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া আসেন। যাইবার সময় বনলতা বারে বারে ছেলেকে সতর্ক করিয়া দেয়, "খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মিশোনা কিন্তু। মন দিয়ে পড়াশুনা করো।"

একজন প্রাইভেট মাষ্টার ঠিক করা হয় ছেলেকে বাড়ীতে পড়াইবার জন্য। রাধামোহন বাবু রাজী হন। এ বাড়ীতেই থাকিবেন তিনি; ছেলের পড়াশুনা দেখিবেন দুইবেলা।

স্কুলে আসিয়া বিশ্বজিৎ যেন একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই অনেক সাথী পাইয়া যায় সে। হেডমাষ্টার মহাশয়ের ছেলে নীমুর সঙ্গে খুব ভাব হইয়া যায়। টিফিনের সময় নীমু বিশ্বকে লইয়া যায় তাহার বাড়ীতে। তাহার মা বাড়ীর তৈয়ারী সন্দেশ খাইতে

দেন দুইজনকে। আসার সময় বিশ্বর মাথায় সস্নেহ হাত বুলাইয়া বলেন, "নীমুর সঙ্গে এসো এখানে রোজ টিফিনের সময়—কেমন ?"

ছেলেটির উপর কেমন মায়া পড়িয়া যায় নীমুর মার। আহা অতটুকু ছেলে আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া কি করিয়া থাকিতেছে এতদূরে ? হাজার বড়লোক হইলেই বা কি। তাহার নীমুকে যদি ঐরকম দিতে হইত ! উমা ভাবিতেও পারেনা সে কথা।

বিশ্ব আজ কয়দিনেই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে উহাদের পরিবারে। নীমুর বাবাকেও খুব ভাল লাগে তাহার। কি সুন্দর মিষ্ট হাসিয়া, ছবির বই দেখাইয়া ইতিহাস পড়ান তিনি। একটুও বকেন না—মারেন না ! তাঁহার ক্লাসেও সবাই পড়া ঠিক বলিতে পারে ; ভুল হয় না। সবাই ভয় করে শুধু ঐ অঙ্কের মাষ্টার রাধামোহন বাবুকে।

পরীক্ষায় বিশ্বজিৎ ইতিহাসে প্রথম হয়—কিন্তু অঙ্কে খুব কম নম্বর পাওয়ায় 'ষ্ট্যাণ্ড' করিতে পারে না। নীমুই প্রথম হয়। তাহাতেই খুশি বিশ্বজিৎ।

সুজিৎও তাহার ক্লাসে অঙ্কে পুরা নম্বর পাইয়া প্রথম হইয়াছে। তাহার মা ছেলের ক্লাসের সবছেলেদের বাড়ীতে আনিয়া রসগোল্লা খাওয়ায়।

বনলতা মাষ্টার মহাশয়কে ডাকাইয়া গম্ভীর হইয়া বলে, "বিশ্বর লেখাপড়ায় একটু জোর দেবেন এখন থেকে।" মনে মনে ঠিক করিয়া রাখে—সামনের বছর ছেলে প্রথম হইতে পারিলে চারুবালার চাইতে অনেক বেশী খরচ করিবে সে।

রোজই স্কুল হইতে ছেলে বাড়ী আসিলে বনলতা তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে—অঙ্ক পারিয়াছে কিনা।

বিশ্বর খুব দুঃখ হয়—মা কেন একদিনও ইতিহাসের কথা জিজ্ঞাসা

করে না। রোজই সে ইতিহাসের খাতায় 'very good' পায়। হেড-মাষ্টার মহাশয় কত খুশি হন, কিন্তু মাকে সে খুশি করিতে পারে না।

পরের বছরও সুজিৎ প্রথম হয়, কিন্তু সেবারেও বিশ্ব প্রথম হইতে পারে না। বনলতা গর্জ্জিয়া উঠে, "যা সুজিতের পা ধোওয়া জল খা গিয়ে। তা'তে যদি একটু বুদ্ধি বাড়ে। মাথার মধ্যে গোবর ভরা।"

বিশ্বর চোখ জলে ভরিয়া উঠে। বড় অভিমানী ছেলে সে। পরের দিন টিফিনের সময় খেলিতে যায় না। একটা খালি বেঞ্চিতে বসিয়া অঙ্ক করে। নীমু আসিয়া বলে, "টিফিনের সময় আবার কেউ পড়ে নাকি? চল, খেলতে চল।"

বিশ্ব তবু উঠে না, 'না, অঙ্ক না পারলে মার কাছে বকুনি খাব।'

নীমু জোর করিয়া তাহাকে তার মার কাছে নিয়া নালিশ করে, 'বিশ্ব টিফিনের সময় অঙ্ক করছিল। টিফিনের সময় পড়তে হয় কি মা? তা'হলে সব পড়া ভুল হ'য়ে যায়না!'

নীমু বিজ্ঞের সুরে বলে, 'কেন যে অঙ্ক পারে না বিশ্ব, অত সোজা জিনিষ।'

উমা তাকাইয়া দেখে বিশ্বর চোখ দুইটি ছল ছল করিয়া উঠিয়াছে। সে তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া আদর করিয়া বলে, 'আমি তোমাকে অঙ্ক বুঝিয়ে দেব। রবিবার দিন এসো নীমুর সঙ্গে পড়তে কেমন।'

বিশ্বজিৎ খুশি হইয়া উঠে। তাহার জলভরা চোখ দুখটি উজ্জ্বল হইয়া মুখে হাসি ফুটিয়া উঠে।

উমা হাসিয়া বলে, 'পাগল ছেলে!'

উমা ম্যাট্রিক পাশ। ছেলেকে সে নিজেই বাড়ীতে পড়া বুঝাইয়া দেয়। রবিবারদিন বিশ্বজিৎ নীমুদের বাড়ী আসে দুপুরবেলা। প্রথমটায় বনলতা একটু আপত্তি করে। ছেলেকে এখন হইতেই স্বাধীন করিয়া

দেওয়ায় তাহার ঘোর আপত্তি। 'ছেলে শুধু নিলেইত নয়—তা'কে মানুষ করা চাইত।'

বিশ্বজিৎ বারে বারে অনুনয় করিতে থাকে, 'মাসীমা বলে দিয়েছিলেন অত ক'রে।'

অঙ্ক শেখার কথাটা আর বলেনা। অগত্যা বনলতা রাজী হয়। সঙ্গে একজন বাগ্দী দিয়া দেয়—বিশ্বকে যেন সে সঙ্গে করিয়াই লইয়া আসে।

হেডমাষ্টার মহাশয়ের স্ত্রীর প্রতি ছেলের এত টান বনলতার কাছে কেন জানি অস্বস্তিকর লাগে—কেন সে কি কোনও ত্রুটী রাখে ছেলের আদর যত্নের? তবু ছেলের মন বাইরে বাইরে।

বিশ্বজিতের সেদিন একটাও অঙ্ক ভুল হয় না। এমন সুন্দর করিয়া বুঝাইয়া দেয় মাসীমা। একটুও বকেন না—একবারেই না বুঝিতে পারিলেও। আর বাড়ীর মাষ্টারমশাই কথায় কথায় কানমলা দেন আর বকুনি।

বনলতার কড়া আদেশ ছেলেকে যেন শাসনে রাখা হয়। বিশ্বর উহাতে সব কিছুই যেন আরও গোলমাল হইয়া যায়।

রেল লাইনের ধার দিয়া স্কুলে যাওয়ার পথ। বিশ্বজিতের বড় ভাল লাগে এই সরুরাস্তাটা। রাস্তার মোড়ে একটা বড় তেঁতুল গাছ, ঠিক সাজনপুরের সেই গাছটার মত দেখিতে।

স্কুল হইতে ফেরার পথে একদিন বিশ্বজিৎ দেখিতে পায় একটি ছোট্ট মুসলমান মেয়ে আঁকশি দিয়া তেঁতুল পাড়ার দারুণ চেষ্টা করিতেছে। শতচেষ্টা করিয়াও মেয়েটী উপরের ডালটা নামাইতে পারেনা।

বিশ্বজিৎ বই হাতে দাঁড়াইয়া পড়ে। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখে

সে মেয়েটির বৃথা চেষ্টা। বেশ মজা লাগে দেখিতে ছোট মেয়েটির এই হয়রানি। কেন জানি হঠাৎ শঙ্করীর কথা মনে পড়িয়া যায়। এক মুহূর্ত্তেই মনটা ভিজিয়া উঠে। একটু আগাইয়া যায় সে। বইগুলি মেয়েটির হাতে দিয়া বলে, 'দাঁড়া, আমি পেড়ে দিচ্ছি।'

বিশ্বজিৎ ছোট্ট একটি ডালে উঠিয়া আঁকশি দিয়া অনেকগুলি তেঁতুল পাড়িয়া দেয়। মেয়েটি ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া দেখে। বিশ্বজিৎ গাছ হইতে নামিয়া জিজ্ঞাসা করে; 'কি নাম রে তোর?' 'আশমানী', ছোট্ট উত্তর দেয় মেয়েটি। বিশ্বজিৎ তাকাইয়া দেখে—কেমন আবার নোলক পরিয়াছে ঐটুকু মেয়ে।

পরের দিন স্কুল হইতে ফেরার পথে বিশ্ব লক্ষ্য করে—খালের ওপার হইতে আশমানী তাহারই সমবয়সী একটি ছেলেকে, তাহাকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতেছে।

বিশ্বজিৎ ইশারায় ডাকে উহাদের। ছেলেটি আশমানীরই ভাই। নাম জবেদারী। অল্পক্ষণেই আলাপ জমিয়া উঠে। বিশ্বজিতের খুব ভাল লাগে উহাদের। জবেদারী তাহার বাড়ী হইতে নূতন গুড়ের পাটালি আনিয়া খাইতে দেয় দোস্তকে।

খালের ধারে ছোট্ট একটি মুসলমান পাড়া। ছোট ছোট ছনের ঘর, দুই একটা টিনের দোচালা। ছনের চালের উপর লাউগাছ লতাইয়া উঠিয়াছে। ছোট ছোট লাউও ধরিয়াছে বিস্তর।

বাড়ীর সামনেই সামান্য জমি লইয়া ছোট ছোট তরকারির বাগান, পেঁয়াজ ক্ষেত। ক্ষেতের আশে পাশে রং বেরংয়ের মুরগিগুলি বাচ্চাগুলিকে লইয়া ঘুর ঘুর করিয়া বেড়ায় আর মাঝে মাঝে খুটিয়া খুটিয়া কি খায়।

সামনেই ঘাসের উপর ছেলেরা ডাংগুটি খেলে। বিশ্বজিৎ রোজই

স্কুল হইতে ফেরার পথে দাঁড়াইয়া উহাদের খেলা দেখে। তাহারও ইচ্ছা করে উহাদের সাথে খেলিতে। জবেদারী বিশ্বকে ডাকিয়া লয় খেলিতে। বিশ্ব ডাংগুটি খেলায় জবেদারীকে হারাইতে পারে না।

জবেদারী মাদ্রাসায় পড়ে। কিন্তু পড়িতে তাহার একটুও ভাল লাগেনা। শীগ্‌গীরই সে তাহার বাজানের সঙ্গে কেরায়ার নৌকায় যাইবে, কত বড় বড় নদী পাড়ি দিতে হইবে—মেঘনা পদ্মা ধলেশ্বরি আরও কত!

বিশ্বজিৎ অবাক হইয়া শোনে আর মনে মনে ভাবে সেও যদি যাইতে পারিত জবেদারীব সঙ্গে।

স্বজিৎ একদিন বনলতাকে নালিশ করিয়া দেয। 'বিশ্ব ছোট-লোকদেব সঙ্গে ডাংগুটি খেলে।'

বনলতা চটিয়া আগুন হয়। 'তাহাদের বাড়ীর ছেলে—সে গিয়াছে কিনা ছোটলোকদের সঙ্গে খেলিতে। আক্কেলও একটু নাই ছোড়ার।' বাড়ী আসিলেই বিশ্বজিৎকে কান ধবিয়া একটা ঘবে বন্ধ কবিযা বই দিয়া বসাইয়া বাখে। 'আজ আব খেলতে যেতে পাবে না—যতসব ছোটলোকদের সঙ্গে মেলামেশা।'

বিশ্বজিৎ ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠেনা কেন মাব এত রাগ কি দোষ করিয়াছে সে! দূর হইতে বল খেলার শব্দ কানে আসে। বিশ্বের মন উস্‌খুস্‌ করিতে থাকে। সারাদিনের মধ্যে এই সময়টুকুই তাহার সবচাইতে প্রিয়। বৈকালেব ছায়া পড়িতে না পড়িতেই মন উতলা হইয়া ছোটে উন্মুক্ত খেলার মাঠের দিকে।

স্বাধীন ভূমির উপর স্বাধীন মনের কোলাহল। বলটার পিছনে ছুটিতে ছুটিতে চলিয়া যায় কিশোর মন। অদ্ভুত উত্তেজনায় প্রাণপণ শক্তিতে ছুটিতে থাকে।

দূর হইতে 'গোল' দেওয়ার শব্দ কানে আসে। বদ্ধ ঘরে বসিয়া বসিয়া বিশ্বজিৎ মাঠের কথা ভাবে। সন্ধ্যা হয় হয়। ক্ষ্যান্ত ধূপবাতি লইয়া আসে ঘরে। চুপি চুপি বলে, "আর ওসব ছেলের সঙ্গে মিশোনা।" তারপর জোরে জোরে বলে, "বোনদি এবার ওকে ছেড়ে দিন, আর কোনদিন ও যাবেনা।"

বনলতারও মনটা নরম হইয়া উঠে। মনে মনে ভাবে, 'আর কখনও শাসনের বাইরে যাবে না।' কিন্তু বিশ্ব গুম হইয়া থাকে। মনে মনে ভাবে—নীমুর মা যদি তাহার মা হইত!

রাত্রিতে বিছানার এককোণে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়ে সে। বনলতা আবার একটু ঝাঁঝিয়া ওঠে, "কেন আমার গায়ের বাতাস কি ভাল লাগেনা"—বলিয়া ছেলেকে কাছে টানিয়া লয়।

নারীজীবনের ব্যর্থ হতাশা গুমরাইয়া উঠে। বুকের ভিতরে কি একটা অসহ্য তোলপাড়—কেন? সে কি ছেলেকে ভালবাসেনা? ঐ ছোট্ট কচি হাতদুইটি দিয়া সে কেন তাহার গলাটা জড়াইয়া ধরেনা?

ছেলের কিসের অভাব রাখিয়াছে সে? এত সাচ্ছন্দ্য দিয়াও ছেলেকে বশ করিতে পারিতেছে না কেন? পেটের ছেলে হইলে কি আর এমন হইতে পারিত! বিধাতার বিরুদ্ধে এক অবরুদ্ধ আক্রোশে বনলতার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠে। এত রূপ, এত প্রতিপত্তি, অর্থ, তবু তাহার এ কি পরাজয়? নিঃশব্দে কাঁদে সে।

ধীরে ধীরে শান্ত হয় বনলতা। শুধু একটা অবুঝ বেদনার চাপ থাকিয়া যায় বুকের ভিতরে।

নূতন একজন মাষ্টার আসিয়াছেন স্কুলে। স্কুলের বোর্ডিং বাড়ীতে থাকেন। শচীনবাবুর প্রতি অল্প কয়দিনেই আকৃষ্ট হয় বিশ্বজিৎ। কি সুন্দর এক স্নিগ্ধ পবিত্র ভাব চোখে মুখে মৃদু উজ্জ্বল হাসি।

বোর্ডিং বাড়ীর পূবের দিকের ছোট্ট একখানি ঘরে থাকেন তিনি। একখানি পরিব্রাজক বিবেকানন্দের ছবি টাঙান ঘরে। তারই নিচে একখানি আসন পাতা। সামনে জলচৌকির উপর গীতা। শচীনবাবু সুললিত গুরুগম্ভীর কণ্ঠে সংস্কৃত পড়েন। একটা অপূর্ব স্বর্গীয় ভাব ফুটিয়া উঠে তাহার প্রশান্ত ললাটে।

বিশ্বজিৎ মুগ্ধ হইয়া শোনে—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিত
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।"

বিশ্বজিতের মনে হয়—এই গুরুগম্ভীর সংস্কৃত শ্লোকের মধ্যে কি যেন লুকাইয়া আছে। সেও শচীনবাবুর নিকট হইতে একখানা গীতা সংগ্রহ করে। খুব ভোরে পড়ার ঘরে দুয়ার বন্ধ করিয়া সে গীতা মুখস্ত করে—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!
অভ্যুত্থানম্ ধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

শচীনবাবুর নিকট হইতে একখানি রামকৃষ্ণ কথামৃতও আনিয়া পড়িতে আরম্ভ করে। এতদিনে সে যেন একটা পথের সন্ধান পাইয়াছে। তাহার কিশোর মন এক উজ্জ্বল আশায় আপ্লুত হইয়া উঠে।

বিশ্বজিৎ শচীনবাবুর নিকট হইতে সংস্কৃত শ্লোকের অর্থ বুঝিয়া লয়। সব অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেনা। তবু তাহার মনে হয় ঐ পুণ্যধারা শ্লোকের মধ্যেই সব দুঃখ অবসানের মন্ত্র লুকান রহিয়াছে।

নূতন ভাবধারায় বিভোর বালক বিশ্ব। বেশ কিছুদিন কাটিয়া যায়।

একদিন স্কুল হইতে বাড়ী আসিয়া দেখে কাকাবাবুর কাছে একজন খদ্দর পরিহিত ভদ্রলোক আসিয়াছেন কি কাজে। ঐ অঞ্চলের খ্যাতনামা স্বদেশীকরা লোক—শিবশঙ্করের বাল্যবন্ধু।

ভদ্রলোকটি গাড়ি-বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে শুইয়া শুইয়া বিশ্বজিতের সঙ্গে আলাপ করেন। এতবড় একজন স্বদেশীকরা ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলিতে পারিয়া বিশ্বজিৎ মনে মনে খুশি হয়। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন "কি জাতীয় বই পড়তে তুমি ভালবাস ?"

বিশ্বজিৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া শচীনবাবুর সঙ্গে গল্প করে। 'কি চমৎকার গীতাব শ্লোকগুলি।'

বিশ্বজিৎ তন্ময় হইয়া আবৃত্তি করিয়া যায়—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত।

অপূর্ব কণ্ঠস্বব। ভদ্রলোকটি মুগ্ধ হন।

তাহাব বলাব ভঙ্গীতে একটা অপার্থিব তন্ময়তা লক্ষ্য করিয়া কি যেন একটু চিন্তা করেন তিনি। 'আশ্চর্য্য, এতটুকু ছেলের মধ্যে এই বৈবাগ্যের ভাব!'

আবও নানা বিষয়ের অনেক গল্প করেন তিনি বিশ্বজিতের সঙ্গে। পরে তাহাকে বুঝাইয়া বলেন, "শুধু গীতাব শ্লোক মুখস্ত ক'রে কোন লাভ হবেনা বিশ্ব।"

তাঁহার কণ্ঠস্বরে তেজোদ্দীপক সুর ফুটিয়া উঠে। স্থির দৃষ্টিতে বিশ্বজিতের দিকে তাকাইয়া আরও গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, "মরতে পাব ?" অদ্ভুত প্রশ্ন! বিশ্বজিৎ বিহ্বল হইয়া পড়ে।

তাঁহার স্থির আয়ত দৃষ্টি বিশ্বজিতের ভিতর পর্যন্ত যেন প্রবেশ করে। তাহার মনে অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ খেলিয়া যায়। সে বিহ্বলের মত তাকাইয়া থাকে। ভদ্রলোকটি বলিতে থাকেন—গুরু গম্ভীর কণ্ঠস্বর—"গীতার

কথামত কাজ করতে পারাটাই হচ্ছে গীতার প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধা দেখান। মানুষের সবচাইতে বড় কাজ, শত্রুকে ধ্বংস করা। আজকের দিনে তোমার দেশমাতার সব চাইতে বড় শত্রু কে?"

তিনি জিজ্ঞাসু নেত্রে বিশ্বজিতের দিকে তাকান। তারপর আবার বলিতে থাকেন, "গীতা পড়ে যে প্রেরণা পাচ্ছ তাকে উদ্‌বুদ্ধ করতে হবে দেশমাতার শত্রু নিধন কাজে। শুধু ধ্যানস্থ হ'য়ে গীতার শ্লোক মুখস্থ করা বৃথা।"

তাঁহার ওজস্বী কণ্ঠস্বর বিশ্বজিতের ভিতর পর্যন্ত যেন নাড়া দিয়া যায়। তিনি বলিয়া যান, "ভাল ভাল জীবনী পড়, প'ড়ে গীতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখ, দেখবে তাঁরাই গীতাকে যথার্থ প্রতিফলিত করছেন তাঁদের কর্মজগতে।"

বিশ্বজিতের মনে আবার নূতন চিন্তা প্রবেশ করে। 'দেশমাতার কাজ!' কথাটা ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে নাড়া দিতে থাকে।

বিশ্বজিৎ থার্ডক্লাসে উঠিয়াছে। স্কুলের গিফ্‌ট্। ছেলেরা সেই উপলক্ষে 'শিবাজী' অভিনয় করিবে। বিশ্বকে শিবাজীর পার্ট দেওয়া হইয়াছে। তাহার রিহার্শেল শুনিয়া মাষ্টার মহাশয়রা খুব প্রশংসা করেন।

কথাটা রাধামোহনবাবুর কানে যায়। তিনি ছেলেদের এসব হল্লা-হুজুগ মোটেই পছন্দ করেন না। উহাতে ছেলেদের পড়াশুনার ব্যাঘাত হয়। সেইদিনই সন্ধ্যায় তিনি ছোটকর্ত্রীকে সংবাদটা জানাইয়া সতর্ক করিয়া দেন—'বিশ্বর মাথাটা এবার একেবারে নষ্ট হবে।'

ছোটকর্ত্রীও এইসব পছন্দ করেন না। ছেলের নৈতিক চরিত্র ঠিক রাখিতে হইবে ছোটবয়স হইতেই। বনলতা বিশ্বকে ডাকিয়া কড়া হুকুম দিয়া দেয়, "থিয়েটার টিয়েটার করা চলবেনা এবাড়ীর ছেলে হয়ে।"

আস্পর্দ্ধা কত? তাহাকে একটু জিজ্ঞাসা করাও দরকারই মনে করে না।

আর মাত্র দুইদিন বাকী স্কুলের পুরস্কার বিতরণের ; এখন বিশ্বজিৎকে যদি আসিতে না দেয় বাড়ী হইতে তবে অভিনয় একেবারে পণ্ড।

ছাত্রদের উৎসাহ নিভিয়া যায় এই সংবাদে। বিশ্বজিৎ চুপ হইয়া থাকে। শিবাজীর পার্টটা সে এত সুন্দর করিয়া শিখিয়াছিল। পদে পদে এত বাধা। তাহার মন বিরূপ হইয়া উঠে। অথচ অমান্য করারও উপায় নাই।

নীমু গিয়া সংবাদটা তাহার বাবাকে জানায়, "বাবা, বিশ্বকে নাকি অভিনয় করতে দেবেন না বিশ্বর মা।" "বলিস কি?" হেডমাষ্টার মহাশয় অবাক হইয়া প্রশ্ন করেন। ছেলের মুখে সব শুনিয়া ছয়আনির ছোটকর্ত্রীকে একখানা পত্র দিয়া পাঠান।

অগত্যা অনিচ্ছাসত্বেই মত দেয় বনলতা নায়েবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া। হেডমাষ্টার মহাশয় নিজে লিখিয়াছেন, আর আপত্তি করাটা শোভন হয় না।

ছাত্ররা সবাই আবার খুশি হইয়া উঠে। বিশ্বজিৎ নীমুকে সংবাদটা দিতে যায়। গিয়া দেখে তাহার এক মামাত বোন আসিয়াছে তাহাদের বাড়ীতে। কলিকাতা হইতে আসিয়াছে সে। নীমু তাহার ছোড়দির সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেয় বিশ্বকে।

লাজুক ছেলে বিশ্বজিৎ মোটে কথাই বলিতে পারে না। কিন্তু মনে মনে খুবই ভাল লাগিয়া যায় তাহার শান্তাদিকে। কি সুন্দর কথাবলার ভঙ্গি দুষ্টু হাসিভরা চোখদুইটি। "তুমিই নিমুর বন্ধু বিশ্বজিৎ! সুন্দর নামটাত!" শান্তাদি বিশ্বর হাতটা একটু নাড়িয়া দিয়া বলে, "বাবা, কি লাজুক ছেলে। ইতিহাসে রাক্ষসের মত অত নম্বর পাও কি ক'রে?"

বিশ্বজিৎ লজ্জিত হইয়া মনে মনে ভাবে, 'শান্তাদি অঙ্কের নম্বরটাও শুনিয়াছে নিশ্চয়।'

শান্তাদিরও অঙ্ক ভাল লাগেনা, ইতিহাসই সে ভালবাসে। নীমুর সঙ্গে তর্ক লাগিয়া যায়। নীমু ঠোঁট-উল্টাইয়া বলে, "অঙ্ক ছাড়া কোন সায়েন্সই হয় না।" শান্তাও দমিবার মেয়ে নয়। সেও কেমন মিষ্টি গলায় প্রতিবাদ করে, "ইতিহাস না জানলে দেশইত গ'ড়ে তোলা যায়না। দেশই যদি না টিকলো তবে শুধু বিজ্ঞান দিয়ে কি উপকার হ'বে বলোত?"

এর মধ্যে নীমুর মা আসিয়া বাধা দিয়া বলেন, "চল, খেতে চল। আর নীমু, বিশ্ব, তোমরা অভিনয়ের কথা ভুলেই গেলে নাকি?"

খাইতে খাইতে শান্তাদি বিশ্বকে প্রশ্ন করে, "জীবনী পড়তে ভালবাসনা তুমি? ম্যাট্‌সনি, ডি ভ্যালেরা, এসব বই পড়েছ?"

বিশ্বজিৎও জীবনী পড়িতে ভালবাসে কিন্তু এসব বইয়ের নামওত সে কখনও শোনে নাই। শান্তা আবার একটু স্বর নামাইয়া জিজ্ঞাসা করে, "দেশের ডাক পড়েছো?"

বিশ্ব একটু অবাক হয়—এত নিচু গলায় বলে কেন শান্তাদি? কি আছে সে বইয়েতে?...

অনেক রাত্রিতে বাড়ী ফেরার পথে শান্তাদির সঙ্গে আবার দেখা হয়। বিশ্বর হাতটায় এক ঝাঁকুনি দিয়া বলে, "উঃ কি সুন্দর অভিনয় করেছ তুমি! আমিও যে তোমার admirer হয়ে পড়বো দেখছি। সত্যি চমৎকার করেছ তুমি।"

সহরের মেয়ে শান্তাদির মুখে তাহার এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনিয়া বিশ্বজিৎ লজ্জিত হইয়া উঠে। কিন্তু মনটাতে একটা খুশির আমেজ লাগিয়া থাকে।

পরের দিন স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিয়া বিশ্বজিৎ শুনিতে পায়—তাহার দাদু ভাইর চিঠি আসিয়াছে—তাহাকে দেখিতে আসিবে শীঘ্রই। দুই বছরের মধ্যে তাহার দাদু ভাই আর আসেন নাই, মাঝে মাঝে চিঠি পত্র দিয়া খোঁজ খবর নেন শুধু।

বিশ্বজিৎ এখন বড় হইয়াছে। এইটুকু সে খুব ভালভাবেই বুঝিয়াছে, দাদু, দিদি, মাসীমার উপর তাহার আর কোনও অধিকার নাই। এই বাড়ীই তাহার আপন করিয়া লইতে হইবে। এই তাহার বাড়ী।

তবু আজ এতদিন পর দাদু ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হইবে ভাবিয়া মনটা খুশি হইয়া উঠে। চিঠি খানা পড়িতে পড়িতে চোখে মুখে একটু হাসি খেলিয়া যায়। বনলতার চোখ এড়ায় না। তাহার বুকের ভিতরে একটা কাঁটা বিঁধিতে থাকে যেন।

বিশ্বজিৎ মনে মনে ভাবে—শঙ্করীকেও লইয়া আসিতে লিখিবে। উপরে পড়ার ঘরে গিয়া পোষ্টকার্ড লইয়া বসে।

হঠাৎ কানে আসে মার তীক্ষ্ণ গলা। ক্ষ্যান্ত মাসীকে কি যেন বলিতেছেন—

"খাই দাই পাখীটি
বনের দিকে আঁখিটি।"

বারে বারেই ঐ ছড়াটার উপরই জোর দিয়া যেন মনের উত্তাপ ঝাড়িয়া ফেলিতেছেন। বিশ্বজিতের বুঝিতে বিলম্ব হয় না কাহার উদ্দেশ্যে এ উক্তি। ক্ষ্যান্ত উপলক্ষ মাত্র। এক মুহূর্তে তাহার মন বিষণ্ণ হইয়া যায়। বন্ধন, অসহ্য এ বন্ধন!

একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলিয়া পোস্টকার্ড খানা সরাইয়া রাখে। কি দরকার—এই অপমানের মধ্যে তাহার আদরের দিদিকে টানিয়া আনিয়া। বিশ্বজিতের ভিতর হইতে একটা কান্না যেন গুমরাইয়া গুমরাইয়া উঠে।

সোনার শিকল পরা পাখীর মত ডানার ছটফট করা সার। বিশ্বজিৎ টেবিলের উপর মুখ গুঁজিয়া চোখের জল ফেলে—'উঃ দিদিগো, তোমরা কেউ কিছু জানলেও না। তোমরা শুধু আমার ঐশ্বর্যটাই দেখলে মাত্র।'

অনেকক্ষণ ঐ ভাবে পড়িয়া থাকে বিশ্বজিৎ। হঠাৎ সিঁড়িতে কাহাদের গলা শুনিতে পাইয়া চমকিয়া উঠে—নীমুর গলা না! তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলে সে। নীমু ও শান্তাদি আসিয়াছে। বিশ্বজিৎ প্রসন্ন হাসি দিয়া অভ্যর্থনা করে।

বনলতাও উপরে আসে—"নীমুর সেই মামাত বোন না। কোলকাতা থেকে এসেছে বুঝি?"

শান্তা তাড়াতাড়ি পায়ের ধূলা লইয়া নালিশের সুরে বলে, "মাসীমা, কি লাজুক ছেলে আপনার!" বনলতা মনে মনে ভাবে 'বেশ মেয়েটি।' শান্তা চট করিয়া বিশ্বর আলমারি খুলিয়া বই দেখিতে আরম্ভ করে। "বাপরে কত বই তোমার!" বনলতা একটু গর্ব অনুভব করিয়া বলে, "আমিই কিনে দিয়েছি সব। নূতন একটা শেলফও বানাতে দিয়েছি—"

শান্তা মুখের কথা টানিয়া লইয়া বলে, "বারে, আপনিইত দিয়েছেন। মা ছাড়া কে আবার দিতে আসবে ওকে এ সব?"

বনলতা একটু থতমত খাইয়া যায় মেয়েটির এইরূপ স্পষ্ট মন্তব্যে। মনে মনে ভাবে, 'সহরের মেয়েদের কথায় এতটুকু আড়ষ্টতা নেই—কেমন ঝর-ঝরে কথাবার্তা। কাপড় পরার ধরনই বা কেমন পরিপাটি!'

বিশ্বজিৎ একটু বিব্রত বোধ করে মার বোকামি শান্তাদির কাছে ধরা পড়ায়। শান্তা একমনে বই দেখিয়াই চলে।

বনলতা নীচে চলিয়া যায় উহাদের জন্য জল খাবার ঠিক করিতে।

তাহাব বিশ্ব বোজই উহাদেব বাড়ী গিয়া কত কি খাইয়া আসে। তাহার বাড়ীতে উহাদেব মিষ্টিমুখ কবাইযা দিতে না পাবিলে সম্মান থাকে না। বনলতা নায়েবকে ডাকিযা বাজাবে লোক পাঠায মিষ্টি কিনিতে।

শান্তা বই দেখা শেষ কবিযা বিজ্ঞেব ভঙ্গীতে মন্তব্য করে, "বিশ্ব, তোমাব ভাল বইর স্টক কিন্তু খুব 'পুযোব'। সবহাবাদেব গান, নজরুলেব সঞ্চিতা, এ সব বইই যদি না থাকে, তবে বই কি শুধু ছেলেমানুষী অ্যাড-ভেঞ্চাবেব গল্প। সে ত বাচ্চা ছেলেদেব জন্য।" বিশ্বজিৎ শান্তাব মন্তব্য শুনিযা অপ্রস্তুত হয মনে মনে। সে ঠিক কবে শান্তাদিব নিকট হইতে ভাল বইব লিষ্ট লিখাইযা রাখিবে।

"শুধু নিজে পডলেই হ'বে না কিন্তু, ভাল ভাল ছেলেদেবও পডতে দে'ব।" আদেশেব সুব ফুটিযা উঠে শান্তাব কণ্ঠ স্ববে। বিশ্বব যেন সে আদেশ অমান্য কবাব কোন অধিকাবই নাই।

"চলো এবাব, একটু বেডিযে আসি নদীব ধাব দিযে। তোমাদের যমুনা নদীই দেখা হযনি এত দিনে।"

বনলতা বেডাইতে যাইবাব কথা শুনিযা ছেলেব জন্য সোনাব বোতাম, সিল্কেব পাঞ্জাবি বাহিব কবিযা দেয। মনে মনে ভাবে, 'সহবেব মেযে আসিযাছে, একটু দেখিয়া যাক্', কিন্তু শান্তা আবাব হাসিয়া খুন, "ও কি বিশ্ব, তুমি কি জামাই বাবু হতে চাও নাকি এই বযসেই।"

বিশ্বজিৎও সাজ সজ্জা একেবাবেই পছন্দ কবে না। তবু মাব কথায প্রতিবাদ কবাব উপায নাই। সুজিতেব চাইতে কোন অংশে কম না থাকে তাহাব ছেলে—বনলতা সে বিষযে সর্বদাই সতর্ক। কেহ যেন বলিতে না পাবে—পেটেব ছেলে নয বলিযা বনলতা কোনও ত্রুটি রাখিয়াছে।

শান্তাদিব সামনে এই জামা কাপড পবিতে বিশ্বজিৎ কিছুতেই রাজী

হয় না। মৃদু আপত্তি জানায় সেও। বনলতা মনে মনে রুষ্ট হইয়া স্মৃতির সার্ট বাহির করিয়া দেয়।

নদীর ধার দিয়া চলিতে চলিতে নীমু বিশ্বর কানে ফিস ফিস করিয়া বলে, "জানিস, ছোড়দি রিভলবার ছুঁড়তে জানে। তাদের দলে আমিও যাব।"

বিশ্বজিৎ অবাক হইয়া ভাবিতে থাকে, 'তাদের দল! কাহাদের লইয়া সে দল? কি করে তাহারা?'

তাহার মনে একটা অদ্ভুত অনুভূতির আলোড়ন সৃষ্টি হইতে থাকে।

চোখের সামনে কত রোমাঞ্চকর ভয়ঙ্কর ছবি ফুটিয়া উঠে সেই দল সম্বন্ধে। সেও যদি ঐ দলের ছেলে হইতে পারিত! বেশ লাগে ভাবিতে। আর দুই দিন পরেই শান্তা চলিয়া যাইবে। বিশ্বজিতের মনটা বিষণ্ণ হইয়া যায়। আর কোন দিন শান্তাদির সঙ্গে দেখা হইবে কি? না হওয়াই স্বাভাবিক। যাবার আগের দিন শান্তা বিশ্বর ছোট ডায়রী খাতায় লিখিয়া দিয়া যায়, "সময় হ'য়েছে নিকটে, এবার বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।"

মুগ্ধ হইয়া বিশ্বজিৎ বলিয়া ফেলে, "কি চমৎকার কথাটা।"

শান্তা চলিয়া গিয়াছে। প্রথম প্রথম কয়দিন বিশ্ব নিমুকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করে, "নিমু তোর ছোড়দির চিঠি এসেছে?"

নীমু উত্তর দেয়, "না, ছোড়দি ত চিঠি পত্র লেখে না কোনদিন। ঐ এক খেয়ালী মেয়ে—যখন আসবে খুব হৈ চৈ। ব্যাস, তারপর চলে গেলেই আর কোনও খবর নেই। টুপ মেরে যায় কোথায়।" বিশ্বজিৎ একটু বিমনা হইয়া যায়। 'শান্তাদির কত কাজ! তার কি আর বাজে সময় নষ্ট করবার অবসর আছে।'

সেও যদি তাহাদের মত হইতে পারিত !... এই বাড়ীটির বন্ধন যে করিয়াই হউক ছাড়াইয়া যাইতে হইবে। দম বন্ধ হইয়া আসে তাহার এই উঠিতে বসিতে 'না' এর গণ্ডীর মধ্যে। ভাল লাগে না তাহার এই প্রাচুর্য। সে এ বাড়ীর ভবিষ্যৎ জমিদার। কিন্তু মনের বন্ধন নাই যেখানে, সেখানে এই মিথ্যা প্রলোভন দিয়া নিজেকে শৃঙ্খলায়িত করিয়া লাভ কি ?

বিশ্বজিৎ মন শক্ত করে—যে করিয়াই হউক সরিয়া পড়িতে হইবে। আর দুর্বল হইলে চলিবে না। মাঠের এক কোণে বসিয়া তন্ময় হইয়া ভাবিয়া চলে বিশ্বজিৎ। তাহার এত প্রিয় ফুটবল খেলাও আর তাহাকে আকর্ষণ করে না।

অদূরে মাঠের বুকে ছেলেদের কোলাহল, বল মারার শব্দ কানে আসে। কিন্তু সেদিকে তাহার কোন খেয়াল নাই। গভীর ভাবে কি যেন চিন্তা করিয়া চলে বিশ্বজিৎ। হঠাৎ কাঁধে কাহার মৃদু স্পর্শে চমকিয়া উঠে সে। তাকাইয়া দেখে, সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি ছেলে, বলিষ্ঠ সুন্দর চেহারা।

"কি অত ভাবছিলে বিশ্ব ?" মৃদু হাসিয়া প্রশ্ন করে ছেলেটি।

বিশ্বজিৎ অবাক হয়—তাহাকে চিনিল কি করিয়া! হাসিয়া বলে নূতন ছেলেটি, "অবাক হলে, ত! সন্ধ্যা হয়ে এল, চল তোমার বাড়ী পর্যন্ত বেড়িয়ে আসি।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই বিশ্বজিৎ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে, এই নূতন চেনা সুব্রতদার সঙ্গে। মনে হয়, যেন বহু কালের পরিচিত তাহারা।

সুব্রত পর পর কয়দিনই ঠিক সন্ধ্যার আগে আগে খেলার মাঠে আসে। রোজই এটা সেটা দেশ বিদেশের গল্প করিতে করিতে বাড়ী পৌছাইয়া দেয় বিশ্বকে।

"গ্যারিবল্ডী, ম্যাটসিনি, এসব বই পড়েছ বিশ্ব ?"

বিশ্বজিৎ আগ্রহান্বিত হইয়া উঠে—শান্তাদিও ত বলিয়াছিল এই সব নাম। মৃদু-স্বরে উত্তর দেয় সে, "নাম শুনেছিলাম, কিন্তু স্কুলের লাইব্রেরীতে এ সব বই নেই তাই আর পড়তে পারিনি।"

"আচ্ছা তুমি পড়তে চাও ত আমি তোমাকে অনেক বইই যোগাড় করে দিতে পারি। প'ড়ে প'ড়ে ফেরৎ দিও তাহলেই হ'বে।" কয়েকদিন পর সুব্রত আর আসে না। হঠাৎ একটি ছেলে কয়েকখানা বই লইয়া আসে বিশ্বর কাছে। সুব্রতদা পাঠাইযাছে। নূতন ছেলেটিকেও এত ভাল লাগে বিশ্বজিতের—তাহাদের সকলেরই কথায় যেন অফুরন্ত প্রাণাবেগ।

বিশ্বজিৎ একদিনও কাহাকেও বাড়ী লইয়া যায় না পাছে মা অসন্তুষ্ট হইয়া কিছু বলিয়া ফেলেন। রেল লাইনের ধারে সবুজ ঘাসের উপর বসিয়া, সন্ধ্যার আবছাতে গল্প করে দুইজনে।

বনলতা লক্ষ্য করে অনেক রাত পর্যন্ত ছেলে পড়াশুনা করে। মনে মনে খুশি হয় ছেলের এই পরিবর্ত্তনে। বিশ্ব একদিন মাকে বলে, "আমার বিছানাটা উপরে পড়ার ঘরে দিলেই পার। মিছি মিছি তোমাদের এত রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে হয়।"

বনলতাও ছেলের পড়ায় ব্যাঘাত ঘটাইতে চায় না। তবু যাক এতদিনে সুমতি ফিরেছে—মনে মনে ভাবে। মুখে বলে, "কিন্তু ভয় পাবি না ত ?"

বিশ্বজিৎ হাসিয়া ফেলে, "কি যে বল ! তুমি কি চিরদিনই আমাকে তোমার আঁচলের তলায় রাখতে চাও নাকি !"

সেই হইতেই উপরের ঘরেই শোয় বিশ্বজিৎ। তাহার বেশ লাগে

এই নির্জ্জনতা। নিজেকে একান্ত করিয়া পাওয়া। গভীর রাত পর্যন্ত তন্ময় হইয়া সে বইগুলি যেন গিলিতে থাকে। মৌন নিস্তব্ধ রাত্রি। মাঝে মাঝে প্রহরগোনা পাখীগুলি ডাকিয়া উঠে সমস্বরে।

বিশ্বজিৎ পাতার পর পাতা উল্টায় এক নিঃশ্বাসে। কাল কাল অক্ষরে তাজা রক্ত ঝরা বিপ্লবের কাহিনী। অদ্ভুত উত্তেজনা মাথার ভিতরে। মনের ভিতর হইতে কে যেন বারে বারে বলিতে থাকে, 'সময় হ'য়েছে নিকটে, এবার বাঁধন ছিঁড়িতে হ'বে।'

জিলা রাজনৈতিক কর্মী সম্মিলন। লক্ষ্মীপুর হইতে মাত্র তিন মাইল দূরে।

নদীর ধারে মস্ত প্যাণ্ডেল উঠিয়াছে। শিবশঙ্কর রায়ের নিকট চাঁদা তুলিতে আসে পুরাতন স্বদেশী বন্ধুরা। শিবশঙ্করও দর্শক হিসাবে যাইবে। টিফিনের সময় সুব্রত লোক পাঠায় বিশ্বজিতের নিকট চাঁদা তুলিতে। বিশ্বজিৎ উৎসাহিত হইয়া ছাত্রদের নিকট হইতে চাঁদা তোলে। কনফারেন্সের সময় সুব্রত একটু বিভ্রান্ত হয় বিশ্বজিৎ সম্বন্ধে। অনুশীলন দলের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ মেলামেশা দেখিয়া মনে মনে চিন্তিত হয় সুব্রত—'শিবশঙ্কর রায়ের ভাই পো ত!' বিশ্বকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া সে বুঝাইয়া দেয় পরিষ্কার করিয়া—যুগান্তর ও অনুশীলন দলের বিভিন্ন কর্মধারা।

বিশ্বজিৎ কেমন একটু বিব্রত বোধ করে। মনে মনে অবাক হয়—একই কংগ্রেস, একই দেশ সেবার মধ্যে এই বিভিন্নতা!

কথাটা শিবশঙ্করেরও কানে যায়—বিশ্ব ভুলপথে চলিয়াছে। মনে মনে তিনি শঙ্কাতুর হইয়া উঠেন। আর দেরী করা উচিত নয়; এখনই রাশ টানিতে হইবে। বাড়ী আসিয়াই বৌঠানকে জানাইয়া দেয়,

"বিশ্ব কিন্তু খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করে; ওকে চোখে চোখে রাখবেন, না হ'লে পরে আর সামলাতে পারবেন না।"

দেওরের মুখে ছেলের এই অধঃপতনের কথা শুনিয়া বনলতা আগুন হইয়া উঠে। সেও দেখিয়া লইবে ছেলের কতবড় আস্পর্দ্ধা। মার কড়া শাসনে বিশ্বজিতের জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। একজন লোক তাহার স্কুল পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে যায়, আবার সঙ্গে করিয়াই লইয়া আসে ছুটির পর। সন্ধ্যার আগেই বাড়ী ফেরা চাই—বনলতার আদেশ। শাসনের বেড়াজালে বিশ্বজিৎ হাঁপাইয়া উঠে।

রবিবার দুপুর বেলা বিশ্বজিৎ ঘরে বসিয়া বসিয়া কি যেন চিন্তা করিতে থাকে। সুব্রতর কথা মনে পড়ে। বারে বারে সে বলিয়া দিয়াছে—'তোমার কাকাবাবুরা কিন্তু ভুল পথে চলেছেন। সাবধান—ব্যক্তিগত সম্পর্কটাই যেন বড় না হ'য়ে উঠে। সর্বদা মনে রাখবে আত্মীয়র চাইতে দেশ বড়।'

কাকাবাবুর সেই স্বদেশীকরা বন্ধুটির কথাও মনে পড়ে। কই কিছু অন্যায় ত তিনি বলেন নাই। সুব্রতদারাও ত ঐ একই কথা বলে। তবু কেন এই দলগত বিভেদ। কিছুই বুঝিয়া উঠে না বিশ্বজিৎ। বাহিরে দুয়ারে শিকল আঁটার শব্দ কানে আসে। মায়ের হুকুমে রবিবারে তাহাকে শিকল দিয়া রাখা হয় ঘরে।

অসহ্য! বিশ্বজিতের মন কঠিন হইয়া উঠে। কাকোরী ষড়যন্ত্রকারীর মামলার প্রচ্ছদ পটের সেই কাল পিস্তলটা চোখের সামনে জ্বল জ্বল করিয়া উঠে। যুগান্তর পার্টির ছেলে সেও। কানাইলাল, ক্ষুদিরামের 'বিদায় দে' মা, ঘুরে আসি'—গানটি তাহার মনের মধ্যে অদ্ভুত আলোড়ন সৃষ্টি করে। তার অধ্যুষিত মন সকরুণ প্রতিজ্ঞাকুলতায় মৌন হইয়া পড়ে।

নীমু কয়দিন যাবৎ লক্ষ্য করিতেছে, বিশ্ব যেন তাহার কাছ হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। আগের মত আর গল্প করে না। সব সময়ই কি যেন ভাবে। সেদিন খুব ভোরে কি মনে করিয়া বিশ্বজিৎ নীমুদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। নীমু হাসিয়া বলে, "উঃ কি সৌভাগ্য, তোমার দেখা মিললো এই বাড়ীতে।"

বিশ্বও হাসিয়া বলে, "তোমার ও ত দেখা পাই না খেলা নিয়ে যা মেতেছ।"

নিমু উত্তর দেয়, "তুমি ত খেলার মাঠ থেকে বিদায়ই নিয়েছ। সারাদিন কি এক বই পড়ার রোগই ধরেছে তোকে। সেদিন দেখলাম তোর ট্রানশ্লেসন খাতাটায় লেখা র'য়েছে—'এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন—আসিবে সেদিন আসিবে আবার।"

নীমু বিশ্বর গা ঘেষিয়া কাঁধে হাত রাখে, "বিশ্ব, তোর কি হ'য়েছে বলত?"

বিশ্বজিৎ লজ্জিত হয় মনে মনে, তার খেয়ালহীনতায়। বেশি আর দেরি করে না সে, "চলি নীমু।" যাবার সময় কি মনে করিয়া বিশ্ব মাসীমাকে নত হইয়া প্রণাম করে। তাহার চোখ যেন অকারণে জলে ভরিয়া উঠে। উমা অবাক হয়। তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া বলে, "হঠাৎ আবার এ খেয়াল?" বিশ্ব উত্তর দেয়, "মাঝে মাঝে মায়েদের আশীর্বাদ না নিলে মনে অভয় আসে না।" নীমু হাসিয়া ফেলে। সে জানে, তাহার বন্ধুটি ওরকমই খেয়ালি ছেলে। কখন যে কি তার খেয়াল, ধরার সাধ্য নাই। তাহার মনের রহস্যের কূল পাওয়া যায় না।

উমার মনটা কেন জানি একটু খচ খচ করিতে থাকে। তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করে, "সুখী হ'য়ো।"

পরের দিন নীমু আসিয়া খবর দেয়, "জান মা, বিশ্ব নাকি বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে। অদ্ভুত ছেলে সত্যি!"

উমা চুপ হইয়া যায় কথাটা শুনিয়া। মনে মনে ভাবে, 'এই জন্যই ও কাল প্রণাম করে গেল বিদায় নেবার আগে।' তাহার মন ভিজিয়া উঠে এই মা-হারা ছেলেটির জন্য।

বিশ্বজিৎ নারায়ণগঞ্জ চলিয়া আসে। মাঝ রাত্রে ষ্টীমার ছাড়ে। কি মনে করিয়া সে ষ্টীমারে উঠিয়া বসে। ষ্টীমারের বাঁশী বাজিয়া উঠে—নদীর কাল জল কাটিয়া ষ্টীমারের চাকা ঘুরিতে আরম্ভ করে। বিশ্বজিৎ হাঁফ ছাড়িয়া বাচে—মুক্তি—মুক্তি! রেলিংয়ের ধারে দাঁড়াইয়া তন্ময় হইয়া ভাবিতে থাকে সে। বিপ্লবী জীবনের প্রথম রোমাঞ্চ দোল খাইয়া যায় কিশোর মনে। 'চলার পথের' খণ্ড খণ্ড চিত্রগুলি ভাসিয়া উঠে চোখের সামনে।

বিশ্বজিৎ ভাবিয়া চলে। কলিকাতায় দাদাদের নিশ্চয়ই গুপ্ত আস্তানা আছে, সেখানে গোপনে গোপনে বিপ্লবের ষড়যন্ত্র চলিতেছে হয়তো। মুখোস-পরা মানুষের হাতে কাল কাল ভারী ভারী জিনিষ......কারাগৃহের লৌহ কপাট ভাঙ্গার পূর্ণ আয়োজন।

"ভাঙ্গনের পালা শুরু হ'ল আজি......"

ভোরের ঝির ঝিরে হাওয়ায় বিশ্বর মুখ ভাঙ্গিয়া যায়। তখনও আকাশ ফরসা হয় নাই। বিশ্বজিৎ উঠিয়া রেলিংয়ের ধারে দাঁড়ায়। নীচে কি একটা বন্দরে ষ্টীমার ভিড়িয়াছে। খালাসীরা সিঁড়ি টানিয়া ফেলিতেছে।

যাত্রীর ভিড়। আরেকটা সিঁড়ি দিয়া বস্তায় বস্তায় কি যেন উঠাইতেছে কুলীরা ষ্টীমারের ভিতর।

বিশ্বজিতের পাশেই একটি খদ্দর পরিহিত ভদ্রলোক রেলিংয়ের উপর

ঝুঁকিয়া কি যেন দেখিতেছে। নীচ হইতে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি কানে আসে। বিশ্বজিৎ তাকাইয়া দেখে—জাতীয় পতাকা হাতে ছাত্রদের এক শোভাযাত্রা আসিতেছে ষ্টীমার ঘাটে। মুহূর্তের মধ্যে ষ্টীমার ফাটাইয়া চিৎকার আরম্ভ হয়—

'জেম সেন গুপ্তকী জয় !'

বিশ্বজিৎ ও উহাদের পিছন পিছন নামিয়া পড়ে। ষ্টেশনের সামনেই একটা কাঠের পোষ্টে লেখা রহিয়াছে, "সুরেশ্বর বন্দর।" সেও সঙ্ঘ-ধ্বনি দিতে দিতে চলিতে থাকে শোভাযাত্রাব সঙ্গে। পাশের ছেলেটির সঙ্গে একটু আলাপও হইয়া যায় ; নাম দেবব্রত। নদীর ধার দিয়া বালি মাটির রাস্তা। দলে দলে লোক জমিয়াছে সভাপতিকে দেখার জন্য।

বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়া গ্রামের বৌঝিরাও উঁকি দিয়া দেখে। অস্ফুট গুঞ্জনও আরম্ভ হয় একটু, 'ওনার বৌও আসছেন নাকি! মেমসাহেব নাকি বৌ!'

বিশ্বজিৎ প্যাণ্ডেলের ধারে আসিয়া পড়ে।

নদীব ধারে উন্মুক্ত মাঠের বুকে, প্রকাণ্ড প্যাণ্ডেলটা পতাকার লহরী দিয়া সাজান। প্রবেশ পথে কলাগাছ, মাটির পূর্ণ কলস ও আম্রপল্লব। দুই ধারে বাঁশের বেড়ার লম্বা লম্বা ঘর—ডেলিগেটদের থাকার জন্য। ছোট ছোট চা ও পান সিগারেটের দোকান বসিয়াছে পথের দুই ধারে।

বিশ্বজিৎ হঠাৎ চমকিয়া উঠে পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া। তাহাকেই ডাকিতেছে—"বিশ্ব, বিশ্বজিৎ—" "আরে সুব্রতদা—" অবাক হয় বিশ্বজিৎ। খুশিতে জড়াইয়া ধরে তাহাকে।

সুব্রত তাহার কাঁধে হাত দিয়া বলে, "এরই মধ্যে গন্ধ পেয়ে গেছ? এতদূর আসতে দিল বাড়ী থেকে?"

"পালিয়ে এসেছো?" একমুহূর্তে সুব্রতর মুখের ভাব বদলাইয়া যায়।

চিন্তিত ছায়া পড়ে তাহার চোখে মুখে। সুব্রতর মুখের ভাবের এ পরিবর্তনে বিশ্বজিৎও দমিয়া যায়।

সাত দিন কাটিয়া যায় কনফারেন্সের হৈ-চৈ-তে। বিশ্বজিৎ ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে সঙ্গে কাজ করে, দারুণ উৎসাহে। রান্নাবাড়ীতে পরিবেশন করা হইতে প্যাণ্ডেলে চেয়ার টানা, কোন কিছুতেই উৎসাহেব অভাব হয় না।

কনফারেন্স শেষ হইয়া গেলে ডেলিগেটরা সব একে একে চলিয়া যায়। বাঁশের চালা, প্যাণ্ডেল, সবকিছুই আবার ভাঙ্গাচুরা আরম্ভ হয়। বিশ্বজিৎ আর সুব্রত একটা সন্ত-ভাঙ্গা চাটাইর উপর বসিয়া কথাবার্তা কয়। রৌদ্রস্নাত নদীর বুকে নিথর নিস্তব্ধতা। মাঝে মাঝে দুই একটা মাছধরার নৌকা ইলিশমাছের জাল ফেলিয়া চলিয়াছে।

সুব্রত গম্ভীর হইয়া বলে, "নরেশদা যা বলেন, তাই তোমাকে মানতে হবে।"

"কিন্তু বাড়ী আমি ফিরে যাব না কিছুতেই; তুমি আমার বাড়ীর অবস্থা জাননা কিনা, তাই বলতে পারছো।" বিশ্বজিৎ মৃদুস্বরে ব্যাকুল প্রতিবাদ জানায়।

নরেশদা আসিয়া পড়েন কিছুক্ষণেব মধ্যেই। মুখে পোড়াদাগ—শোনা যায়, বোমা বানাইতে গিয়া নাকি অতর্কিতে বোমা ফাটিয়া মুখ পুড়িয়া গিয়াছে। বিশ্বজিৎ সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখে। একজন সত্যিকারের বিপ্লবীর সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎ! বিশ্বজিৎ যেন ভাবিতেও পারিতেছেনা। কিন্তু চেহারায় ত কোনও বৈশিষ্ট্য নাই। ছোট্ট মানুষটির ভিতরে এত বিপ্লববহ্নি কি করিয়া লুকাইয়া আছে?

সুব্রতর সঙ্গে নিম্নস্বরে কথা হয় নরেশদার। "বিশ্ব ত কিছুতেই বাড়ীতে ফিরে যেতে চায়না।"

বিশ্বজিৎ আকুল হইয়া তাকায় নরেশদার দিকে। তাহার মিনতিভরা দৃষ্টি সজল হইয়া উঠে। ব্যাকুল হইয়া মনে মনে ভাবে সে, 'এত ক'রে যা-ও বাড়ীর বন্ধন থেকে মুক্ত হ'লাম আবার কোন লজ্জায় সেই বাড়ীতেই ফিরে যাব।'

নরেশদা প্রশ্ন করেন, "বাড়ীতে কে কে আছেন ?"—মনে মনে তলাইয়া দেখেন কিসের জন্য বাড়ী ফিরিতে চায়না এতটুকু ছেলে। তাহার করুণ দৃষ্টিটুকু নরেশদার চোখ এড়ায় না। কি একটু ভাবিয়া বলেন, "আচ্ছা, আপাততঃ থাক ও আমাদের সঙ্গেই।"

তাঁহার মনেও কেন জানি মমতা জাগে এই সদ্য পরিচিত বালকের জন্য। বিশ্বজিৎ হাঁফ ফেলিয়া বাঁচে। নরেশদার সঙ্গেই সে কলিকাতা আসে। সুব্রত বাড়ী চলিয়া যায়। ঢাকা জেলার কোন এক গ্রামে তাহার বাড়ী। তাহার কলেজ এখন বন্ধ, তাই সে বাড়ীতেই থাকিবে এখন। তাহার বাবা স্থানীয় স্কুলের হেডমাষ্টার ; ছোট ছোট ছুইটি ভাইবোনও আছে তাহার সেখানে।

বিশ্বজিতের যেন অবাক লাগে শুনিতে। সুব্রতদা, নরেশদা, এদেরও বাড়ীঘর, মা বাবা, ভাইবোন সবই আছে। উহা যেন বিশ্বাসই করিতে চায়না মন। আত্মীয়স্বজনের কথা মুহূর্তের জন্যও এদের মুখে শোনা যায় না। একটা রহস্যময় নির্লিপ্ততা। বিশ্বজিতের মন শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠে বিপ্লবীদের এই একনিষ্ঠ দেশপ্রেমের প্রতি।

কলিকাতায় আসিয়া নরেশদার বাড়ীতেই আছে বিশ্বজিৎ। সরু একটা অন্ধকার গলির ভিতরে, একতলায় ছোট্ট একখানা ঘর। সামনেই একটা রোয়াকের উপর এক হিন্দুস্থানী দোকানী বাদাম তেলে বেগুনী

ফুলুরি ভাজে সারাদিন। তেলেভাজার গন্ধে ছোট্ট ঘরখানি ভরিয়া যায়। ভাল করিয়া আলোবাতাস ঢোকেনা ঘরে। ঘরের কোনে একটা টেবিলের উপর কিছু কাগজপত্র ছড়ান। একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড টাইপরাইটার। আরেকদিকে একটা তক্তপোষের উপরে আধাখোলা একটা ময়লা মশারি। শতরঞ্চির উপর পরিত্যক্ত চায়ের গ্লাস।

অনেকরাত পর্যন্ত নরেশদা একটা টিমটিমে হ্যারিকেনের ধারে বসিয়া কারবন কাগজে কি যেন লেখেন। বিশ্বজিৎ মাদুরে শুইয়া শুইয়া পুরান বেণু পত্রিকাগুলি গিলিতে থাকে। আর মনে মনে ভাবে, নরেশদাও হয়তো কারাগার চুরমার করার সঙ্কেতই লিখিয়া যাইতেছে কাল কাল অক্ষরে। প্রতিহিংসার কালবীজ পাতায় পাতায় ভরিয়া উঠিতেছে।

প্রায় মাসখানেক একভাবেই কাটিয়া যায়। দুপুরে ও সন্ধ্যায় নরেশদা তাহাকে লইয়া একটা পাইস হোটেল হইতে ভাত আর ডাল কিনিয়া খাইয়া আসেন। তারপর সারাদিন কোথায় যে থাকেন নরেশদা, কিছুই জানে না। বিশ্বজিৎ সারাদুপুর পুরান পত্রিকাগুলির মধ্যেই ডুবিয়া থাকে।

একদিন দুপুরবেলা নরেশদার সঙ্গে নায়েববাবু আসিয়া উপস্থিত। নরেশদাই পত্র লিখিয়া আনাইয়াছেন তাহাকে। বাড়ীতে হুলুস্থুলু পড়িয়া গিয়াছে এই একমাস যাবৎ। তাহাকে খোঁজাখুঁজি করিয়া হয়রান সকলে। যেখানে যত আত্মীয় আছে সকলের নিকট চিঠি দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু বিশ্বজিতের খোঁজ পাওয়া যায় না।

নায়েববাবুকে দেখিয়া বিশ্বজিতের মুখ শুকাইয়া যায়। কিছুতেই বাড়ী যাইতে রাজি হয়না সে।

অগত্যা ঠিক হয়, সে এখানেই একটা স্কুলে ভরতি হইয়া পড়াশুনা করিবে। নরেশদাই তাহার ভার নেন। নায়েববাবুও এই যুক্তি ভালই মনে করেন। মনে মনে ভাবেন, 'দেশে থাকলে ত বাজে ছেলেদের সঙ্গে

মিশে আবার খারাপ হ'য়ে যাবে, তার চাইতে এই ভাল। ভাল স্কুলে ভর্তি হ'লে সুবুদ্ধিও ফিরবে।'

সেই হইতে বিশ্বজিৎ কলিকাতায় থাকিয়াই স্কুলে পড়ে। সেও ইহাতে খুশি মনেই রাজী হয় 'বাড়ীর বন্দী ত হ'তে হ'বেনা আর।'—মনে মনে ভাবে।

একদিন নরেশদা তাহাকে তাঁহার এক বোনের বাড়ী লইয়া যান।

বিশ্বজিৎ খুশি হইয়া উঠে, "শান্তাদি, তুমি এখানে!" শান্তাও খুশি হইয়া বলে, "তুমিই বুঝি সেই পালিয়ে আসা নাছোরবান্দা ছেলে? এদিকে আমাদেরত খুব সমস্যায় ফেলেছ! কাউকে না জানিয়ে শুনিয়ে এভাবে পালাতে হয় নাকি বাড়ী থেকে? এমন ছেলেমানুষ হ'লে কি আর বিপ্লবী হওয়া যায়?" তুইজনে গল্প করে অনেকক্ষণ।

শান্তা গর্বের সঙ্গে বলে, "কাজ আছে অনেক। জান না শীগ্‌গীরই আমরা যাচ্ছি সত্যাগ্রহ করতে কাঁথিতে।"

"তোমাদের সঙ্গে আমিও যাব তাহ'লে।"

শান্তা একটু মুরুব্বীর সুরে বলে, "কিন্তু জেলেও যেতে হ'তে পারে। আরও অনেক কিছু অত্যাচার—সইতে পারবে ত?"

সেইরাত্রেই বিশ্বজিৎ নরেশদাকে বলিয়া ঠিক করে সেও সত্যাগ্রহে যোগ দিবে। অনেকেই আপত্তি তোলে—এতটুকু ছেলে! কিন্তু নরেশদা বিশ্বজিৎকে চিনিয়া ফেলিয়াছেন এই কয়দিনেই—কাবু হইবার ছেলে সে নয়।

চৈত্রমাস। লাঙ্গলচসার প্রতীক্ষায় বন্ধুর ভূমি। শীতের শস্য কাটা হইয়া গিয়াছে।

সমর সজ্জায় প্রস্তুত সত্যাগ্রহীদল বন্ধুর ভূমির উপর দিয়া হাটিয়া চলে। কাটা শস্যের শুষ্ক ধারাল গোড়াগুলি প্রতি পদে পায়ের তলায় ফুটে। মাটিও যেন পাথরের মত শক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

মাথার উপরে রৌদ্রের তীব্রতেজ—পায়ের তলায় তপ্ত মাটির ক্ষেত, সম্মুখে সীমাহীন প্রান্তর। পথের যেন শেষ নাই। ঘামে ভিজিয়া গায়ের জামা সব শরীরের সঙ্গে চুপসাইয়া গিয়াছে।

খালি পায়ে চলিয়াছে বিশ্বজিৎ—মনে হয় পায়ের তলা দুইটা যেন কাটিয়া চির ধরিয়া যাইতেছে। পিপাসায় গলা কাঠ হইয়া যায়। টানিয়া লইয়া চলিতেছে যেন সে নিজেকে। এ সামান্য কষ্টে দমিলে চলিবে না।

এখনও কয় ক্রোশ পথ বাকী। বহুদূরে বন বনানীর সারি দেখা যায়। ধূ ধূ করে রৌদ্রেপোড়া নগ্ন ক্ষেতটা।

বৈকাল বেলা গন্তব্য স্থানে পৌঁছায় সত্যাগ্রহী দল। একটা টিনের চালার তলে শতরঞ্চি পাতিয়া শুইয়া পরে সকলে। বিশ্বজিতের মনে হইতে থাকে, তাহার পা'দুইটা যেন পাকিয়া গিয়াছে। পায়ের দুই এক জায়গায় কাটা ধান গাছের গোড়ায় কাটিয়াও গিয়াছে। শান্তার চোখ এড়ায় না।

"এ কি বিশ্ব, রক্ত পড়ছে দেখছি। এরই মধ্যে এই দশা!" কোথা হইতে একটু সরিষার তেল লইয়া আসে সে। "নাও বেশ ক'রে মেখে নাও ত; দেখবে, আরাম পাবে।"

পরের দিন খুব ভোরে লবন আইন ভঙ্গ করিতে চলে সবাই শোভাযাত্রা করিয়া। গ্রামবাসী সব সারি দিয়া দেখিতে আসে। নূতন কিছুর সম্ভাবনায় সকলেই স্থির হইয়া যায়, একটা ভয়মিশ্রিত আশঙ্কায়। আতঙ্কভরা সম্ভ্রম দৃষ্টি। সত্যাগ্রহীদের হাতে পতাকাগুলি কোন অতীত গৌরবের ঐতিহ্য ভরা, স্বাধীন মানবমনের রথধ্বজা।

জনতার গুঞ্জন কানে কানে ঘুরিয়া ফেরে; ভয়মিশ্রিত উৎকণ্ঠার জনকোলাহল।

"দেখেছিস কত কচি ছেলেও এসেছে!" "মেয়েও এসেছে!"

যেন কোন অমোঘ মন্ত্রে বলীয়ান দেবশিশুরা দানবের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে আসিতেছে—জয় নিশ্চিত!

এক সুরে গর্জিয়া উঠে—"দেশমাতাকি জয়—বন্দেমাতরম।"

নদীপ্রান্তরে প্রতিধ্বনিত হয় জয়মন্ত্র।

স্থির বনবনানী, স্থির জনতা, নরনারী।

দূরে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা যায়। মুহূর্তের মধ্যে লাল-পাগড়ি, পুলিশ, পল্টনে ভরিয়া যায় বালুভূমি। আমলাতন্ত্রের উপরওয়ালার ইশারায় অতর্কিত লাঠি চলে এলোমেলো মাথার উপরে। বিহ্বল, বিভ্রান্ত জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। সাদা বালির বুকে লাল রক্ত জমাট বাঁধিতে থাকে। নিস্তব্ধতার তরঙ্গে, তরঙ্গে প্রতিহিংসার নিষ্ফল আক্রোশ গুমরাইয়া উঠে। শৃঙ্খলাবদ্ধ সত্যাগ্রহীদল!

উঁচু দেয়ালঘেরা থানার একটা ছোট্ট ঘরে জমায়েত সকলে। নিথর স্তব্ধতা ঘরের মধ্যে। কঠিন প্রতিজ্ঞায় সচেতন হইয়া উঠে স্বাধীন মন।

একের পর এক ডাক পড়ে পাশের ঘরে। মাংসপেশী বলিষ্ঠ জমাদারের হাতে সরু ধারাল জোড়া বেত।

আদেশ হয় কুটিল ঘৃণ্যকণ্ঠে, "জামা খুলে ফেল্"। পিঠ-মোড়া করিয়া হাত বাঁধা বিচারাধীন আসামী। চোখের নৃশংস ইঙ্গিতে আরম্ভ

হয়—এক, দুই, তিন। সর্বাঙ্গে নীল রক্তের ডোরা কাটিয়া ফিনকি দিয়া রক্ত ছোটে।

উন্মাদ কণ্ঠস্বর গর্জিয়া উঠে, "বল, নাম কি তোর?"

দাঁতে দাঁত চাপিয়া থাকে বলিষ্ঠমন যুবক, পশুত্বের বিরুদ্ধে। দাসত্বের কাল অভিশাপ বাতাসে কুণ্ডলী পাকায়, কিন্তু উত্তর মেলে না। জমাদার ঘাম মোছে—বিহ্বল ভীত দৃষ্টিতে তাকায় উপরওয়ালার দিকে। হুকুম আসে, "লাগা আরও দশ ঘা!"

আবার ডাক পড়ে। বিশ্বজিৎ তাকাইয়া দেখে তাহারও চাইতে ছোট একটি ছেলে—বছর তের বয়স। মমতায় ভীত হইয়া উঠে সকলে। ভারি মুহূর্তগুলি। দেওয়ালের ওপিঠ হইতে শোনা যায়—ইঁটের গাঁথনির গায়ে আছড়াইয়া পড়ে, নির্যাতনের ক্ষুব্ধ আর্তনাদ 'আঃ'। সব শেষ। পরাস্ত ম্যাজিষ্ট্রেট।

আবার ঘরে ঘরে সম্বর্দ্ধনাকুল গৃহস্বামীরা আগাইয়া আসে। চোখে মুখে প্রসন্ন ভাব। গ্রেপ্তার করে নাই, ছাড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু এক মুহূর্তে নরনারী স্তব্ধ হইয়া যায়, তাহাদের দেহে নির্মম অত্যাচারেব এই ভয়াবহ চিহ্ন দেখিয়া।

প্রাথমিক সেবাযত্ন দিয়া, আহার্য দিয়া, আবার উষ্ণ করিয়া তোলে জমাট বাঁধা রক্ত। বিশ্বজিৎ শরীরের ব্যথায় নড়িতে পারে না; তবু মনে তাহার গর্বিত আমেজ তাহারা মাথা নত করে নাই; ঐ দাসত্বের পায়ে প্রাণ থাকিতে তাহারা করিবে না। গ্রামবাসীর চোখে স্নেহভরা শ্রদ্ধা ঝরে—'বীর ছেলে তোমরা।' দেশব্যাপী দারুণ আন্দোলন। সত্যাগ্রহ আর পিকেটিং। লোহার ডাণ্ডা আর গ্রেপ্তার।

আশায় উন্মুখ দেশবাসী। এ ত্যাগের, এ লাঞ্ছনার ফল অবশ্যম্ভাবী। সুদিন আগত। দূরে নয়, দেরী নয়।

বিশ্বজিৎ ও দেবব্রত ঢাকা চলিয়াছে একটা জরুরী কাজে। অন্ধকার রাত্রি। যমুনার উপর দিয়া ফেরী চলে।

বিশ্বজিৎ লক্ষ্য করে, একটা লোক তাহাদের পিছু লইয়াছে। একবার আসিয়া লোকটি জিজ্ঞাসাও করিয়া যায়—"কোথায় যাবে, এখানেই দেশ বুঝি?"

দেবু ফিস ফিস করিয়া বলিয়া দেয়, "সরে পড়। দরকার হ'লে destroy ক'রো।"

দেবু কোথায় যে উধাও হইল আর তাহার দেখা নাই।

ঘাটে ষ্টীমার লাগে। বিশ্বজিৎ তাহার ছোট্ট সুটকেসটি হাতে লইয়া নামিয়া পড়ে। রেলগাড়ী দাঁড়ান সামনেই। গাড়ীতে উঠিয়া দেখে সেই লোকটিও আসিয়া বসিয়াছে। গাড়ী ছাড়িয়া দেয়।

সামনেই লক্ষ্মীপুরের চর দেখা যায়। বিশ্বজিৎ কি মনে করিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়ে। অতি পরিচিত পথঘাট। তাহার বুকটা তখনও একটু ঢিপ ঢিপ করিতে থাকে—সেই লোকটি কি এখনও তাহার পিছু পিছুই আছে নাকি? দ্রুত পায়ে হাটে বিশ্বজিৎ। দীর্ঘ দুই বছর পর বাড়ী আসে সে। বাহির বাড়ীর সামনে একটা মালঞ্চলতার ভিতর কি যেন লুকাইয়া রাখে।

লোকজন সবাই খুশি হইয়া দেখে বিশ্বজিৎকে। ছেলে বাড়ী আসিয়েছে—বনলতা ছেলেকে দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হয়। ছেলের

মুখের দৃঢ়তাব্যঞ্জক ভাব লক্ষ্য করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর ভাবে, এ ছেলেকে আর ঘরে ধরিয়া রাখা যাইবেনা। তাহার সকল আশায় যে ছাই চাপা পড়িয়াছে, তাহা বুঝিতে দেরি হয় না। তবু ছেলেকে বোঝায়, "এখন পড়াশুনার সময়—এ ভাবে নষ্ট ক'রে নিজের ভবিষ্যৎ খুইয়ে পরে পস্তাবে। পরীক্ষার বছর এখন একটু মন দিয়েই লেখাপড়া ক'রো।"

শিবশঙ্করের সঙ্গে বনলতার কথাবার্তা হয়।

শিবশঙ্কর উপদেশ দেয় বৌঠানকে, "ওকে আর এবার ছেড়ে দেবেন না। চোখে চোখেই রাখবেন।"

কিন্তু তৃতীয় রাত্রি না কাটিতেই বিশ্বজিৎ আবার রওয়ানা হইয়া পড়ে নিঃশব্দে গভীর রাত্রির অন্ধকারে।

বনলতা ঘুম হইতে উঠিয়া গুম হইয়া বসিয়া পড়ে মাথায় হাত দিয়া আর অদৃষ্টকে গালাগালি দেয়, "এমন কপাল যেন সাত শত্তুরেরও না হয়।"

দিন কয়েকের মধ্যেই দারোগা আসে বিশ্বর খোঁজে। কাছারি বাড়ীতে দারোগাকে আদর আপ্যায়ন করিয়া চা খাওয়ায় শশীনাথ।

"বিশ্ব ত কোলকাতায় থেকে পড়াশুনা করছে—এবার তার ম্যাট্রিক দেবার কথা।" মোলায়েম স্বরে কথাবার্তা বলে নায়েববাবু।

কিন্তু যাইবার সময় বিশ্বজিতের ঠিকানা নিতে ভুল হয় না দারোগাবাবুর। সপ্তাহ না ঘুরিতেই আবার আসে দারোগা বিশ্বজিতের সংবাদের জন্য।

বনলতার বুক কাঁপিয়া উঠে, 'বিশ্বজিৎ ফেরার!' মাঝরাতেই বাড়ী-ঘর পুলিসে ছাইয়া ফেলে। ভোর হইতে না হইতেই খানাতল্লাশী হইবে। বাড়ীর লোকজন ঝি চাকর অবাক হইয়া পুলিসের কাণ্ড

দেখে ভয় বিহ্বল দৃষ্টিতে। চাউল, ডাল, ঘী, মুড়ি, খইর টিনগুলিও সব তন্ন তন্ন করিয়া কি খোঁজে। বিস্ময় ও বিরক্তিতে বনলতা স্তব্ধ হইয়া থাকে। মনে মনে শাপান্ত করিতে থাকে, "কি জাতের নাই ঠিক—পূজার জিনিষ সব ছুঁয়ে দিয়ে গেল শত্রুগুলি।"

থার্ডক্লাস কামরা।

উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলে রেলগাড়ী। গাঢ় অন্ধকার রাত্রি।

ছোট্ট একটা কি ষ্টেশনে গাড়ীটা থামে। বিশ্বজিৎ গলা বাহির করিয়া দেখে স্টেশনের নামটা।

"কুসুমপুর।" পরিচিত লাগে নামটা। শঙ্করীর শ্বশুর বাড়ী না!

বিশ্বজিৎ নামিয়া পড়ে।

বিসর্পিল সরু গ্রাম্যপথ। পায়ের তলায় বর্ষার ভিজা আর পচা পাতা।

মাঝে মাঝে দুই একটা ছোট ছোট বাঁশের বেড়ার ঘর হইতে টিম-টিম আলোর ঝিকিমিকি দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে অপরিচিত কণ্ঠস্বর—"কে যায় গো?"

"বোসের বাড়ীর পথ কোনটা?"

ঘরের ভিতর হইতে মেয়েলী কণ্ঠের কৌতুহলী গুঞ্জন শোনা যায়, "বোসের বাড়ীর নাঐর কে আসলোগো?" নানা গ্রাম্যমনের সহজাত প্রশ্ন—"বোসদের বড় বৌত বাপের বাড়ী। ছোট বৌরই বাপের বাড়ীর কেউ নাকি?"

কেহ উত্তর দেয়, "ছোটবৌর বাপ না রেঙ্গুন থাকে দ্বিতীয় পক্ষের বৌ-রে লইয়া।"

"তবে কে আসলো?"

বিশ্বজিৎ ঘরের ছনছা দিয়া হাটিয়া চলে। একটি বৃদ্ধলোক তাহাকে পৌঁছাইয়া দিয়া যায় বোসদের বাড়ীতে।

"দেখগো ছোট বৌ, কোন কুটুম আসলো তোমার বাড়ী।"

শঙ্করীর স্বামী জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করে। তহশিলে বাহির হইয়াছে সে। এক বৃদ্ধা দাই ও ছেলেমেয়ে লইয়া শঙ্করী একা বাড়ীতে। সে একটু অবাক হইয়া হ্যারিকেন লইয়া বাহিরে আসে। মনে মনে ভাবে। 'এত রাতে আবার কে এল!' হ্যাবিকেনের আবছা আলোতে দুখুকে দেখিয়া শঙ্করী বিহ্বল হইয়া পড়ে—"আরে দুখু!" কিছুক্ষণের মধ্যেই সামলাইয়া লয় নিজেকে।

বিশ্বজিৎ অবাক হয় বধূবেশী দিদিব এই নবগৃহিণী রূপ দেখিয়া। ছেলে মেয়ে দুইটি।

"এরই মধ্যে ছেলেমেয়ের মা হ'য়ে একেবারে পূর্ণ গৃহিণী।"

অনেক রাত পর্যন্ত দুইজনে গল্প করে। কথা যেন আর ফুবায় না।

"আচ্ছা দিদি, প'ড়োভিটায় সেই তেঁতুল খাওয়ার কথা মনে আছে তোমার?"

"সে সব দিন কি আর ভোলা যায় রে?"

বিশ্বজিতের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে—ছোট্ট দিদির সেই ঝাঁকড়া চুলগুলি। শঙ্করীর মেয়েটিও ঠিক মায়ের মতোই হইয়াছে। কেমন একটা মায়াধরান শ্রী। বিশ্বজিৎ মনে মনে ভাবে, 'এবা আমার কত আপন, অথচ কত পর হ'য়ে রইল।' শঙ্করী রান্না লইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠে সকালবেলা। কত কি যে করিতে ইচ্ছা করে তাহার! দুখু আসিয়াছে তাহার বাড়ীতে তাহার সেই কত আদরের ভাইটি। যেন বিশ্বাসও হইতে চায় না এ সৌভাগ্য। আবার কবে দেখা হইবে কে জানে! বারে বারে সে ভাইর মুখের দিকে তাকাইয়া দেখে।

সেই ছোট্ট দুখু কতবড় হইয়াছে। অকারণে চোখ ছল ছল করিয়া উঠে শঙ্করীর।

শঙ্করীর ছেলেমেয়ে দুইটিও মামার গা ঘেষিয়া বসে বারে বারে—একটুও ছাড়িতে চায় না। নূতন বলিয়া সঙ্কোচ নাই—শিশু দুইটি একদিনেই এত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। শঙ্করী কলার বড়া ভাজিয়া দেয় গরম গরম—দুখুব সেই প্রিয় বড়া।

বিশ্বজিৎ মনে মনে ভাবে 'দিদির ঠিক মনে আছে ত'—মাসীমা ভাজিতেন—আর তাহারা দুই ভাই বোনে গরম গরম উনানের পাশে বসিয়া খাইত। দিদির মধ্যেও একটা মা মা ভাব আসিয়া গিয়াছে।

শঙ্করীব মনে হয়—এই দিনটা যেন না ফুরায়। দুখু আবার চলিয়া যাইবে—শঙ্করী যেন ভাবিতে পারে না। মনে হয় যেন এ রকমই তাহারা চিরদিন ছিল।

শঙ্করী অনেক অনুরোধ করে ভাইকে, "আর একটা দিন থেকে যা—তোব জামাইবাবু দেখলেন না।" কিন্তু বিশ্বজিৎ কিছুতেই রাজী হয় না। তাহার থাকিবার উপায় নাই—দিদিকে তাহা বোঝান যায় না। বলারও উপায় নাই।

শঙ্করী বাহির বাড়ীর দুয়ার হইতে ভাইকে বিদায় দেয়। দুইচোখ জলে ভরিয়া উঠে।

বিশ্বজিতেরও বুকের মধ্যে গুমরাইয়া উঠে। একটা কাতর ছায়া পড়ে চোখের তাবায়। দ্রুতপায়ে হাটিয়া চলে সে—পেছনে আর তাকায় না।

একটা ঘুপচি গলির শেষ প্রান্তে টিনের ঘর। ঘরের মধ্যে চার পাঁচটি ছেলে কাহার প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হইয়া আছে। দেবু আসিয়া পড়িয়াছে তিন দিন হইল কিন্তু বিশ্ব এখনও পৌঁছায় না কেন। কাহারও চোখে ঘুম নাই।

শেষ গাড়ীটাও 'ইন' করে স্টেশনে। গাড়ী ছাড়ার শব্দ কান পাতিয়া শোনে সকলে। পাঁচ মিনিট, দশমিনিট আধঘণ্টা কাটিয়া যায়। সবাই চুপ হইয়া আছে নিঃশব্দে।

দুয়ারে টোকা পড়ে যেন, মৃদুগলার স্বরও শোনা যায় "দেবু।"

বিশ্বরই গলা। দুয়ার খুলিয়া দেয় সুব্রত।

সকলেই নিশ্চন্ত হয় 'যাক পৌঁচেছে।'

দেবু হাসিয়া বলে, "আমি ত ভেবেছিলাম জালে আটকে পড়লে বুঝি, যা ফলো সুরু করেছিল সেদিন।"

ঠিক হয় রাতারাতি নদী পার হইয়া থাকিতে হইবে।

নদীর ঘাটে গিয়া একটা নৌকা ভাড়া করে। চড়াখালের মুখে পার করিয়া দিতে হইবে। পাঁচজনে নৌকায় উঠিয়া বসে। মাঝি এক ছিলিম তামাক খাইয়া নৌকা ছাড়িয়া দেয়। "এত রাতে আপনারা কই থেইকা আইলেন?" "মেলের যাত্রী। গাড়ী আজ কত লেট ক'রে এল জান না?"

আধঘণ্টা কাটিয়া যায়। নৌকার ছইর ভিতরে উহারা কি কথা কয়, ইংরাজী বাংলায় মেশান টুকরা টুকরা কথা মাঝি কান পাতিয়া শোনে। কি যেন সন্দেহ হয় তার।

সুব্রত হঠাৎ লক্ষ্য করে মাঝি অন্য দিকে নৌকা লইয়া চলিয়াছে।

সে চেঁচাইয়া উঠে, "ওকি মিঞা, উল্টোদিকে চলছো যে !"

মাঝি নির্বিকার তবু। সুব্রত একটু উষ্মা প্রকাশ করিয়া বলে, "ওদিকে কোথায় চলছো ?" মাঝি নির্লিপ্ত সুরে উত্তর দেয়, "চলছি কই দেখবেনই, আপনাগো থানায় লইয়া যামু। আমি এককালে থানার পুলিসেব কাজ করতাম আপনাগো ভাব গতিক সুবিধা না।"

মুহূর্তেব মধ্যে সুব্রত কি স্থির করিয়া ফেলে, পকেট হইতে ছোট্ট একটা কাল জিনিষ বাহির কবিয়া বলে, "এই মুহূর্তে শেষ ক'রে ফেলবো, শীগ্গীর নৌকা ঘুরা ব্যাটা।"

তাহার চোখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। ভয়ে মাঝির হাত হইতে বৈঠা পড়িয়া যায় জলেব মধ্যে। দেবু চট্ কবিয়া ধরিয়া ফেলে বৈঠাটা। ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে থাকে মাঝি। সুব্রত পিস্তলটা নামাইয়া ধমকাইয়া উঠে, "বৈইঠা ঠিকমত চালা ব্যাটা যদি বাঁচতে চাস। আর দ্বিতীয় লোকের কানে যদি যায় একথা তবে যেখানেই থাকবি, ঠিক খুন হবি। জানিস আমরা কারা !"

হাতজোর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলে মাঝি,"আল্লার দোহাই, আমি কোনদিন মুখ খুলুমনা বাবু।"

ভয়ে ভয়ে সে বইঠা তুলিয়া লয়। কি একটু ভাবিয়া সুব্রত ঐ খানেই নৌকা ভিড়াইতে বলে।

পারে নামিয়া সুব্রত আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করে সকলকে, "দেবো নাকি শেষ করে ?"

বিশ্বজিৎ ভীত হইয়া উঠে মনে মনে, 'হয় তো কত ছেলেপুলে লইয়া বৌটা নিঃস্ব হইবে !'

দেবুও একটু আপত্তি জানায়, "ওপারে গিয়ে লোকজন ডাকেও যদি—ততক্ষণে আমাদেব পাত্তা আর কেউ পাবেনা।"

সুব্রত নীচে নামিয়া আসিয়া আবার স্মরণ করাইয়া দেয় মাঝিকে "যদি শয়তানি করে জীবন্ত থাকিবেনা সে কিছুতেই।" মাঝি তিনবার আল্লার নামে শপথ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে নৌকা ছাড়ে।

জনপ্রাণী নাই কোথায়ও। নিস্তব্ধ নদীর বুকে শুধু বইঠার জল কাটার শব্দ ছপ্ ছপ্। সুব্রত আর দেরি করেনা। জঙ্গলের ভিতরে সরু একটা পথ দিয়া রওয়ানা হইয়া যায়। ভোরের আগেই ষ্টিমার ঘাটে পৌঁছিতে হইবে।

বিশ্বজিৎ আর সুব্রত সাইকেলে ছুটিয়া চলিয়াছে। পাহাড়ী পথ, দুইদিকে বনবনানী। অন্ধকারে রাস্তা চেনা মুস্কিল। অতি সন্তর্পণে সাইকেল চালায় দুইজনে। মাথার উপর আকাশ তারায় ভরিয়া গিয়াছে। জনপ্রাণীহীন বন্ধুর ভূমি। একটা ঝোপের আড়ালে আসিয়া সাইকেল থামায় সুব্রত, "বোস একটু জিরিয়ে নাও।"

বিশ্বজিৎ ঘন ঘন নিশ্বাস টানে। আরও কতদূর! একটা ভারী জিনিসের অনুভূতি জামার ভিতরে। শিহরণ লাগে শরীরে। আর ঘণ্টা কয়েক পরে কি হইয়া যাইবে বিশ্বজিৎ ভাবতেও যেন পারে না।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই দেবু ও তাহার তেরো বছরের ভাই শঙ্কর আসিয়া পৌছায়। সাইকেলগুলি তাহাদের বুড়ীমার বাড়ীতে রাখিয়া আসিয়া পায়ে হাটিয়া চলে তাহারা। ছোট্ট একটা টিলার পেছনে জড়ো হয় সকলে। ছোট্ট একটি সশস্ত্র বাহিনী। সকলের রক্তে রোমাঞ্চকর উম্মতা। কিন্তু নরেশদা এখনও পৌছাইতেছে না। মন

আশঙ্কায় ভরিয়া উঠে, বারে বারে হাতঘড়িটা দেখে উহারা। বুক টিপ টিপ করিতে থাকে অশুভ আশঙ্কায়। অনেকদূরে যেন ছোট্ট কি একটা দেখা যায় ঝড়ের বেগে এইদিকেই ছুটিয়া আসিতেছে। নরেশদাই আসিয়া পৌঁছায়।

কিন্তু মুহূর্তেই সকলের মুখ কাল হইয়া যায়। 'সর্ব্বনাশ পুলিস টের পাইয়াছে। তাহাদের ধরিতে আসিতেছে।'

ঠিক হয় কিছুতেই ধরা দেওয়া হইবে না। এখন ধরা পড়িলে সমস্ত পণ্ড। সবাই পাহাড়ী টিলার পেছনে গায়ে গায়ে শুইয়া পড়ে। বিশ্বজিতের বুকেব মধ্যে যেন হাতুড়ি পিটাইতে থাকে। কিছুক্ষণেব মধ্যে সারি সারি পুলিস বাহিনী আসিয়া পড়ে। মরিয়া হইয়া সকলে গুলি ছুড়িতে থাকে।

নীচ হইতে মুহূর্মুহু গুলি ছিটকাইয়া আসে। শঙ্কর উত্তেজনায় মাথা উচু কবিয়া ফেলে বারে বারে। পাশেই সুব্রত বারে বাবে বলিয়া দেয়, "শঙ্কব শুয়ে পড় শুয়ে পড় শঙ্কর।"

কিন্তু বন্দুকের ভাবে মাথা ঠিক রাখিতে পারেনা সে। নীচ হইতে একটা গুলি আসিয়া লাগে কপালে। মিনিট দুই তিনের ছটফটানী, "উঃ একটু জল"—তারপর সব শেষ।

দেবু তাকাইয়া দেখে একবার। অনবরত গুলি ছুটে মাথার উপর দিয়া। তখনকার মত পুলিস পরাস্ত হয় কিন্তু উহাদের শঙ্কা কমেনা।

বিশ্বজিৎ ভাবিতেও পারিতেছেনা যেন কি হইয়া গেল। শঙ্করের মৃতদেহটা তখনও পড়িয়া আছে রক্ত জমাট কপালে। দেরি করার সময় নাই। নরেশদা ও সুব্রত মৃতদেহটা নীচে একটা খাদের মধ্যে ফেলিয়া পাথর চাপা দিয়ে দেয়।

মনে মনে নমস্কার জানায় মৃত শহীদের উদ্দেশ্যে, "বীর বালক

তোমার এ দান বৃথা হইবার নয়।" কঠিন প্রতিজ্ঞায় মন কঠোর হইয়া উঠে সকলের।

সেই রাতের মত তাহারা তাহাদের দলের বুড়ীমার বাড়ীতে আশ্রয় লয়। বিশ্বজিতের উপর ভার পড়ে রাতারাতি হাঁটিয়া গিয়া রাত্রির শেষ গাড়ীটা ধরিতে হইবে। জিনিষ গুলি পৌছাইয়া দিয়া আসিতে হইবে ডেনে।

বিশ্বজিৎ একটা থার্ডক্লাস কামরায় উঠিয়া পড়ে। ছোট্ট স্টেশন টিমটিমে একটা বাতি টাঙান। ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টী পড়ে। বিশ্বজিতের বুকটা টিপ টিপ করিয়া উঠে। বাঙ্কের উপর চাদর মুড়ি দিয়া শোওয়া লোকটা পিট্ পিট্ করিয়া তাকাইতেছে যেন বারে বারে।

বিশ্বজিৎ একটা চাদর গায়ে দিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়ে। দুইটা স্টেশন চলিয়া যায়। গাড়ী উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছে। আবার একটা স্টেশন। গাড়ীটা থামে। হঠাৎ বিশ্বজিতের চোখের উপর একটা তীব্র আলো আসিয়া পড়ে। চমকিয়া তাকাইয়া দেখে—দারোগা পুলিস টর্চ হাতে দাঁড়াইয়া। আর সামনেই বাঙ্কের উপরের সেই লোকটা।

সমস্ত কামরাটা খানাতল্লাশী হইতে থাকে। আতঙ্কে হতভম্ব যাত্রীরা সব।

বিশ্বজিতের বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটাইতে থাকে যেন। বেঞ্চির তলা হইতে একটা সুটকেশ টানিয়া বাহির করে—ঢাকনাটা খুলিয়াই দারোগার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠে—হিংস্র খুশিতে। সাফল্যের উন্মত্ততায় ঝলসিয়া উঠে চোখগুলি। কনেষ্টবল দুইটি হাতকড়া দিয়া নামাইয়া লইয়া যায় বিশ্বজিৎকে।

বিশ্বজিৎ ভারি পায়ে হাটিয়া চলে—আর পালাইবার পথ নাই, দুইদিকে সশস্ত্র কনেষ্টবল।

শিবশঙ্করই প্রথম শুনিয়া আসে কথাটা—"বিশ্ব ধরা পড়িয়াছে।"

বনলতা কপালে হাত দিয়া কাঁদিতে থাকে, 'কি সর্বনাশ হ'ল, আমার কপালে একি দুর্ভোগ লেখা ছিল!'

শিবশঙ্করও চুপ করিয়া বসিয়া থাকে দুয়ারে। ছেলেটিকে সে মনে মনে স্নেহই করিত।

বাড়ীর লোকজন সকলেই সংবাদটা শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া যায়। "বিশ্ববাবু স্বদেশী ডাকাতের দলে গিয়াছে!" ইহা বিশ্বাসও করিতে চায় না যেন মন। সেই শান্ত ছোট্ট খোকাবাবুর এত সাহস!

স্পেসাল কোর্টের বিচারের রায় বাহির হয়। বিচারাপতি পুলিসকে মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া বিশ্বজিৎকে মুক্তি দেয়।

কোর্টে লোকারণ্য।

বিচারাপতি বিশ্বজিতের দিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাকায়—"You are free now, but I am afraid, my boy, Intelligence Branch is waiting for you in the gate. Dont hurry, sit dowu here and talk to your relations"

বিশ্বজিতের মন কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠে। এই পরদেশী লোকটি একমুহূর্তে তাহাকে আপন করিয়া গেল। কিন্তু কতদিন আর? কয়দিনই

বা এই সুস্থ ঔদার্য টিকাইয়া রাখিতে পারিবে? আমলাতন্ত্রের একটানা যন্ত্র ধীরে ধীরে তার পাঁকের মধ্যে টানিয়া লইবে নাকি? এখনও ত ছাত্রজীবনের গন্ধ শরীরে—তাই। বিশ্বজিৎ ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে। বেদনার্ত দৃষ্টিতে একটু তাকাইয়া দেখে বিদেশী বিচারকের দিকে।

আই-বি র ইন্‌স্পেক্টার মিঃ চ্যাটার্জী বিশ্বজিতের দিকে আগাইয়া আসে—"আর দেরি কেন বিশ্ববাবু, কালাপানি বাঁচলেও, আপনাকে আমরা ছাড়ছি না। দয়া করে আসুন এইবাব। মিছি মিছি দেরি করে লাভ কি।"

ঢাকা সেন্ট্রাল জেল। বিরাট দৈত্যেব মত লৌহকপাট। রাত্রি দশটা—সমস্ত জেলখানাটা যেন অবসাদগ্রস্ত আফিংখোবেব মত ঝিমাইতেছে। মাঝে মাঝে মেট্ ও পাহারাদারদের বিচিত্র হাক-ডাকের বেসুরো কণ্ঠস্বর কানে আসে।

"পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডমে লে যাও।" বড় জমাদার জং বাহাদুর হুকুম দেয়।

পরের দিন ভোর বেলায় বিশ্বজিৎ বাহিরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়ায়।

'একি, এযে সবই চেনামুখ। সুধীরবাবু, অমর, মনতোষদা—বহুদিন পর এত স্বদেশীর আড্ডায়!' বিশ্বজিতের ভাবিতেও কেমন লাগে।

মনতোষদা, সেই মনতোষদা! কতদিন, কত রাতের পর রাত কাটাইয়াছে তাহারা মনতোষদার আড্ডায়—নারিকেলডাঙ্গায় বস্তির একটা কুঠুরীতে। নোংরা বস্তির সেই মায়াময় ঘরখানা বিশ্বজিৎ এখনও

ভুলিতে পারে নাই—সেই পরম পরিতৃপ্তিতে নারকেল ও মুড়ি খাওয়া, বিচিত্র লোকের আনাগোনা—সবে মিলিয়া এক রোমাঞ্চময় অনুভূতি! বেশ লাগে ভাবিতে আজ।

অন্ত সকলের সঙ্গেও পরিচয় হইয়া যায়, কথা আর ফুরাইতে চায় না। এই জেলখানারইত কত বিভিন্ন ও বিচিত্র গল্প। সাধারণ কয়েদীর গল্প, স্বদেশী কয়েদীর গল্প, চট্টগ্রামের বিখ্যাত বন্দীদের কথা, এমনকি বিখ্যাত জেলপালান সত্তর বৎসরের মেয়াদী দাগী ফুলার সিংহের কথা পর্যন্ত মনতোষ এক নিশ্বাসে যেন বলিয়া যায়।

তিন তলার বারান্দায় আসিয়া তাহারা দাঁড়ায়। এখনই সমস্ত কয়েদীরা কাজে যাইবে। মনতোষ ঢাকা ডাক লুঠ মামলার আসামীদের দেখাইবে।

পর পর কয়েদীর লাইন। সুদীর্ঘ চলায়মান এক রেখা—সাদা, কাল, সাদা। ছোট ছোট অমিল লইয়া দীর্ঘ এক মিল তৈয়ার হইয়াছে। এতক্ষণে সম্পূর্ণ লাইনটি কারখানার গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছে।

সেই তৃতীয় সারিতে বিজন, মকবুল, দেবু—দেবুকে বড় কচি লাগে। হাসির বিনিময়ে উহারা পরস্পরকে সম্বর্দ্ধনা জানায় প্রতিটি দিন।

বিশ্বজিতের বড় করুণ লাগে। তাহারও ত উহাদের সঙ্গেই বসিবার কথা ছিল—ওই পোশাক, টুপি। সেই বোধ হয় ভাল ছিল। সমবেদনায় বিশ্বজিতের মনটায় মোচড় দেয়।

মনতোষ তাহার কাঁধে হাত রাখে—"কি বিশ্ব! নীচে যাবেনা? খাবার ঘণ্টা পড়লো যে—শুনলে না?"

তাহারা নীচে নামিয়া আসে।

একমাস হইয়াছে, এরই মধ্যে বিশ্বজিতের একঘেয়ে লাগিতে আরম্ভ করিয়াছে। আরও কত অনিশ্চিত দীর্ঘদিন পড়িয়া আছে কে জানে। এক সীমাহীন ভবিষ্যৎ তাহাদের সম্মুখে।

'এভাবে চলা যাইবে না।' বিশ্বজিৎ মনে মনে প্লান করিয়া ফেলে। পড়াশুনা করিবে সে। কিন্তু কিই বা পড়িতে পারে—জেলখানায় কি বা পাওয়া যায়। বাহিরের জগতের সঙ্গে একমাত্র সম্বন্ধ দৈনিক পত্রিকা—অনেকক্ষন ধরিয়া পত্রিকাটি গিলিতে থাকে সকলে, খুঁটিনাটি সবকিছুই পড়িয়া যায়। কিন্তু এক স্টেটসম্যান পত্রিকা পড়িয়া মন উঠে না কাহারও। মন যেন উপবাসীই থাকিয়া যায়।

বৈকালে ডাক পড়ে বিশ্বজিতের হাসপাতালে যাইবার। জেলখানায় নূতন আসিলে হাসপাতালে লইয়া গিয়া স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় ও শরীরের বিশেষ বিশেষ চিহ্নগুলি লিখিয়া নেয়।

মনতোষও সঙ্গে থাকে। এই জেলে মনতোষের অনেকদিন হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য রাজনৈতিক দীর্ঘমেয়াদী কয়েদীদের সঙ্গে সে ইতিমধ্যেই পরিচয় ও সংযোগ স্থাপন করিয়া লইয়াছে।

দশ ডিগ্রি, ছয় ডিগ্রি, চল্লিশ ডিগ্রি প্রভৃতি লম্বা লম্বা নির্জন সেলের সারি।

বিশ্বজিতের মন ঔৎসুক্যে চঞ্চল হইয়া উঠে।

হাসপাতালেও জনকয়েক দীর্ঘমেয়াদী বন্দীর সঙ্গে পরিচয় হয়। শাঁখারীটোলা বোমা মামলার অন্যতম আসামী অমিয় রায় ও সত্যব্রত সেনের সঙ্গে কথা হয় সামান্য কয়েক মিনিট। আবার বড় জমাদার দেখিয়া ফেলিলেই বেচারী সিপাইটার চাকরি লইয়া টানাটানি চলিবে।

সত্যব্রত বাবুর টেবিলের উপর বইগুলি বিশ্বজিৎ একটু নাড়াচাড়া করে। "Ten days that shook the world.", "History of

Russian Revolution"—Trotsky. অমিয় বাবু উৎসাহিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন—"পড়েছো এ সব ?

বিশ্বজিৎ আবার লজ্জিত বোধ করে।

এই একমাসের মধ্যে সে কিই বা পড়িতে পারে। আর এসব বইয়েরত সে নামও শোনে নাই কখনও। বাহিরে পড়িবার বা জানিবার অবসর ছিলনা। জীবনে যে এইরূপ অবসর মিলিতে পারে তাহা সে ভাবেও নাই।

বন্দী শিবিরে আসিয়া সে বুঝিল, এইবারের মত সে বাঁচিয়া গেল, সুতরাং বাঁচিয়া থাকার মত পাথেয় তাহার দরকার।

সেইদিনই মনতোষদার নিকট হইতে H. G. Wells-এর 'Outline of History' খানা লইয়া নিয়মিত ভাবে পড়িতে আরম্ভ করে। নেশাখোরের মত বইয়ের ভিতর ডুবিয়া থাকে সে কয়েকদিন। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্যর প্রস্তুত হইতে থাকে। তিন মাস পরই পরীক্ষা। সারাদিনই বই লইয়া আছে সে।

সুশান্তদা আসিয়া ঝাঁকুনি দিয়া বলেন, "কি বিশ্ব, তোমারও বই পাগলা রোগে ধরলো নাকি! আমার ঘরেও এক গ্রন্থকীট এসেছেন চব্বিশ ঘণ্টাই বই নিয়ে বসে। আমার কিন্তু অত ভাবনা চিন্তা বরদাস্ত হয় না। তুমিও অনেক রাত পর্যন্ত পড় বোধহয়। কিন্তু বুঝলে সবার উপরে শরীর। শরীরকে অবহেলা করে দিনরাত বই নিয়ে থাকলে পরে কিন্তু পস্তাবে।"

সুশান্তদা বিশ্বজিতের টেবিলের উপর ছড়ান বইগুলি নাড়াচাড়া করিতে থাকেন, "বিস্তর বই কিনেছ দেখছি। 'রাশিয়ার চিঠি'—রবীন্দ্রনাথের না! আবার রুশবিপ্লবের ইতিহাসও রয়েছে। তা বেশ জেনে রাখা মন্দ নয়। এইত সময়, সবকিছু জান, সব কিছু পড়।

কিন্তু বুঝে পড়া দরকার যাই বল। আর ঐ কমরেডদের আমি কিন্তু দেখতে পারি না। ওদের হাবভাব এদেশীয় নয়। ওদের সঙ্গে আবার জুটে পড়নি তো?"

কথাটি বলিয়াই সুশান্তদা বিশ্বজিতের মুখের গাম্ভির্য লক্ষ্য করিয়া কথার মোড় ফেরান, "তবে, তুমিত স্কোয়ার ছেলে—তোমার সবজায়গায়ই ডাক পড়ে কিনা।"

তোষামুদের হাসি হাসে সুশান্তদা। বিশ্বজিত লক্ষ্য কবে উহা। মনে মনে তাহার দুঃখ হয়। 'এই সেই সুশান্তদা! যাহাকে দেখিয়াছে কত বিপদের মুখে অটল, ধীর, নির্বিকার নিস্পৃহতার সহিত দিনের পর দিন সংগ্রাম করিতেন দারিদ্রতাব সঙ্গে, পুলিসের বিরুদ্ধে, গ্রামের ছোটখাট অন্যায়ের বিরুদ্ধে। তাহার স্নেহ আজও সে ভুলিতে পারে নাই। কিন্তু এই অফুরন্ত অবসরের জীবন যাত্রায় তিনি যেন কেমন স্থবির হইয়া গিয়াছেন। সে ঔজ্জ্বল্য, সে প্রতিজ্ঞা, সেই সংগ্রামমুখিনতা যেন কোন যাদুস্পর্শে মিলাইয়া গিয়াছে। তাহার স্থানে আসিয়াছে এক আয়াসী সহজলভ্য জীবনযাত্রা। চোখে মুখে মাংসল পরিতৃপ্তি।

বিছানা, ট্রাঙ্ক, সুটকেস, আরাম-কেদারা, ঘড়ি, কলম, গ্লেসকিডেব জুতা সব সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিতে রাখিতেই দিন যায়। আর একটা সার্জের গরম জামা করিতে পারিলেই মোটামুটি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন সুশান্তদা। তাহার সবই টিপ্‌টাপ, কিছুই ফাঁক যাইবার জো নাই। এ হেন নিশ্চল, নিথর জীবন যাত্রার আরামকেদারায গা হেলাইয়া দিয়া সুশান্তদার দিন মন্দ কাটে না।

বিশ্বজিতের হঠাৎ খেয়াল হয়, সুশান্তদা যে কখন চলিয়া গিয়াছে সে টেরও পায় নাই।

ডিপুটী জেলার আসিয়া জানাইয়া যায়, "বিশ্ববাবু তৈয়ার হ'ন, আপনাকে বারোটায় জেলখানা ত্যাগ করতে হ'বে।"

কোথায় যাওয়া হইবে, তাহা বলা হইবে গেটের বাহিরে। ডিপুটি জেলার যেন খোসামুদে বিনয়ী হইয়া উঠে। মনতোষ নানা কথার ফোঁড় দিতে থাকে—আসল কথার চাবি পাওয়া যায় কিনা। যাইবার সময় ডিপুটি জেলার আর চাপিতে পারে না। আসলে চাপিয়া রাখিতেও সে চায় না। একঘেয়ে চাকরির মধ্যে এইটুকু মুরব্বীপনা করিতে পারায় সে বেশ একটু গর্ব বোধ করে। মনতোষ বিশ্বজিৎকে ঝাঁকুনি দিয়া বলে ঃ—

"কি তাহ'লে একেবারে বড়দাদের ক্যাম্পে ? বরাত ভাল।"

এই সামান্য দুইমাসের জীবনের মধ্যেও বিরহ বিচ্ছেদের ব্যথা সকলকে নাড়া দিয়া যায়। এ যেন এক আলাদা জগৎ—বন্দীর জগৎ।

বিশ্বজিতের প্রায় ছয় মাস হইয়া গিয়াছে এই বক্সাদুর্গে। আশ্বিনের শেষ সপ্তাহ—জয়ন্তীর গায়ে বরফ জমিতে আরম্ভ করে।

বিশ্বজিৎ তাহার কুঠুরীর খোলা জানালা দিয়া গাঢ় নীল পাহাড় চুড়ায় সাদা মেঘের খেলা দেখে। হালকা মেঘগুলি পাহাড়ের কোলে কোলে লাগিয়া থাকিয়া এক অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। বিশ্বজিৎ মুগ্ধ হইয়া এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করে। পাহাড়ী দেশের এই গম্ভীর শান্ত পরিবেশে সে যেন আরও মৌন হইয়া পড়ে।

মাঝে মাঝে নূতন বন্দী আসে বন্দীশিবিরে। আবার পুরাণ বন্ধু কেহ বিদায় লইয়া যায়, হয়তো কোন অনিশ্চিত পথের দিকে। বিদায় মুহূর্তে গভীর দাগ কাটিয়া যায় মনে—আবার সে দাগ মিলাইয়াও যায়। দিনের পর দিন ঘুরিয়া চলে একটানা স্রোতে।

খুব ভোরে ঘুম ভাঙিয়া যায় বিশ্বজিতের। কে একজন নূতন রাজবন্দী আসিল ক্যাম্পে, সকলে কুতুহলী দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে জেল গেটের দিকে। বিশ্বজিৎও বাবান্দায় গিয়া দাঁড়ায়।

বন্দীদের এই আসাযাওয়া একটানা জীবনেব ঐত একটু বৈচিত্র। ক্ষণিকেব জন্য একটু বাহিরের আলোর স্পর্শ লাগে।

বিশ্বজিৎ হঠাৎ ছেলেমানুষের মত খুসি হইয়া নীচে নামিয়া আসে।

"আরে সুব্রতদা যে।" ছুটিয়া যায সে গেটের কাছে। সুব্রতও জড়াইয়া ধরে তাহাকে, "তুমি আগেই এসে হাজির।"

বিশ্বজিতের আজকের এই দিনের মত এতখানি আত্মীয় মনে হয নাই এর আগে কোনদিন সুব্রতদাকে। চেনা, অচেনা অগণিত আসাযাওয়া মুখর এই বন্দী শিবিবে আজ যেন সে এক পবম আত্মীয়েব সন্ধান পাইয়াছে।

একবছব কাটিয়া যায়।

৭ই নভেম্বব। তিন নম্বব ওয়ার্ডে উৎসবেব সাড়া পড়িয়াছে।

রুশবিপ্লব স্মৃতি দিবস।

বিশ্বজিৎ দূরেব দিকে তাকাইয়া ভাবিতে থাকে। 'রুশবিপ্লব! রুশবিপ্লব! রক্তরঞ্জিত জাব প্রাসাদেব সিঁড়িগুলি! নির্মম বিপ্লবের গতি কাউকে ক্ষমা করে না! অগণিত মানুষের পুঞ্জীভূত নিস্পেষণেব অব্যর্থ প্রতিহিংসা! অত্যাচারের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। ধন্য তোমরা পেট্রোগ্রাডের লাল-নৌ-সেনা। আর ধন্য তোমরা মস্কোব রেল শ্রমিক আর ছাত্র সঙ্ঘ।

মাত্র দশদিন!

এই দশদিনের ইতিহাস নূতন যুগের নূতন সম্ভাবনার ইতিহাস। ফরাসী বিপ্লব থেকে রুশবিপ্লব। পদদলিত নরনারীর মহাঅভিযানের পথ। শতাব্দী ধরে চলেছে এই পথে সংগ্রাম। শুধু শতাব্দী কেন? তারও বহু আগেও কি নিষ্পেষিত মানুষ বিদ্রোহ করেনি বারে বারে। রোমের শারটাকস বিদ্রোহ থেকে শুরু করে জার্ম্মানীর চাষীবিদ্রোহ, ইংলণ্ডের চাষী বিদ্রোহ ও রিপাব্লিকয়নদের বিদ্রোহ,...আমেরিকান বিপ্লব...ফরাসী বিপ্লব...সর্বশেষে এই রুশবিপ্লব। এমনি করেই ত নির্য্যাতীত মানব জাতি এগিয়ে চলেছে মহাজয়যাত্রাব পথে। ...

বিশ্বজিতের চিন্তাপ্রবাহে বাধা পড়ে। একটা উত্তেজনা পূর্ণ তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হইয়াছে যেন ডি ব্লকে। রুশ বিপ্লব লইয়াই তীব্র আলোচনা চলিয়াছে। উত্তর বঙ্গ ষড়যন্ত্র মামলাব রমেন রায় দলের বিনা অনুমতিতে রুশবিপ্লব স্মৃতি দিবসে যোগদান করিয়াছে।

গত কয়েকমাস যাবৎই তাহার চালচলন দাদাদের মনঃপুত হইতেছে না। সে নাকি দাদাদেব সম্মুখেই ধূমপান করে। আজ দলের মধ্যে তাহার বিষয় লইয়াই আলোচনা। তুমুল বাক্‌বিতণ্ডার পব ঠিক হইয়া যায়, তাহার স্থান এ:দলের বাহিরে।

বিশ্বজিৎ এক কোণে দাঁড়াইয়া সমস্ত আলোচনা অনুধাবন করে।

নরেশদা, সুরেশদা, পুলিন বাবু সবাই একবাক্যে সায় দিয়া ফেলেন— রমেন রায় পার্টির শৃঙ্খলা অমান্য করিয়াছে। আর এজাতীয় কোনও বিশৃঙ্খলা ভবিষ্যতে তাহাদের পার্টিতে হইতে পারিবে না। ভবিষ্যতে যদি কেউ কিছু পড়িতে বা বুঝিতে চায়, তবে উহা তাহাদের মারফতই হওয়া বাঞ্ছনীয়। পার্টির শৃঙ্খলা সবার উপরে।

বিশ্বজিতের নিকট এইসব আলোচনা এইসব প্রস্তাবনা অত্যন্ত অবাস্তব নিলর্জ্জ অহঙ্কার মনে হয়। পার্টি। কিসের পার্টি ? একজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া টুকরা টুকরা কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল সমষ্টির নাম পার্টি !

বিশ্বজিতের কাছে অজানা কিছুই নাই।

বিপ্লবীদলেব এক রোমাঞ্চময় ত্যাগধর্মব্রত আর সরকারের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঘাত করিবার প্রয়াস ছাড়া আর কিই বা তাহারা করিয়াছে বা ভাবিয়াছে! বাংলাদেশের বিপ্লবীদের সম্পদ চট্টগ্রাম ঢাকা মেদিনীপুব, আর বাদবাকি ত শুধু প্রচেষ্টা আর ব্যর্থতা, প্রচেষ্টা আর ব্যর্থতা।

বিশ্বজিৎ নিজেকে অপমানিত বোধ করে। তাহারা কিছু পড়িতে পারিবে না অর্থ কি ? শৃঙ্খলা কি শুধু শৃঙ্খলাব জন্য না এব বৈপ্লবিক সার্থকতার জন্য ?

কোথায় পথ ? কি পথ ? নিজেকে লইযা এ ছিনিমিনি, এ প্রবঞ্চনা আর নয়। এই অবসব শুধু অবসব নয় ইহাই আত্মজিজ্ঞাসাব প্রকৃষ্ট সময়। বিশ্বজিৎ খুঁজিযা যাইবে নিজের মনে, পড়িবে, জানিবে, বুঝিবে, এই ছিল তাব প্রতিজ্ঞা! কিন্তু কেন এই বিধিনিষেধের দেয়াল। ইহার কি দরকাব ছিল !

রমেন রায়ের জন্য তাহার মন সহানুভূতিতে ভবিয়া উঠে। যদিও রমেন খুব অল্পদিনই তাহার সঙ্গে মিশিয়াছে। তাহাব প্রতিজ্ঞা সুদৃঢ় মতেব প্রতি সেও সহানুভূতিশীল হইয়া পড়ে।

রমেন রায় সেইদিনই তাহার আস্তানা ছাড়িয়া দেয়। যাইবার সময় তাহার চোখটা ছলছল করিয়া ওঠে। জীবনেব এক বিশেষ ধাপে অনেক সুখে দুঃখে যাহাদের সঙ্গে হাত মিলাইয়া চলিয়াছিল, আজ তাহাদের সঙ্গে প্রথম ছাড়াছাড়ি। বিনয় রায়, কার্ত্তিক, অমরেশ, ইহারা রমেনের

বিশেষ বন্ধু। তাহারা কেহই পরস্পরের দিকে তাকাইতে পারে না। রমেন সি ব্লকে চলিয়া যায়। তাহাকে অভ্যর্থনা করার লোকেরও অভাব হয় না। কিন্তু এক আত্মঘাতী অভিমান লইয়া রমেন স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে।

আবার বছর ঘুরিয়া আসে বন্দীশিবিরে। আভ্যন্তরিক রাজনীতির অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। রমেনের বহিস্কারের পর হইতেই বিশ্বজিতের মনে একের পর এক আত্ম-জিজ্ঞাসা আসিয়া ভিড় করে। ভবিষ্যতের পথ কি ?

রুশবিপ্লবের নির্দেশ তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। সে বিপ্লবী লেনিনের জীবনী পড়িতে আরম্ভ করে। এই এক বৎসরের মধ্যে ধীরে ধীরে তাহার পুরান দাদারা তাহাকে প্রথম অনুশাসন, পরে শাসন করিতে আরম্ভ করেন।

আবার এদিকে ধীরে ধীরে দুই একজন করিয়া তাহার মত আত্ম-জিজ্ঞাসু লোকের সংখ্যাও বাড়িতে থাকে। তাহারা চার পাঁচজনে মিলিয়া ছোট্ট পাঠচক্র করিয়া ফেলে। বিশ্বজিৎ, সুব্রত, রমেন আরও দুই তিনজনে মিলিয়া ধারাবাহিকভাবে মার্ক্সীয় দর্শন পড়িতে আরম্ভ করে।

ইতিহাসের ছাত্র বিশ্বজিৎ। বীর বীরাঙ্গনাদের অমর কাহিনী তাহার মনে জ্বলন্ত অক্ষরে আঁকা। তাঁহাদের বীরগাঁথা সে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়িয়া গিয়াছে দিনের পর দিন।

আবার অত্যাচারী রাজার নির্মম কলঙ্কলিপিগুলি সে গভীর বেদনা বোধের সঙ্গেই পড়িয়াছে চিরদিন। কোন অস্পষ্ট অতীতের মর্মভেদী অসহায় আর্তনাদগুলি শুনিতে পায় সে ইতিহাসের রক্তাক্ত অক্ষরে অক্ষরে ; চোখের সামনে ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ছোটে যেন লোমস ক্রীতদাসের পুরু,

কাল, চামড়া ভেদ করিয়া। তাহার দৃষ্টি স্থির হইয়া যায় অত্যাচারিতের ক্ষুব্ধ বেদনায়।

কিন্তু ইতিহাসের পাতায় পাতায় জমাটবাঁধা এই করুণ অত্যাচারের অন্তরালে যে গূঢ় তথ্য লুকান ছিল এতদিন, আজ সে তাহা প্রথম উপলব্ধি করিল। ঐতিহাসিক দৃষ্টির নূতন আলোর স্পর্শে স্পষ্ট হইয়া উঠে হাজার হাজার বছরের বিরাট ইতিহাস।

মার্ক্সীয় দর্শন তাহাকে আজ নূতন করিয়া চক্ষু দান করিল।

বিশ্বজিৎ নূতন দৃষ্টি লইয়া পড়িয়া যায় :—

"The history of all hitherto existing society is the history of class struggles. Freeman and slave, patrician and plebeian, baron and serf, guild member and apprentice, in short, oppressors and oppressed all were opposed in like manner to each other, waged an uninterrupted, now hidden, now open battle : a battle that always terminated in a revolutionary transformation of the whole society or with a common destruction of the struggling classes."

পড়িতে পড়িতে গভীরভাবে চিন্তা করে সে। এক নিঃশ্বাসে শেষ করিয়া ফেলে পুস্তিকাখানা। আবার নূতন আশায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে তাহার চোখের অচঞ্চল তারা দুইটি। চোখের সামনে জ্বলজ্বল করিয়া উঠে ছোট ছোট অক্ষরগুলি :—

"The Communists disdain to conceal their views and aims. They openly declare that their ends can be

attained only by the forcible overthrow of all existing social conditions. Let the ruling class tremble at a Commnnist revolution. The proletarians have nothing to lose but their chains. They have a world to win.

Working men of all Countries, Unite."

বন্দী নিবাসে দুর্গাপূজা।

সাম্যবাদী বলিয়া যাহারা ইতিমধ্যে পরিচিত হইয়া গিয়াছেন—তাঁহারা পূজাতে যোগদান করিবেন না। সুতরাং এই বছর দুর্গাপূজা আরও জাঁকজমক করিয়া করিতে হইবে ইহাই দাদাদের সুস্পষ্ট অভিমত।

বিশ্বজিতের ঘরেও চাঁদার জন্য আসে।

এই চাঁদা দেওয়া না দেওয়ার ব্যাপারেই এই শিবিরে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে—তাহারা সাম্যবাদী, কি নয়। বিশ্বজিৎ বুঝিতে পারে না সে কি করিবে। পুরাতন ভ্রমকে সে মানিতে পারে না, নূতনের কাছে সে এখনও অপরিচিত।

আর পূজাতে চাঁদা না দেওয়ার সাথে নূতনের মতবাদের কি সম্পর্ক—সে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। পূজার যে সামাজিক দিক আছে, তাহাই বা এঁরা অস্বীকার করিবেন কি করিয়া? তাহা হইলে ত সাধারণ লোককে অস্বীকার করা হয়।

প্রমোদ বসু পুলিন দে, উহারা বিশ্বজিতের মনের দ্বন্দ্ব ধরিতে পারেনা। তাহারা একটু শ্লেষ করিয়া বলে, "কি বিশ্বজিৎও কি এবার লালখাতায় নাম লেখাতে চাও নাকি?"

কটাক্ষ বিশ্বজিৎ কোনদিন সহ্য করিতে পারে না। সে ভিতরে ভিতরে তাঁতিয়া উঠে। তবু অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠেই জবাব দেয়,"প্রমোদবাবু দুর্গাপূজায় চাঁদা দিতে পারব না, তবে আমোদ প্রমোদের জন্য নিশ্চয়ই দেবো।"

"ওঃ—আপনার টাকার জন্যত আমাদের আমোদ-প্রমোদ আটকে আছে কিনা? ধন্যবাদ।"

এই কথাকয়টা ছুড়িয়া দিয়াই উহারা চলিয়া আসে। "এক এক ক'রে ওদের দল বেড়েই চলেছে। এইসব renegadeদেব ঘাড় ধবে বের করে দেওয়া উচিত", যাইতে যাইতে পুলিন চেঁচাইয়া বলে।

"কিন্তু আস্তে আস্তে যে সবাই renegade হ'তে আরম্ভ কবলো। আমরাই ত মাত্র কয়জন প'ড়ে রইলাম।"—প্রমোদ বিবক্তি স্বরে জবাব দেয়। "আচ্ছা জেলখানায় এত পড়াশুনা করাব কোন দবকার আছে বলে তুমি মনে কর? যতসব পাগলের দল, সব ব্যাটা পাগল! বই প'ড়ে আবার দেশ স্বাধীন কেউ কখনও করেছে, শুনেছ?"

ছোটখাট-কত ঘটনার মধ্য দিয়া জেলখানার ইতিহাস বৈচিত্রময় হইয়া উঠে। বিশ্বজিৎ, সুব্রত ও অনুপম একসঙ্গে পড়াশুনা করে। উহারা এখন খোলাখুলি ভাবেই নিজেদের সাম্যবাদী বলিয়া প্রচার করে।

দেখিতে দেখিতে ১৮ই এপ্রিল আসিয়া পড়ে। ১৮ই এপ্রিল এক বিশেষ বিপ্লবীদিন হিসাবে পালিত হয়। এবছর বন্দীশিবিরে এই স্মৃতি দিবস পালন করা লইয়া জাকজমক আরম্ভ হইয়াছে।

বিশ্বজিৎ ইদানীং কেমন যেন মনমরা হইয়া থাকে। পুরাতন খোলস সে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু নূতনদের আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা সে এখনও পায় নাই।

সে বুঝিতে পারেনা সাম্যবাদীরা কেন এই বিপ্লবী দিবসগুলি ও শহীদদিবসগুলিতে যোগ দেয় না।

আজ ১৮ই এপ্রিল!

যে ১৮ই এপ্রিলের স্বপ্নে তাহার জীবনের কত রাত কত দিন কাটিয়াছে। যে শহীদদের কাহিনী তাহার কাছে অমূল্য গাঁথা হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের মন হইতে মুছিয়া ফেলিলে ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনের সমস্ত অতীতকেই ত মুছিয়া ফেলিতে হয়।

মধ্যবিত্ত পরিবারে তাহাদের জন্ম। তাহাদের বৈপ্লবিক আদর্শ মধ্যবিত্ত ও সামন্ততান্ত্রিক। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের এ ত্যাগ, আগ্রহ, এ প্রচেষ্টা সবই কি বৃথা? বিশ্বজিৎ যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করে। শঙ্করের কচিমুখখানা মনের কোনে ভাসিয়া উঠে।

১০ নং ঘরে ১৮ই এপ্রিল-দিবস পালন করা হইতেছে। চট্টগ্রামের বীর শহীদদের উদ্দেশ্যে সবাই জড়ো হইয়াছে। প্রতি বছর সেও ত সেখানে দাঁড়াইয়াছে শ্রদ্ধাবনত মস্তকে। কিন্তু এবার?

সভার শেষ মুহূর্তে সে আস্তে আস্তে উঠিয়া গিয়া শতরঞ্চির এক কোনে বসিয়া পড়ে। কিন্তু প্রমোদ, পুলিন, উহাদের চোখ এড়ায়না। সুরেশদা একটু আশান্বিত হইয়া কানে কানে কার্তিকবাবুকে বলিয়াও ফেলেন, "ছেলে ত ভালই ছিল—তবে ঐ পড়ার রোগে ধরতেই ওরকম হলো।"

সভাপতি হইয়াছেন বৃদ্ধ উপেনদা। পুলিনদের পরামর্শে তিনি বিশ্বজিৎকে কিছু বলিতে বলেন সংক্ষেপে। বিশ্বজিতের কাছে এ আচরণ অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত।

বলার অভ্যাস তাহার নাই। তবু সে বলে, "সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রতীক এই ১৮ই এপ্রিলকে আমি অভিনন্দন জানাই। শত শত শহীদের প্রাণদানে যে বৈপ্লবিক ঐতিহ্য গ'ড়ে উঠেছে তা'

সফল হবে, যেদিন লক্ষ লক্ষ লোকের বজ্রবাহু এগিয়ে আসবে ১৮ই এপ্রিলের বিদ্রোহকে সফল করতে। তাই আজকের দিনে স্মরণ করি সেই অনাগত ভবিষ্যতের বৈপ্লবিক শক্তি লক্ষবজ্রমুষ্টিকে।"

কথা কয়টা বলিতে পারিয়া তাহার মনটা একটু যেন হালকা হয়।

খেলার মাঠে কমরেড নলিন ঘোষের সঙ্গে দেখা হয়। সে একটু বিদ্রূপাত্মক হাসি হাসিয়া পাশ কাটিয়া চলিয়া যায়।

রমেন ত বলিয়াই ফেলে, "ওসব পেটিবুর্জুয়া রোমান্টিসিজমের নাম সাম্যবাদ নয়। সাম্যবাদ একটি বিজ্ঞানসম্মত বৈপ্লবিক দর্শন। কেনই বা এসব প'ড়ে সময় নষ্ট করছেন আর কেনই বা আমাদেব সাথে মিশতে আসেন। সেই দাদাদের লেজুরই যখন আবার ধরবেন।"

বিশ্বজিতের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি মনে হয় এইরূপ কথা বলার ধরণে। তাহার মাথায়ও আগুন জ্বলিয়া উঠে। সেও চট করিয়া বলিয়া দেয়, "আপনাদের সাথে সাম্যবাদ না করলেও আমার চলবে। আপনাবা সাম্যবাদের ক্ষতিই করছেন শুধু।"

রমেন এতটা আশা করিতে পারে নাই। বিশ্বজিতেব আগে সে সাম্যবাদ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া তাহার মনে মনে একটু গর্বও আছে। আব পুরাতন দল হইতে বহিষ্কাবের পর সে নিজেকে সাম্যবাদী বলিয়া প্রচারিত কবিয়া নিজের গর্বটা আবও স্ফীত করিয়াছে। এই বিশ্বজিৎকেই সে কতদিন Capital, Leninism, প্রভৃতি বই ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছে। আর আজ সেই বলে, তাহারা সাম্যবাদের ক্ষতি করিয়াছে। আস্পর্দ্ধা কত!

রমেন স্তম্ভিত হয়।

বিশ্বজিৎ ততক্ষণে চলিয়া গিয়াছে। সুব্রতর ঘরে আসিয়া সে চুপ করিয়া শুইয়া পড়ে। আজ তাহার মনে হইতে থাকে এই বন্দী জীবনের

বাকী দিনগুলি কি করিয়া সে পাড়ি দিবে। পুরাতন আর নূতনের এ সংঘাতে সে নিজেকে misfit মনে করে।

যে নূতন মতবাদ পুরাতন ঐতিহ্যকে এভাবে অস্বীকার করে, তাহাকেই বা সে কি করিয়া আপনার করিয়া লইবে? শত সহস্র প্রশ্ন আসিয়া তাহার মনকে তোলপাড় করিয়া দিয়া যায়।

অন্যমনস্কভাবে সুব্রতর টেবিল হইতে চয়নিকা খানা তুলিয়া লইয়া পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে মুখের উপর রাখিয়া নিঃশব্দে অসাড় হইয়া পড়িয়া থাকে সে।

পড়ন্ত রোদের একফালি সোনালী আলোতে বিশ্বজিতের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। চোখ মেলিয়া দেখে, চয়নিকার ভাজ হইতে কয়েকখানা চিঠি ও একখানি ফটো তাহার বুকের পাশে পড়িয়া আছে। ফটোখানার দিকে তাহার কুতূহলী চোখ পড়ে একটি মেয়ের ফটো—দুষ্টু হাসি মাখা চোখদুটি। তলায় নাম লেখা রহিয়াছে "জয়া"।

"জয়া।" এই তবে জয়া। সুব্রতদার ছোট বোন। সুব্রতদার মুখে ত সে প্রায়ই শোনে তাহার নাম। বিশ্বজিত একটু ভাবিতে থাকে। সব মিলিয়া তাহার মনের ক্ষতটা যেন শুকাইয়া উঠে।

বন্দীনিবাসের দিনের চাকা চলিতে আরম্ভ করে।

লক্ষ্মীপুরের বাড়ীতে আসার পর হইতে পূবের বাড়ীর ভিটাটা খালিই দেখিয়াছে বিশ্বজিৎ। গাছগাছালী আর জঙ্গলেভরা পূবের বাড়ীর ভিটার দিকে তাকাইতে ভয়ে গা ঝিমঝিম করিত ছোট বেলায়।

একবার জেল হইতে ছুটিতে বাড়ী আসিয়া সে অবাক হয়, কেমন

চমৎকার বাংলোবাড়ী উঠিয়াছে জঙ্গলেভরা পূবের বাড়ীর ভিটাটার উপর।

পূবের বাড়ীর মালিক শিবনাথ বনলতার জ্ঞাতি সম্পর্কে দেবর হয়। আবার সেই দেবর বিবাহ করিয়াছিল তাহার এক দূর সম্পর্কের মামাত বোনকে।

কিন্তু তাহারা কোনদিন দেশে বাস করিতনা। শিবনাথ বিদেশে চাকরি করিত মোটামাহিনায়। একটিমাত্র সন্তান রাখিয়া বনলতার সেই মামাতবোন মারা যায়; সেও আজের কথা নয়। কিন্তু শিবনাথ আর বিয়ে করিলনা। ছেলেটিকে বোর্ডিংএ রাখিয়া বিদেশে বিদেশেই ঘুরিয়াছে এতদিন।

এখন পেনশন লইয়া দেশের ভিটায় ফিরিয়া আসিয়াছে; নূতন করিয়া ঘর তুলিয়াছে সাহেবী কায়দায়। পরিত্যক্ত পূবের বাড়ীর ভিটাটা আবার জনমুখর হইয়া উঠে।

এদিকে কানাঘুষারও অন্ত নাই, "বাবুর্চি নাকি রান্নাকরে, টেবিলে খায়। টাকা আছে, তার আর জাত যাওয়ার ভয় কি?" ইত্যাদি…

ছেলে ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছে। তাহারও বেশ ভাল লাগে, বাবার এই গ্রামে থাকার ব্যবস্থাটা। সে এবার আই এ পরীক্ষা দিবে। কলিকাতায় হোষ্টেলে থাকে সে।

আপনভোলা শিবনাথ গ্রামের লোকের নিন্দা আলোচনা কিছুই গ্রাহ্য করেনা। আপন মনেই নিজের খুঁটিনাটি কাজ লইয়া দিন কাটায়।

স্ত্রীর প্রকাণ্ড ফটোখানা হল ঘরে টানাইয়া বিশেষ বিশেষ দিনে ফুলের গুচ্ছ দিয়া সাজায়। প্রশান্তর বেশ লাগে, বৃদ্ধপিতার পত্নীপ্রেমের এই মাধুর্যটুকু। বাবাকে খুশি করার জন্য বলে, "দাঁড়াও একটা মালা গেঁথে আনি ঐ বাড়ীর মাসীমার কাছথেকে।"

বনলতা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে বোনপোকে,"মালা দিয়ে কি হ'বেরে ?"

—"মার ফটো সাজাবো।"

বনলতা শুনিয়া, খুশি হইয়া বলে, "পেটের ছেলের টানই আলাদা। তাই মানুষে বলে, রক্তের টান, সেকি যে সে টান। আপনা আপনিতে টানে, সেকথা কে না জানে"—ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবে, তাহার বিশ্বজিৎও যদি এমন হইত। প্রশান্তর উপর একটা মায়া পড়িয়া যায় বনলতার।

প্রশান্ত ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখে গ্রামখানি ; সবই সুন্দর লাগে। কি বিশাল নদী—ওপার দেখা যায়না। স্কুলের ছেলেদের সঙ্গেও আলাপ হইয়া যায়। বিশ্বজিতের গল্প শোনে তাহাদের মুখে—সাংঘাতিক বিপ্লবী ছেলে সে।

লোকের মুখে শুনিয়া শুনিয়াই তাহার প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব আসিয়া যায় মনে। ঘুরিয়া ফিরিয়া বারে বারে ছয়আনির মাসীমার কাছে গিয়া বিশ্বদার গল্প শোনে সে।

বনলতা যখন যা রান্না করে, তাহাকে ডাকিয়া খাওয়ায়। চিরদিন মেসে বোর্ডিংএর খাওয়া খাইয়াই বড় হইয়াছে ছেলেটা। ভাল জিনিস কোন দিন চোখেও দেখে নাই।

সেদিন প্রশান্তকে ডাকিয়া সংবাদ দেয় বনলতা, "তোমার বিশ্বদা ত বাড়ী আসছে দশদিনের জন্য। তা'কে দেখার জন্য অস্থির হয়েছিলে, দেখা হ'য়ে যাবে এবার।"

বনলতা এটা সেটা নানা আয়োজনে ব্যস্ত, ছেলে বাড়ী আসিতেছে।

প্রশান্তও ষ্টেশনে যায়। তিনজন পুলিশ ও একজন আই-বির লোক বিশ্বজিতের সঙ্গে আসে তাহার বাড়ীতে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রশান্তর সঙ্গে আলাপ হইয়া যায় বিশ্বদার। প্রশান্ত

আকৃষ্ট হয বিশ্বদাব আন্তবিক ব্যবহাবে। পড়াশুনাও যথেষ্ট কবিয়াছে জেলখানায। বিশ্বজিৎ এইবাব জেল হইতেই বি-এ পাশ কবিযা এম-এ পড়িতেছে। সে এখন বক্সাদুর্গে আছে শুনিযা, প্রশান্ত প্রশ্ন কবে, "আচ্ছা, সুব্রতদাকে চেন ? সেও ত আছে বকসায।"

বিশ্বজিৎ অবাক হইয়া বলে, "তা'কে চিনলে কি কবে ?"

প্রশান্তব মুখেই সে শুনিতে পায, শিবনাথেব অন্তরঙ্গ বন্ধু সুব্রতব বাবা। তাঁহাবই স্কুলে পড়িযা প্রশান্ত ম্যাট্রিক পাশ কবিযাছে, সুব্রতদেব গ্রাম হইতে। সুব্রতব ছোট বোন জযাও তাহাদেব সঙ্গেই এখন আই, এ, পড়িতেছে কলিকাতায বোর্ডিংএ থাকিযা।

বিশ্বজিৎ ও সুব্রত এক ঘবেই থাকে। প্রশান্ত খুশি হইযা উঠে শুনিযা। জয়াকে গিয়া সে ই খববটা দিতে পাবিবে। খুটাইযা খুটাইযা বহু কথা জানিয়া লয় সে।

"জযাকে যদি দেখতে বিশ্বদা, এত চমৎকাব মেযে।" প্রশান্ত জযাব প্রশংসায পঞ্চমুখ।

বিশ্বজিৎ হাসিযা বলে, "তোব জযাকে না দেখলেও তাব চিঠি দেখেছি, তা'ব দাদাব কাছে লেখা চিঠি। বড সেন্টিমেণ্টাল মেযে, বিপ্লবীদাদাব উপযুক্ত বোন নয কিন্তু। তা'ব সঙ্গে দেখা হ'লে বলো, আমবা তা'ব কাছে অনেক কিছুই আশা কবছি।"

সুব্রতদাকে প্রশান্ত খুবই শ্রদ্ধা কবে। তাহাব বিপ্লবী মনেব স্পর্শ তাহাব মনকেও চঞ্চল কবিযাছে। বাবা সবকাবী চাকবি কবিতেন, তাই প্রকাশ্য ভাবে দলে যোগ না দিলেও গোপনে গোপনে সে উহাদেব টাকা দিযা যথেষ্ট সাহায্য করিত।

দশটা দিন যেন দেখিতে দেখিতে কাটিযা যাইতেছে। হিন্দুস্থানী পুলিসগুলিব খাওয়ার ব্যবস্থা ও আই-বিব লোকটিব যত্ন পবিচর্যাব কোনও

ত্রুটী রাখেননা নাযেববাবু। সহর হইতে ভাল দামী সিগারেটের টিন কিনাইয়া আনেন। বাহির বাড়ীতে আলাদা উনান ধরাইয়া নিজেরাই রান্না করে হিন্দুস্থানী জমাদার দুইটি, বড় বড় পুরু আটার রুটি আর ছোলার ডাল।

বনলতা ঘটা কবিয়া দুইবাড়ীর সকলকে নিমন্ত্রণ খাওয়ায় ছেলের বাড়ী আসা উপলক্ষে।

বিশ্বজিৎ তাহাব দূর সম্পর্কের ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করিতে চায়।

আই-বির লোকটি আপত্তি কবেনা। কিন্তু একটু সতর্ক করিয়া দিয়া বলে, "দেখবেন একটু সাবধানে; স্থানীয় দাবোগারা যেন টের না পায়। আমাদেরও ত চাকরিব ভয় আছে।"

বিশ্বজিৎ হাসিয়া বলে, "কোনও চিন্তা নাই।"

সন্ধ্যার পব একটু অন্ধকাব হইলে প্রশান্তকে দিয়া স্কুলেব ছাত্র, বাদলকে খবব পাঠায়।

চাকবালাও একদিন নিমন্ত্রণ খাওয়ায় বিশ্বজিৎকে।

শিবশঙ্কব নিজে দাঁড়াইয়া জাল দিয়া মাছ ধরায় অন্দরের পুকুর হইতে। বিশ্বজিতেব খাওযাব সামনে চাকবালা পাখা লইয়া বসে।

"জেলখানার বান্না কি রকম হয়?"

বিশ্বজিৎ হাসিযা বলে, "একটা ঘ্যাট তৈয়াব হয় সেখানে, তা'তে ভুরেণ্টাব কাঁটা, তেঁতুলবীচি, আরশোলাব ঠ্যাং এমন কিছু বাকী নেই যা থাকেনা। তবে তা'তেও আমাদেব অরুচি হয় না।" হাসে বিশ্বজিৎ।

চারুবালা অবাক হয় শুনিয়া।

শিবশঙ্কব এখন ঘোব সংসারী। যৌবনের দলগত বিদ্বেষ আর নাই, তাহা লইয়া মাথাও ঘামায় না। খাওয়ার পর বহুক্ষণ গল্প কবে বিশ্বজিতের সঙ্গে। সুজিতের কথা উঠে।

"তা'র ত বিলেত যাবাব ইচ্ছে—লণ্ডনের গ্রাজুয়েট হ'তে চায় সে।

আমাবও আপত্তি নেই। অবশ্য তা'র মার একটু অমত আছে—অতদিন কাছছাড়া কবে থাকা।"

বনলতা বাবে বাবে ছেলের হাটাচলাফেরাব দিকে তাকাইয়া দেখে, আব ভাবে, কেমন চালাক চতুর হ'য়ে উঠেছে ছেলে। কথায বার্তায়ও দিব্যি চৌকস। আগেব মত আব বোকা বোকা ভাব নাই।

ক্ষ্যান্তও বলে, "দেখছেন বোনদি, কেমন মদ্দ হ'য়ে উঠেছে আমাদেব সেই ছোট্ট বিশু।"

অনেক বাত পর্য্যন্ত বাবন্দায় শীতলপাটিব উপব শুইয়া শুইযা বিশ্বজিৎ আব প্রশান্ত গল্প কবে। বনলতা হাসিযা জিজ্ঞাসা করে, "কি পবামর্শ দেওয়া হচ্ছে ভাইকে। নিজেব মাথাত খেয়েছ আবাব ভাইটিব মাথাও খেয়ে যেওনা।"

প্রশান্তব দিকে তাকাইয়া বলে, "দাদাব কাছে কোনও সুবুদ্ধি নিতে বোসনা যেন।"

প্রশান্ত বিশ্বজিতেব কপালে একটা কাটা দাগ লক্ষ্য কবিযা বলে, "ওটা কিসের দাগ ? জেলখানায় মাবেও নাকি তোমাদেব ?"

বিশ্বজিৎ হাসিয়া বলে, "জেলখানাটাত আব মামাব বাড়ী নয যে একটু আধটু ঐ ধবণেব আদব ভাগ্যে জুটবেনা।"

প্রশান্ত স্তম্ভিত হয় তাহাব কথা শুনিযা, "মাবেব চোটে মাথা ফেটে গিয়েছিল।"

বিশ্বজিৎ তাহাব বিস্ময় দেখিযা হাসে। "আমাব মাথাটাত আর লোহাব তৈযাবী নয় যে, হান্টাবের বাড়িতেও ফাটবেনা তা।"

প্রশান্তব মন দাদার প্রতি সম্ভ্রমভবা মমতায় ভবিয়া উঠে। মন সজল হইয়া উঠে কারাগৃহেব অগণিত বীরবন্দীদের জন্য।

দেখিতে দেখিতে দশটা দিন কাটিয়া যায়।

প্রশান্তের ছুটি ফুরাইয়া গিয়াছে, সে কলিকাতায় ফিরিয়া আসে। প্রথমেই জয়ার সঙ্গে দেখা করে। বিশ্বজিতের গল্প যেন আর শেষ হয় না। জয়া উৎসুক হইয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে দাদার সম্বন্ধে। কেমন আছে? কিভাবে দিন কাটে। জেলখানায় খেতে দেয় কেমন প্রশ্ন যেন শেষ হয় না।

প্রশান্ত যে দিন জয়াদের গ্রামে যায়—সেই দিনটা জয়ার আজও মনে পড়ে।

কি চমৎকার ইংরাজী বলিতে পারিত প্রশান্ত ঐটুকু বয়সেই, আর কেমন স্মার্ট চালচলন। জয়ার খুব ভাল লাগিত তাহাকে। তাহার বাবা দুইজনকে একসঙ্গে পড়াইতেন বাড়ীতে। তাহার বাবার প্রিয়ছাত্র—ক্লাসের ফার্ষ্ট বয়, প্রশান্ত। সুব্রতর বাবা ছেলের মতই স্নেহ করিতেন তাহাকে। জয়ার চাইতে দুবছরের বড়, কিন্তু এক সঙ্গেই পড়িত তাহারা। বাবার বদলীর চাকরির জন্য দুইটি বছর নষ্ট হয় তাহার।

সুব্রতর বাবাই প্রথমে লেখেন শিবনাথকে, "এত মেধাবী ছেলেটার পড়াশুনা এভাবে ঘুরে ঘুরে নষ্ট না করে ওকে এখানে ভর্তি ক'রে দাও।"

সেই হইতেই সে জয়াদের পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। জয়ার মা মারা গিয়াছে বছর দুই হইল। এতদিন সে বাবার কাছেই লেখাপড়া করিয়াছে বাড়ীতে। জয়া ও প্রশান্ত দুইজনেই ম্যাট্রিকপাশ করিয়া কলিকাতায় একই কলেজে ভর্তি হয়।

ক্লাসে পড়া শুনিতে শুনিতে আরতি হঠাৎ জয়ার খাতাটা টানিয়া লইয়া বলে ,"বাঃ চমৎকার হাতের লেখাটা ত! সোরাবরোস্তমের এই প্রশ্নটা কে লিখে দিয়েছেরে?"

"ছেলেদের ডিপার্টমেণ্টের প্রশান্ত।" ছোট্ট উত্তর দেয় জয়া। আরতি অবাক হইয়া বলে, "সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে! তোর চেনাশুনা বুঝি?"

জয়া সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে শুধু, কোনও কথা বলেনা। তাহার মন তখন অনেকদূরে। কলেজে আসার সময় পত্রিকায় দেখিয়া আসিয়াছে—রাজবন্দীরা অনশন আরম্ভ করিয়াছে। কাহারও কাহারও অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাহার মন শঙ্কাকুল হইয়া উঠে—"দাদা আর বাঁচবেনা হয়তো!" তাহার চোখ জলে ভরিয়া উঠে।

প্রশান্তও পড়িয়াছে সংবাদটা। সে জয়ার সঙ্গে দেখা করে। একসঙ্গেই দুইজনে হাটিয়া চলে রাস্তায়। প্রশান্তও লক্ষ্য করে, জয়ার চোখের পাতা ভারী। তাহার মনের অবস্থা বুঝিয়া লয় সে। "কাঁদছিলে বুঝি! এই বুঝি বিপ্লবী দাদার বোন তুমি।" স্নেহের শাসন কথার সুরে। জয়া লজ্জিত হয়ে মনে মনে, তবু চোখ জলে ভরিয়া উঠে আবার। "রাস্তায় লোকেরা কি ভাববে বলতো?" প্রশান্ত শাসনের সুরে বলে। জয়া নিজেকে সংযত করিয়া লয়।

কয়েকদিন পর আবার জয়ার সঙ্গে দেখা করতে আসে প্রশান্ত।

"বল কি খাওয়াবে?"

জয়া বুঝিয়া উঠে না ব্যাপার কি। প্রশান্ত পকেট হইতে জয়ার বাবার পত্র বাহির করে। তিনি লিখিয়াছেন, সুব্রত খালাস পাইয়া সেইদিনই বাড়ী যাইতেছে। সে যেন জয়াকে লইয়া তাহার সঙ্গে ষ্টেশনে দেখা করে।

জয়া খুশিতে ঝলমল করিয়া উঠে। ছুটিয়া গিয়া বোর্ডিংএর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া প্রশান্তর সঙ্গে ষ্টেশনে যায়। উপরের বারন্দায় দাঁড়াইয়া আরতি দেখে উহাদের। কোনও

প্রশ্ন করার আগেই চোখের আড়াল হইয়া যায়। উহাদের সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট সন্দেহ ছায়াপাত করে তাহার মনে। ষ্টেশনে গিয়া জয়ার বুক ঢিপ ঢিপ করিতে থাকে। কতদিন পর দাদার সঙ্গে দেখা হইবে। কিন্তু মা-ত আর দাদাকে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। জয়ার চোখ ছলছল করিয়া উঠে। সুব্রত বোনকে অপ্রত্যাশিতভাবে ষ্টেশনে পাইয়া সুখী হয় খুব। হাসিয়া কাঁদিয়া আকুল হয় জয়া। দুই একটা সামান্য কথা হয় প্রশান্তর সঙ্গে। প্রশান্ত বিশেষ কিছুই বলিতে পারেনা—সামনেই বেঞ্চিতে একটা আই-বির লোক বসিয়া আছে।

১৯৩১ সাল পড়িয়াছে। বিশ্বজিতের দেখিতে দেখিতে দীর্ঘ ছয় বছর পার হইয়া যায়। মনে হয় এইত সেদিনকার কথা। থানার গারদ, ডি, আই, বির বেরাক, ঢাকা জেল, বক্সা দুর্গ, অন্তরীণ বাস আবার বক্সা।

বন্দীজীবনের একটানা স্রোতের মধ্যে কত ছোট ছোট আবর্ত সৃষ্টি হইয়াছে। উঠানামা, ঘাতপ্রতিঘাত, নূতনে পুরাতনে সংগ্রাম। তার পর পরিশ্রান্ত হইয়া ক্রমশ নিঝুম হইয়া পড়িয়াছে সে। সুব্রতদাও খালাস পাইয়া চলিয়া গিয়াছে। বড় একা বোধ করে বিশ্বজিৎ। নিজের ছোট্ট ঘর আর টেনিস লন, এই তার পরিসীমা। নিজেকে গুটাইয়া সে অন্তরালে লইয়া আসে। বাহিরের জন্য মনটা ব্যাকুল হইয়া উঠে। কিন্তু বাহিরে কিইবা আছে তাহার আকর্ষণ। মা! মাকে তো সে কোনদিনই আপন করিতে পারে নাই। তবু সে একটু ভাবে তার

মার জন্য। যেন জোর করিয়াই মার ভাবনাটা মনে জাগাইতে চায়।

কিন্তু তাহার নিঃসঙ্গতা দূর হইবে কি করিয়া। এরই মধ্যে সে অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছে। চোখে মুখে চিন্তাশীলতার সুস্পষ্ট ছায়া। আজকাল বন্দীনিবাসেও আর সে উৎসাহ নাই। একটানা একঘেয়ে জীবনের সুদীর্ঘ স্রোত বহিয়া চলিয়াছে।

একমাত্র কেহ যখন বাহিরের খবর লইয়া ছুটি হইতে ফিরিয়া আসে তখন বেশ একটু সরগরম হইয়া উঠে আবহাওয়া।

সেদিন ভোরবেলায় প্রেসিডেন্সি জেল হইতে এক ভদ্রলোক আসিয়াছেন, আন্দামান বন্দীদের অনশনের খবর লইয়া। এই অনশনের সমর্থনে সকল বন্দীনিবাসে নাকি ধর্মঘট হইবে।

বাহির হইতে বিক্ষুব্ধ ছাত্রসমাজ, আর চটকল শ্রমিকের ধর্মঘট আবার দেশের রাজনৈতিক জীবনে আগুন ধয়াইয়া দিযাছে।

মুহূর্তের মধ্যে এইসব সংবাদ সমস্ত বন্দীনিবাসে ছড়াইয়া পড়ে। সমস্ত দলনিবিশেষে অনশনে যোগদান করিবে ঠিক হইয়া যায়।

বহুদিনপর বিশ্বজিতের নিস্তেজ মন আবার চাঙ্গা হইয়া উঠে। তাহার সাম্যবাদী বন্ধুরাও আগাইয়া আসিয়াছে। ইহাই তো সে চায়। লোকে বলে, তাহারা শুধু গ্রন্থকীট। কিন্তু আজ সংগ্রামের পুবোভাগে তাহাদের দেখিয়া বিশ্বজিৎ খুশি হইয়া উঠে।

বহুদিন পরে আজ আবার সে ১৯ নম্বরের ঘরের দিকে চলিতে থাকে। এক পা এক পা করিয়া ঘরে ঢুকিতেই নলিন ঘোষের সঙ্গে দেখা হয়।

"এই যে বিশ্ববাবু যে, আজকাল আপনার দেখা পাওয়াই ভার। চলুন আমাদের ধীরেনদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি। ধীরেনদা মিরাটের আসামী ছিলেন। এই মাত্র কয়দিন হয় এখানে এসেছেন।"

ধীরেন বাবু বিশ্বজিৎকে দেখিয়া বলেন, "বিশ্ববাবু আমি কিন্তু আপনার জেলারই লোক। চলুন একটু বাইরে গিয়ে বসা যাক।"

তাহারা বাহিরে মাঠে আসিয়া বসে। বিশ্বজিতের সঙ্গে তাহার অনেক আলাপ হয়। ধীরেন বাবুরও তাহাকে ভাল লাগে, অথচ কি ভুলের বশেই না উহাদের মত কত ছেলেকে হারাইতে হইয়াছে।

ধীরেন বাবু বলেন, "আপনি ওদের খুব দোষ দিতে পারেন না কিন্তু। কারণ বাইরের বাস্তব অভিজ্ঞতাব মধ্য দিয়ে ওরা সাম্যবাদ গ্রহন করেনি। সেইজন্যই ওদের আগ্রহ থাকলেও চিন্তার আয়তন সঙ্কীর্ণ।"

বিশ্বজিৎ যেন কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠে।

আজ তাহারই জয় হইল। এই সেই ধীরেনদা যিনি সাম্যবাদ আন্দোলনের সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। এ তারই যোগ্য কথা। তিনি ত ১৮ই এপ্রিলের বীর শহীদের সম্মান করিতে একটুও দ্বিধা বোধ করিলেন না। নিজের আদর্শকে তিনি সম্মান দিতে জানেন। তাঁহাকে দেখিলেই বোঝা যায়, সমাজেব সঙ্গে তাহার কত গভীর সম্বন্ধ।

অল্পদিনের মধ্যেই ধীরেনদা বন্দীনিবাসের অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। বন্দীনিবাসের সমস্ত দলনির্বিশেষে তাহার যাতায়াত সর্বত্র। নলিনদারাও নিজেদের অনেকখানি শোধবাইয়া নিয়াছেন তাহার সংস্পর্শে আসিয়া।

এদিকে বন্দীনিবাসের অনশনের মীমাংসা হইয়া যায়। মহাত্মাজীর 'তার' জানাইয়া দেওয়া হয়। আন্দামানের দাবী মিটিয়াছে। বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হইবে, এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। দিন সাতেকের মধ্যে বন্দীমুক্তি আরম্ভ হইয়া যায়।

একশ জন করিয়া চৌদ্দশ বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইবে।

বন্দীশিবিরে একটা নিস্তেজ উত্তেজনা। বাহিরে যাইবাব এত প্রয়োজন, এত আগ্রহ, তবু কেন যেন আনন্দ হইতেছে না।

৪র্থ তালিকায় বিশ্বজিতের নাম বাহির হয়। ডিপুটি জেলাব আসিয়া তাহাকে প্রস্তুত থাকিতে বলে। কাল সকালেই মুক্তি দেওয়া হইবে। কিন্তু এই মুক্তির সংবাদেও বিশ্বজিৎ উৎসাহ বোধ কবিলনা।

জীবনের একটা বিশষ সময়ে সে যাহাদের সঙ্গে কাটাইযা গেল তাহাদের জন্য মায়া লাগে। সতীশদা, উপেনদা প্রভৃতি পুবান দাদাদেব সঙ্গে আদর্শগত মিল আর না থাকিলেও তাহাদেব নিকট আজ সে নিজেকে ঋণী বোধ করে।

আর ধীরেনদা, তাহাকে মাত্র পাইল কিছু দিনের জন্য—তবু তিনিই ত তাহার ভবিষ্যতের বন্ধু। তাহাব কথা ভাবিতে মন বিদাযের ব্যথায় ভরিয়া উঠিলেও বিচ্ছেদ বেদনায় আচ্ছন্ন হইযা উঠে না। কিন্তু উপেনদা, সতীশদা—তাহাদের সাথে ত এই শেষ। এই বন্দীজীবনেব যাত্রা শেষেই তাহাদের সঙ্গে শেষ যাত্রা।

কেমন যেন হারান সুরেব অস্পষ্ট ব্যথায় মনটা ভারী হইযা উঠে।

ভোর বেলায় সিপাহী আসিয়া ডাকিয়া লইয়া যায়। বন্দীনিবাসের জমাদারটি পর্যন্ত আজ তাহার কাছে আপন হইয়া উঠিয়াছে।

মনের কোন এক গোপন স্তরে উহাদেব জন্যও ব্যথা যে কেমন করিয়া সঞ্চিত হইযা বহিয়াছিল, তাহা সে নিজেও কোনদিন বুঝতে পাবে নাই ইহার পূর্বে।

দুর্গের বড় দরজা পাব হইয়া সে বাহিরে দাঁড়ায়। বড় জমাদার সসম্ভ্রমে বলিয়া উঠে, "যাইয়ে বাবু। বাবু বড়া আচ্ছা থা।"

বিশ্বজিৎ পেছনের ফাঁক দিয়া ভিতরের সাথীদের বিদায় দৃষ্টিগুলি

অনুভব করে। পেছনে বিদায় বেদনা আর সামনে মুক্ত পৃথিবীর প্রথম অভিনন্দন।

সে ধীরে ধীরে আঁকিয়া বাকিয়া পাহাড়ী পথ দিয়া নামিতে থাকে। জীবনে হয়তো আর এখানে আসিবেনা।

পিছনে ফিরিয়া তাকায় একবার। শেষ দেখা দেখিয়া লয় সে।

নরেশদা সতীশদা ধীরেনদা রমেন ৪নং ওয়ার্ডের উঁচু জায়গাটায় তখন দাঁড়াইয়া তাহার গতিপথ লক্ষ্য করিতেছে। বিশ্বজিৎ মনে মনে শেষবারের মত তাহাদের নমস্কার জানায়—শ্রেষ্ঠদিনের সাথীদের উদ্দেশ্যে।

জেলখানা হইতে খালাস পাইয়া আসিয়া বিশ্বজিৎ প্রথমেই সুব্রতদার সন্ধানে বাহির হয়। ঠিকানা মিলাইয়া বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করে। দুয়ারে দাঁড়াইয়া অতি সন্তর্পণে কড়া নাড়ে—কি জানি, সুব্রতদা বাড়ী আছে কিনা। আবার কতদিন পরে তাহার সঙ্গে দেখা হইবে—খুশিতে মনটা ঝলমল করিয়া উঠে।

একটি মেয়ে আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দেয়। "ও, আপনি! আমরা ভেবেছিলাম—প্রশান্ত বুঝি।"

খুশিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠে মেয়েটি।

বিশ্বজিৎ একটু অপ্রস্তুত হইয়া বিনয়ের সঙ্গে বলে, "আমাকে নিশ্চয় আপনি চেনেন না। সুব্রতদাকে বলুন—"

মেয়েটি মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া, মৃদু হাসিয়া উত্তর দেয়, "কেন চিনবোনা! বিশ্বজিৎ রায়কে না চেনার ত কোন কারণ নেই।

আর আমাকেও আপনি নিশ্চয়ই চেনেন, চলুন এবার ওপরে চলুন।"

বিশ্বজিৎ অবাক হইয়া মনে করিতে চেষ্টা করে—এর সঙ্গে কোনদিন দেখা হইয়াছে কিনা।

"জয়া না?"

জয়ার চোখ দুইটি কৌতুকে নাচিয়া উঠে। সে প্রায় ছুটিয়াই উপরে উঠে। চিৎকার করিয়া বাড়ীটা মাতাইয়া তোলে, "ও দাদা শীগ্‌গীর দেখ-এসে, কে এসেছেন।" সুব্রত বিশ্বজিৎকে দেখিয়া আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া জড়াইয়া ধরে তাহাকে।

জয়া উপরে আসিয়াই দাদাকে বলে, "উঃ, কি বিনয় তোমার বন্ধুর! বলছেন, আমাকে ত আপনি চেনেন না।'

বিশ্বজিতের দিকে তাকাইয়া বলে, "আপনাকে না চিনে পারি! জেলখানা থেকে বার হ'য়েও দাদার আমার চোখে মুখে প্রসন্ন হাসি নেই—"

সুব্রত জয়াকে কথা শেষ করিতে দেয় না। "জয়া, অতীতের বোঝাপড়া এখন্ রেখে বিশ্বব অনারে দ্বিতীয় পেয়ালা চা খাওয়াও।"

উহাদের চায়ের মজলিস সবে ভাঙ্গিয়াছে। ঘরের মধ্যে তখনও শূন্য পেয়ালা ও পিরিচগুলি পড়িয়া আছে। তিন ভাই বোন—সুব্রত, জয়া ও প্রিয়ব্রত। ছোট্ট একটি ফ্ল্যাটবাড়ী লইয়া আছে উহারা।

জয়া কিছু নারিকেল কোড়া, চিনি ও আটার রুটি—লইয়া আসে রেকাবে করিয়া। নূতন করিয়া খাবার করিবার মত ধৈর্য নাই এখন। দাদার সেই জেলখানার বন্ধু আসিয়াছে। ভাল করিয়া দেখাই হয় নাই তাহাকে এখনও। প্রশান্তর মুখেও কত গল্প শুনিয়াছে সে তাহার এই বিশ্বদার।

জয়া তাড়াতাড়ি চায়ের জল ও খাবারের রেকাব লইয়া ঘরে ঢোকে। 'টি-পটে' চা ভিজাইয়া বলে, "নিন—প্রোলিটারিয়েট ডিস।" চোখে তাহার দুষ্টু হাসি ফুটিয়া উঠে। দাদার মুখে শুনিয়াছে—সে সাম্যবাদী। বিশ্বজিৎ জয়ার কথাটা শুনিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া একটু হাসে।

তাহাব এই অকুণ্ঠিত, সপ্রতিভ ভাবটি বেশ ভাল লাগে তাহার। মনে মনে ভাবে সে, 'তোমাকেও আমাদের চাই।'

জয়া পেয়ালায় চা ঢালিতে ঢালিতে ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখে বিশ্বজিৎকে—তাহার গভীর অন্তদৃষ্টিভরা চোখদুটি।

সুব্রতব বাড়ী হইতে প্রশান্তব হোষ্টেলে যায় বিশ্বজিৎ।

প্রশান্ত খুশিতে চেঁচাইয়া উঠে, "উঃ, বিশ্বদা! কতদিন পব দেখা হ'ল!"

বিশ্বজিৎ মার চিঠিতে মাঝে মাঝে প্রশান্তব খবব পাইত। ম্যাট্রিক পাশ করিয়া সে বিদ্যাসাগব হোস্টেলে থাকিয়াই পড়িতেছে। ফোর্থ ইয়ারে পড়ে; ছাত্রদের মধ্যে খুব পপুলার। তাহারা উচ্ছ্বসিত হইয়া প্রশংসা করে, "চমৎকার বক্তৃতা দেয় প্রশান্তদা।"

অনেকক্ষণ ধরিয়া দুই ভাইয়ে পুরান স্মৃতির রোমন্থন করে। দুইজনেই পূর্ণমাত্রায় প্রসন্ন। বিশ্বজিতের প্রশ্ন যেন ফুবায়না। বাইরের দুনিয়ার কত কিছু খবর তাহাব জানিবার আছে।

"তারপর, ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলন কেমন চলছে?" বিশ্বজিৎ জানিতে চায়।

"রয়িষ্ট ও কমিউনিষ্টদের পাল্লা চলছে খুব—দু'দিনেই টের পাবে, ব্যস্ত কি।" প্রশান্ত জবাব দেয়।

খুশির সুরে সে বলে, "আপাততঃ রাজনীতির আলোচনা জমা থাক। এত' চিরন্তনী খোরাক আছেই। এখন চল একটু বায়েস্কোপ দেখে আসি—মেট্রোতে ভাল বই আছে।"

দুইজনে বাহির হইয়া পড়ে।

এস্‌প্লানেডে আসিয়া প্রশান্ত বলে, "দাঁড়াও আগে তোমার শুভ আগমনের খাওয়াটা হোক।"

সাত বছর পর কলিকাতার প্রকাশ্য রাস্তায় বিশ্বজিৎ। সবই নূতন নূতন লাগে। কত পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে এরই মধ্যে।

দুইজনে বেঙ্গল রেষ্টুরেণ্টে ঢোকে। বেয়ারা আসিয়া সেলাম দিয়া ফ্যানটা খুলিয়া দেয়। প্রশান্ত চেয়ারটা টানিয়া বসিয়া, চায়ের অর্ডার দেয়।

"বাড়ী যাচ্ছ ত শীগ্‌গীরই নিশ্চয়?" প্রশান্ত প্রশ্ন করে। "মাসীমাব কিন্তু সেই এক কথা এখনও—ছেলে সংসারী হ'লনা।"

একটু থামিয়া প্রশান্ত আবার বলে, "বাস্তবিকই মেয়েদের যে কি ভয়ানক সংসার জিনিষটার উপর আকর্ষণ, তা' আমি মাসীমাকে দেখে এই কয় বছরে দারুণ বুঝেছি। স্বদেশীতে ঢুকে তুমি বেঁচে গিয়েছ বিশ্বদা। ঐ ত গৌরীশঙ্কর কাকা আছেন, দিনরাত পোষাবিলিতি কুকুর নিয়ে আর শিবশঙ্কর কাকা আছেন তাঁর সখের ফুলবাগান নিয়ে—এবার তুমি গিয়ে তরকারির বাগান নিয়ে ব'সে পড়।" দুষ্টু হাসি খেলিয়া যায় প্রশান্তর চোখে।

আবার গম্ভীর হইয়া সে বলিতে থাকে, "জমিদারদের সঞ্চয় করাব আকর্ষণ যে কত প্রবল, আর কি সাংঘাতিক, তা' আমি ওখানে থেকেই বুঝেছি। টাকার কথা বাদই দাও; কুমড়ো, শশা, গুড়, চিনি থেকে আরম্ভ করে, কাপড় জামা পর্যন্ত। জিনিষেব যে একটা পচন শক্তি আছে তা এরা বুঝবেন না।"

বিশ্বজিৎ হাসিয়া বলে, "আচ্ছা এবার তোর নিজের খবর বল ত একটু।"

চপের শেষ টুকরাটা মুখে পুরিয়া প্রশান্ত গাম্ভীর্যের ভান করিয়া বলে, "চোখের উপর এ অন্যায় অপচয় দেখে দেখে রাজনীতিতে না জড়িয়ে আর পারলামনা। ছাত্রদের মধ্যে বক্তৃতা দেই—দরকার হ'লে মারামারির জন্য তৈয়ার হই—আর অবসর সময়ে পরীক্ষার পড়া মুখস্ত করি।"

বেয়ারা আসিয়া ট্রেতে করিয়া চায়ের পেয়ালাগুলি লইয়া যায়। একটু মশলা মুখে দিয়া উহারা বাহির হইয়া পড়ে।

"দেরি হ'য়ে গেল একটু। যাক্, ইণ্টারভেলের পরই ত বই আরম্ভ।"

বিশ্বজিৎ একটু অবাক হয়, "সে আবার কি রকম?"

সে রাত্রিতে প্রশান্ত বিশ্বজিতের ঘরেই শোয়। প্রশান্ত ঘর দেখিয়া খুশি হয়, "বাঃ চমৎকার ঘরটা ত পেয়েছ। বেশ আড্ডা দেওয়া যাবে মাঝে মাঝে।"

অনেকরাত পর্যন্ত দুইজনে গল্প করে। "সুব্রতদার বাড়ীতে গিয়েছিলাম। তোর জয়ার সঙ্গেও আলাপ হ'ল। বেশ ভালই লাগলো তাকে। তোর সঙ্গেইত পড়ে; তাইনা?" বিশ্বজিৎ জিজ্ঞাসা করে। প্রশান্ত একটু চাপ দিয়া বলে, "দেখো সাবধান! মাসীমা কিন্তু তোমার জন্য কত যে বৌ ঠিক করছেন তার শেষ নেই।"

বিশ্বজিৎ একটু লজ্জা পাইয়া মনে মনে ভাবে, 'সেই লাজুক ছেলে প্রশান্ত আজই কি ফাজিল হ'য়ে উঠেছে!'

পরের দিন খুব ভোরে উঠিয়া বিশ্বজিৎ বাহির হইয়া পড়ে, কমরেড রহমানের ঠিকানা লইয়া।

জেলখানা হইতে রাজবন্দীরা কতকগুলি জামাকাপড় দিয়া দিয়াছে তাহার সঙ্গে—বাইরের কর্মীদের জন্যে। সেগুলি পৌছাইয়া দিতে যায় সে।

রহমানের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হয়—জেলখানার ভিতরের অবস্থা সম্বন্ধে। যাইবার সময় রহমান বিশ্বজিতের সঙ্গে রাস্তা পর্যন্ত নামিয়া আসে। "আমাদের শীগ্‌গিরই একটা মিটিং আছে, আসবেন সেদিন!" বিনীতভাবে বিশ্বজিতকে জানায়।

বিশ্বজিৎ রহমান সম্বন্ধে মনে মনে একটা শ্রদ্ধার ভাব লইয়া বাড়ী ফেরে। কতবড় একজন বিপ্লবী—অথচ কি অমায়িক ব্যবহার! মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় ছিলেন উনি! আশ্চর্য এতটুকু আভাষ পাওয়া যায়না বাহির হইতে। বিশ্বজিৎ এই সামান্য আলাপেই তাহার সম্বন্ধে অভিভূত হইয়া পড়ে।

কয়েকদিনের মধ্যেই আবার তাহার দেখা হয় রহমানের সঙ্গে একটা ঘরোয়া বৈঠকে। তিনতলার উপর ছোট্ট একটা ঘর। দেওয়ালে লেনিন ও স্টালিনের ছবি টাঙান। এক কোণে একটা ছোট্ট টেবিলের উপর খানকয়েক মার্কসীয় দর্শনের বই। মেঝেতে কতকগুলি মাতুর বিছান। বারোজন কর্মীর ছোট্ট একটি বৈঠক।

শান্তাও আসিয়াছে। বিশ্বজিতের সঙ্গে চোখে চোখ পড়িয়া যায়। দুইজনেই খুশিতে ভরপুর হইয়া উঠে, আলোচনা আরম্ভ হইয়া যায়—শান্তা দুয়ারটা বন্ধ করিয়া দিয়া আসে। আলোচনার বিষয়বস্তু কাজভাগ লইয়া। কে কোন বিভাগে কাজ করিবে—কাহার কি রকম সুবিধা অসুবিধা তাহার বিস্তারীত আলোচনা হয় অনেকক্ষণ ধরিয়া।

একজন রাজবন্দী প্রশ্ন করেন—"৩০ সালেই বা কংগ্রেসে যোগদান করা হলনা কেন? তার পেছনে যুক্তি কি ছিল?"

রহমান বুঝান, "সে সময়ে কংগ্রেসে যোগদান না করাটায় পার্টির দিক থেকে ক্রুটী অবশ্য কিছু হ'য়েছিল—কিন্তু তা'র পেছনে অনিবার্য কতকগুলি কারণও ছিল। তখনকার কমিউনিস্টদের সাইকলজিক্যাল কারণটাও ভেবে দেখবার মত। সে সময়ে পৃথিবীব্যাপী বুর্জোয়াদের তরফ থেকে কমিউনিস্ট বিরোধী আন্দোলন খুব বেশী শুরু হয়—তার প্রতিক্রিয়া এদের মনেও দেখা দেয়।"

রহমানেব কণ্ঠস্বর উত্তেজিত হইয়া উঠে। তিনি বলিতে থাকেন, "যেমন আমবা দেখি চীনের চিয়াংকাইশেক গভর্ণমেণ্ট তিনশ কমিউনিস্ট ছাত্র ছাত্রীকে গুলি ক'রে মারলো ক্যাণ্টনের বাস্তায়। তারপর জার্মানীতে সোসালডিমোক্রাটদেরই ক্ষমতা তখন প্রবল। তাদেরও কমিউনিস্টদের প্রতি ব্যবহার ঐ একই ধবণের—লিবনেকট, রোজা লাকসেমবার্গকে গুলি ক'রে মারে।"

বহমানের চোখে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলিয়া উঠে, "ইংলণ্ডেও তাই। তারপর ভারতবর্ষেও কংগ্রেস প্রজাসত্ব আইন সমর্থন করেনা।"

একটু থামিয়া রহমান আবার বলেন, "কমিউনিস্টদের উপর দমন নীতির যেমন মিরাট ষড়যন্ত্রমামলার বিরুদ্ধেই বা কংগ্রেসীরা কি আন্দোলন করলেন? অবশ্য তা' সত্বেও কংগ্রেসে যোগদান করাই উচিৎ ছিল সে সময়ে। যোগ না দেওয়াতেই পার্টি জাতীয় আন্দোলন হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে।"

সন্ধ্যা হইয়া আসে। সেদিনের মত বৈঠক শেষ হয়। কাজের একটা মোটামুটি খসড়া করা হইয়া যায়।

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে শান্তা বিশ্বজিতের কাঁধে হাত রাখে।

"কবে খালাস পেলে?" তাহার চোখে মুখে খুশির ভাব।

দুইজনে রাস্তায় নামিয়া আসে।

বিশ্বজিৎ উল্লসিত হইয়া উঠে, "কত দিন পর দেখা হ'ল বলত শান্তাদি!"

"চল, চা খাওয়া যাক—অনেক কথা আছে।"

দুইজনে রেষ্টুরেণ্টে ঢোকে। বিশ্বজিতেব প্রশ্ন .আব যেন ফুবায় না। "এখানে কোথায় আছ? কে কে আছেন বাড়ীতে? কি করছো এখন?"

শান্তার চোখদুইটি একটু ম্লান হইয়া আসে।

"বাবা ত আমি জেলে থাকতেই মারা যান। মা আব আমি শুধু এখানে। আমি এখন একটা স্কুলে কাজ কবছি। আব বাকী সময় রাজনীতি। একটা পত্রিকা বেব করেছি—নাম 'ফুলকি।' যেও একদিন!"

শান্তা রাস্তাটা বুঝাইয়া দেয়।

"নীমুর খবর কি?"

"সে এম-এ পাশ ক'বে ল' পড়ছে। উগ্র রায় পন্থী। ছাত্রদেব কোনও সভা হলেই দেখতে পাবে তাকে। চমৎকাব চেহাবা হ'য়েছে এখন। দস্তুরমত এক বলিষ্ঠ সুপুরুষ বলা যায। বক্তৃতাও দেয় ভাল, ছাত্রদের আকৃষ্ট করতে পারে খুব সহজে।"

"ছাত্রদের মধ্যে দুইদলের সংঘর্ষ বুঝি খুবই চলেছে?"

"উঃ দারুণ। অবশ্য আমরাই দলে ভাবী। তবে ওদেব ইনফ্লুয়েন্সও কম নয়। আমাকে এবাব উঠতে হয়। study circle এ যেতে হ'বে।"

দুইজনেই বাহিব হইয়া আসে।

"মেয়েদের মধ্যে কি রকম সাড়া?" বিশ্বজিৎ জিজ্ঞাসা কবে রাস্তায় চলিতে চলিতে।

"আছে কিছু কিছু। তবে ছেলেদের তুলনায় সামান্যই। হবেই বা

কি ক'রে? ঐ ত কটা মাত্র কলেজ মেয়েদের। সবই প্রায় গভর্ণমেণ্ট কলেজ, তার আবহাওয়াও সেরকম।"

শান্তার বাস্ আসিয়া পড়ে। সে বাসে্ উঠিয়া বসিয়া বিশ্বজিৎকে বলিয়া যায়, "যেও কিন্তু একদিন আমার ওখানে ঠিকানাটা মনে থাকবে ত?"

বিশ্বজিৎ সাতদিনের জন্য বাড়ী আসে। বনলতা প্রথমটা খুব আপত্তি করে, "এতদিন পর এলে, এখনই আবার কোলকাতায় যাবার কি দরকার?"

বিশ্বজিৎ মাকে বোঝায়, "এম এ পরীক্ষাটা দিয়েই ফেলি। জেলখানায় ব'সে ব'সে কয়বছর পড়লামই যখন। ডিগ্রিটা আর বাকী রাখি কেন? ছয়মাস পরই পরীক্ষা, এখন হ'তে না পড়লে চলবে কেন?"

চারুবালা আসে বারে বারে। তাহার সুজিৎ বিলাতে, মনটা বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগে। বিশ্বকে দেখিয়া সুজিতেয় কথা মনে পড়ে। বারে বারে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে সে বিশ্বজিতের সঙ্গে গল্প করিতে।

গৌরীশঙ্করের বৌর গল্প উঠে। "একটি ছেলে হয়েছে তার বছর দুইর। কল্যাণকে দেখেছত; মাঝে মাঝে এখানে আসতো; তারই বড়বোন মুকুল। বোর্ডিং এ থেকে পড়তো কোলকাতার স্কুলে। ম্যাট্রিকটা আর দিতে পারলো না বিয়ে হ'য়ে গেল।"

শিবশঙ্কর আসিয়া বলে, "বৌমাকে আনতে লোক পাঠাই কি বল? বিশ্ব ত তাকে দেখে নাই!"

বিশ্বজিৎ ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখে দশআনির কত পরিবর্তন! নূতন রেডিও কিনিয়াছে। সারাটা বাড়ীই গানের সুর মাখান। মনটা নাড়াচাড়া দিয়া উঠে গানের সুরে সুরে।

দরদালানটাকে বসবার ঘর করা হইয়াছে আধুনিক রুচিতে। দেওয়ালের গায়ের সেই সীতার বনবাস ও দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের ছবির পরিবর্তে, পাহাড়ী লালমাটি ও শিলাস্তুপের সিনারী।

মনে মনে ভাবে সে, "মুকুলকাকীরই পছন্দ নিশ্চয়।"

দুইদিনের মধ্যেই মুকুল, ভাশুর-পোর আসার সংবাদ পাইয়া, আসিয়া পড়ে। বিশ্বজিৎ স্টীমার ঘাটে যায়। শিবশঙ্কর নূতন মটরগাড়ী কিনিয়াছে। মটর লইয়া বৌকে আনিতে যায়। স্টীমার ঘাটে লাগে। ছোট্ট ক্যাবিনটার কাচের জানালার ধারে দাঁড়াইয়া মুকুল। বিশ্বজিৎ মুগ্ধ হইয়া দেখে তাঁহার অনিন্দ্য-সুন্দর মুখশ্রী। গোলাপী গালদুইটি সূর্যের রৌদ্রের তাপে আরও লাল হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বজিৎ মনে মনে প্রশংসা করে, 'সুন্দরী ঠিকই।' ষ্টিমারের সিঁড়ি লাগান হইয়া যায়। সে ষ্টিমারে গিয়া নূতনকাকীকে নমস্কার জানায়।

"চিনলেন ত ?"

মুকুল মৃদু হাসিয়া সুনম্র কণ্ঠে উত্তর দেয়, "তা' আর চিনবো না ? আপনাদের মত লোকের নাম যে কপালেই লেখা থাকে।"

নূতন কাকীমার সঙ্গে হাসি গল্পে দিনকয়টা ভালই কাটিয়া যায়। এক দিনও দুপুরে ঘুমাইতে দিবেনা বিশ্বজিৎ কাকীমাকে। "আমি চলে গেলে যতখুশি ঘুমুবেন। কল্যাণকে নিয়ে এলেই পারতেন।"

"ওরে বাপরে", মুকুল চোখ টানিয়া উত্তর দেয়, "সে কথা মুখেই আনার সাধ্য নেই। স্বদেশী নিয়ে যা মেতে আছেন তিনি, দিদির বাড়ীর নিমন্ত্রণ খাওয়ার সময় নেই তার।"

বিশ্বজিৎ হাসিয়া বলে, "তাই নাকি ! সেও তবে বসে নেই ?"

দুইদিনেই বিশ্বজিত লক্ষ্য করে মুকুলকাকীর চালচলনে বেশ একটা গর্বিত ভাব সুস্পষ্ট।

ফুলদানীটা সাজাইতে সাজাইতে সে বলে, "শহরের মেয়েদের গ্রামে বিয়ে হ'লে কি যে অসুবিধা। দিনরাত কে কতটুকু ঘোমটা দিল বা না দিল ঐত গ্রামের লোকের একমাত্র কথা। তবু ঐ রেডিওটা ছিল ব'লে রক্ষা। গ্রামে মিশবার মত লোকই বা কই, যে একটু গল্প করি বসে।"

সাত দিন মাত্র বাড়ী থাকিয়া বিশ্বজিৎ আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসে।

প্রকাণ্ড একটা ফ্ল্যাট বাড়ী চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউর উপরে। নীচের তলায় জুতার দোকান, লনড্রী, ছোট একটা রেষ্টুরেণ্ট, একটা গ্যারেজ। দোতালায় আর তিনতলায় অনেকগুলি ছোট ছোট ফ্ল্যাট। চীনা পরিবারই বেশী। দুই একটি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পরিবারও আছে। তিনতলায় রাস্তার দিকের একটি ফ্ল্যাটে বিশ্বজিৎ থাকে? মস্ত একটা ঘর তারই সংলগ্ন ছোট একটি ঘর।

বিশ্বজিৎ ছোট্ট ঘরটি দখল করিয়াছে। চিরদিনই সে একটু একলা থাকিতে ভালবাসে।

বড় ঘরটায় থাকে ইসমাইল, অমলেন্দু ও সুধীর নাগ। তিনজনই এক সহরের ছেলে—একই স্কুলে পড়িত। কিন্তু তিনজনই ছিল সম্পূর্ণ বিভিন্নপন্থী। ইসমাইল ঘোর লীগপন্থী, অমলেন্দু বিবেকানন্দের ভক্ত আর সুধীর নাগ পূর্ণমাত্রায় টেরোরিষ্ট। ইসমাইলদের অনেক উপরে পড়িত সুধীর। মাঝখানে সে স্কুল ছাড়িয়া দেয়। আবার বহুবছর পর ইসমাইলদের সঙ্গে আসিয়া ভর্তি হয়।

স্কুলের প্রত্যেক ছাত্রই তাহাকে ভয় করিয়া চলিত—ডাকাতী করা ছেলে! মাষ্টার মহাশয়রা পর্যন্ত ভয় করিতেন। দেখিতেও গুণ্ডার মত গাট্টা চেহারা—প্রচুর শক্তি গায়ে, মারপিট করিতে ওস্তাদ।

ইসমাইলদের সঙ্গে একেবারেই বনিতনা তাহার। ইসমাইলদের সে সময়ে বড়রা বুঝাইতেন—কমিউনিস্টরা বদমাইস, এতটুকু ছেলেরাও সিগারেট খায়, চায়ের দোকানে আড্ডা দেয়। ওরা কখনও ভাল হইতে পারে না।

ইসমাইল বুঝে, 'ঠিকই সিগারেট খাওয়া ছেলে কখনও ভাল হ'তে পারে না। ঐ সুধীর নাগও নিশ্চয়ই কমিউনিস্ট—না হ'লে এত মারপিট করে যেখানে সেখানে। দাঁড়াও ওকে শিক্ষা দিতে হবে।' একদিন কথায় কথায় তুমুল লাগিয়া যায় সুধীর নাগের সঙ্গে। দুই পক্ষেরই দল সমান প্রস্তুত। দস্তুরমত মারামারি হইয়া যায় দুইদলে। ইসমাইলের কপাল ফাটিয়া যায়। সেই কাটা দাগটা এখনও আছে তার কপালে।

অমলেন্দুর সুনাম ছোট বয়স হইতেই। সহরের শেষপ্রান্তে ছোট্ট একটি আশ্রমে থাকিয়া সে স্কুলে পড়িত। পেপেসিদ্ধ আর নুন ভাত খাইয়া মাসের পর মাস কাটাইয়া দিত সে অনায়াসে। সহরে তখন এমন বাড়ী কমই ছিল, যে বাড়ীতে বিপদে আপদে একবারও সে হাজির হয় নাই। রাত দুপুরে মরাঘাড়ে লইয়া শ্মশানে গিয়া মরাপোড়ান, পোড়াইবার জন্য কুড়ালদিয়া আমগাছ কাটা, কলেরা রোগীর শুশ্রূষা করা হইতে বিয়ে বাড়ীর পরিবেশন করা, এমন কোন কাজ তাহাব বাদ ছিল না। খাট একটা খদ্দরের কাপড় পরনে, একটা খদ্দবের হাফ-সার্ট গায়ে, মাথার চুল ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা।

অমলেন্দু একবার পালাইয়া কাশী চলিয়া যায় সন্ন্যাসী হওয়ার ইচ্ছায়। বড় ভাই অনেক বুঝাইয়া তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া আসে। তাহার পর হইতে সে সম্পূর্ণ বদলাইয়া যায়।

তিনজনেই বিভিন্ন মত হইতে ছাত্র আন্দোলন করিতে করিতে সাম্যবাদে বিশ্বাসী হইয়া পড়ে।

ইসমাইলের সঙ্গে সুধীরদার এখন খুব খাতির। একমাত্র কপালের কাটা দাগটা মাঝে মাঝে পুরাণস্মৃতি স্মরণ করাইয়া দেয়। পুরাণদিনের কথা উঠলে সুধীর নাগ এখন হাসে শুধু। তাহার কাজ হাওড়ার কুলীদের মধ্যে। ইসমাইল ডকমজদুরদের মধ্যে কাজ করে। আর অমলেন্দু এখন ছাত্রনেতা ; ছাত্র আন্দোলন করে। ছাত্রদের পাঠচক্রে ক্লাস নেয়, বুঝাইবার ক্ষমতা তাহার খুব ভাল।

বাকী অবসর সময় বই লইয়া ডুবিয়া থাকে। ঘরের মধ্যে মেঝেতে তিনখানা মাদুর বিছান তিনজনের। মাদুরের উপর আধালেখা পোষ্টার, তুলি, আলতা, আঠা।

এককোনায় কয়েকটা পেয়ালা ও পিরিচ, কয়েকটা স্যুটকেস। ব্রাকেটে ঝুলান ময়লা সার্ট, তেলসিটে তোয়ালে লুঙ্গি। আরেক কোনায় একটা ঝাটা, একটা জলের কুজা ও একটা কাচের গ্লাস।

দেয়ালে টানান একটা ক্যালেণ্ডার, একখানা পৃথিবীর ম্যাপ ও একখানা স্টালিনের ছবি।

তিনজনে সারাদিন রোদে রোদে ঘুরিয়া বেলা একটা দেড়টায় ঘরে ফেরে। তাড়াতাড়ি কয়েকমগ জল মাথায় ঢালিয়া, বুড়া চাকর বিপিনের রান্না ঠাণ্ডাভাত ও পেয়াজ সম্বরার মসুর ডাল লইয়া বসে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কোনদিন হয়তো আবার বাহির হইয়া পড়ে। কোনদিন বা পাঠচক্র বসে মেঝেতে বিছান মাদুরের উপর। ছাত্ররা আসে পাঠচক্রে, দুই একজন মেয়েও আসে। শান্তা আর অমলেন্দুই বেশীর ভাগ দিন ক্লাস নেয় পাঠচক্রে।

খিদিরপুর ডক। নোংরা সরু সরু গলির দুই ধারে ডকমজদুরদের বস্তি। সারি সারি লম্বা খোলার ঘর। মাঝে মাঝে একটা জলের কল। কলের তলায় বাঁধান জায়গাটুকুতে হিন্দুস্থানী মেয়েরা কাপড় কাচে। কেহবা মাটির কলসী ভরিয়া জল লইয়া যায়।

আশে পাশে আনাচে-কানাচে আবর্জনার পচা দুর্গন্ধ। কাল কাল পেট মোটা উলঙ্গ শিশুর বোকা বোকা ফ্যালফেলে দৃষ্টি ভেদ করিয়া হাটে বিশ্বজিৎ আর ইসমাইল। পায়ের তলায় নরম নরম কি যেন প্যাঁচ প্যাঁচ করিয়া উঠে। মোটা কাবুলীসুর স্থকতলীটা পায়ের তলায় ভিজা ভিজা লাগে।

অন্ধকার অলি-গলি বিস্তর পার হইয়া শিবপূজনের ঘর।

ঘরের ভিতরে একটা ভাপসা গন্ধ। পেটের মধ্যে যেন মোচড়াইতে থাকে বিশ্বজিতের। তবু ভাল লাগে শিবপূজনের আন্তরিকতাভরা ব্যবহারটুকু।

"আইয়ে কমরেড।" তাড়াতাড়ি খাটিয়াটা দেয় বসিতে। ময়লা কম্বলটা দিয়া ঢাকিয়া দেয় খাটিয়াটা।

আধাবাংলা, আধা হিন্দিতে কথা বলে সে। "কালত আপনি চলে যাবার পর ইউনুস সাহেবও এসেছিলেন। ইউনিয়ন করার কথা আমি আর সবাইকে বলেছি। তারা সবাই রাজি। নাইট স্কুলেও পড়তে আসবে বলেছে।"

ইসমাইল জিজ্ঞাসা করে, "নাইট স্কুল কোথায় করলে ভাল হয়?"

"ইউনিয়ন অফিস হ'তে পারে—পাড়ার মধ্যে হ'লে সবার সুবিধা"

বিশ্বজিৎ উঠিয়া পড়ে, "চল তাহলে সকলের বাড়ী ঘুরে ইউনিয়নের মেম্বার করে ফেলি এই বেলায়ই।" তাহারা তিনজনে বাহির হইয়া পড়ে রসিদ বই লইয়া, বেশ কিছু সভ্য করা হইয়া যায়।

বিশ্বজিৎ মনে মনে খুশি হয়—"এইত সূচনা, বিরাট ভবিষ্যতের প্রারম্ভ।"

হরিচরণ একটু বাঁকিয়া বসে, "কি আর হ'বে মেম্বর হ'য়ে? কতবারই ত হ'য়ে দেখলাম—কি লাভ হ'য়েছে?" সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়জনও একই সুর ধরে। ইসমাইল বুঝাইতে বসে, "তোমরাই যদি জোট না বাধ— তবে লাভ আর কি ক'রে হবে বল?"

বিশ্বজিৎ বুঝায়, "এই যে এত দুর্ঘটনা ঘটে ডকে—কারও পা ভাঙ্গে, কারও মাথা ফাটে, তার ক্ষতিপূরণ তোমরা ঠিকমত কিছু পাও কি? আইনে ত লেখা আছে পাওয়ার কথা, কিন্তু সত্যি সত্যি কি ক্ষতিপূরণ পাও তোমরা?"

হরিচরন সায় দেয়, "তা আর বলবেন না; এই গেল বছর এতবড় লোহার ক্রেইন ছিঁড়ে প'ড়ে কত লোক যে জখম হ'ল। আমারও বা পাটা ভেঙ্গে গেল না! কয়মাস পর্যন্ত হাসপাতালে থাকি—তবে ত সারে সে পা। ওদিকে ছেলেপুলে নিয়ে বৌটা আধপেটা খেয়ে, না খেয়ে কোনমতে বাঁচে। মেয়ে মানুষ কি ই বা করতে পারে বলুন। সে কি যে সে হাঙ্গামা ক্ষতিপূরণ আদায় করা! বলে, কোর্টে যেতে হ'বে, কেইস ক'রতে হ'বে—একি মেয়ে লোকের কাজ!"

বিশ্বজিৎ বুঝায়, "তবেইত বোঝ, ইউনিয়ন থাকলে কত সুবিধা। আজ তোমার পা ভাঙ্গলে ইউনিয়নই তোমার জন্য খাটবে। কাল আরেকজনের মাথা ফাটলো, ইউনিয়নই খাটবে তার জন্য। একজোট হ'লে, তোমাদেব ঠকাতে পারে কে?"

—"তা ত' ঠিকই"।

ফেরার পথে শৈলেশবাবুব বাড়ীতে যায় বিশ্বজিৎ ও ইসমাইল। রমেন রায় ও তাহার বোন শুভা আসিয়াছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ইউনুসও আসিয়া

পড়ে। সবাই মিলিয়া কাজের প্ল্যান করে। মিটিং শেষ করিয়া অনেক রাতে বাড়ী ফেরে বিশ্বজিৎ। চলিতে চলিতে সে লক্ষ্য করে, একটা লোক তাহাকে 'ফলো' করিতেছে।

জয়াদের ছোট্ট সংসারটি বিশ্বজিতের খুব ভাল লাগে। তিন ভাই বোনের মধ্যে কি সুন্দর মমতাভরা স্নেহের বন্ধন!

জয়া বি, এ, পড়িতেছে, সুব্রতদা ডাক্তারী পড়ে, আর ছোট ভাই আর্টস্কুলে পড়ে।

এ ছাড়া উহাদের আছে অফুরন্ত শান্তির ঐশ্বর্য। আর বিশ্বজিতের আছে শুধু কাজের নাগপাশ। ইউনিভারসিটিতে সে ভর্তি হইয়াছে; কিন্তু পড়াটা তাহার সেকেণ্ডারী; তাহার আসল কাজের জগৎ পড়িয়া আছে বিস্তীর্ণ পৃথিবীর বুকে, সেখানে প্রতিধ্বনিত হয় শুধু রিক্তমানুষের আর্তক্রন্দন। পৃথিবীর বুকে লুকান আছে কত ঐশ্বর্য, কত সৌন্দর্য, তাহার খোঁজ ওরা রাখে না, ওরা জানেও না—ওরা কত বঞ্চিত। উহারা শুধু জানে পরের স্বার্থে নিজেদের প্রতিটি রক্তকণা মাটিতে মিশাইয়া দিতে।

হতভাগ্যের দল! জীবন সায়াহ্নের অবসাদভরা দীর্ঘশ্বাসের মত করুণ নিস্পৃহ প্রাণস্পন্দন। ব্যথা আছে অনুভূতি নাই।

বিশ্বজিতের চমক ভাঙ্গে, তাহার আর বসিবার সময় নাই। সন্ধ্যার পর মাত্র দুই ঘণ্টা সে বস্তিতে কাজ করিতে পারে। বিশ্বজিৎ হাত-ঘড়িটা হাতে বাঁধিয়া উঠিয়া পড়ে।

শিবপূজনের ঘর। ঘরের মধ্যে আরও কয়েকজন শ্রমিক বসিয়া আছে। ঘরের আর এক কোনায় একটা ছেঁড়া মাদুরের উপর দুই তিনটি উলঙ্গ শিশু ঘুমাইয়া আছে।

কিছুদূরে খানিকটা খড়কুটার উপর একটা ছাগল দুইটি বাচ্চাসহ শুইয়া আছে নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে। উহারই কিছু দূরে, শিবপূজনের বৌ মস্ত এক ঘোমটা টানিয়া উহাদের দিকে পেছন দিয়া একবাটি ছাতু মাখিয়া লইয়াছে। বেশী রাত পর্যন্ত বাতি জ্বালাইবার মত তেল নাই তাই সন্ধ্যার আগেই স্বামী ও ছেলেপুলেগুলিকে খাওয়াইয়া, নিজেও রাতের আহার মিটাইয়া রাখিতেছে।

বিশ্বজিৎ ঘরে ঢুকিতেই শিবপূজন একটু লজ্জিত হইয়া তাহার বৌকে একটা দুর্বোধ্য গালাগালি দিয়া উঠে। বৌও ঝাঁজিয়া উঠে—নিজের পেট-পূজা হইয়া গিয়াছে এখন তাহার বেলায় শরম হইল।

হঠাৎ বিশ্বজিতের দিকে নজর পড়ায় সেও লজ্জা পাইয়া চুপ হইয়া যায়। তাই ত চশমাওয়ালা বাবু কখন যে আসিছেন কিছুই টের পায় নাই সে।

বিশ্বজিৎ মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠে। শিবপূজনকে নম্রস্বরে বলে, "খাচ্ছে তাতে কি আর হয়েছে। আমার বোনের মতই ত।"

উপস্থিত সকলেই বিশ্ববাবুর এই নিরহঙ্কার উক্তিতে মনে মনে তাহার প্রতি প্রসন্ন হয়। শিবপূজনের বৌও খুব খুশি—কি সুন্দর মিষ্টি কথা বাবুটির। বলে, 'আমার বহিনের মতই ত'।

বিশ্বজিৎ উঠিয়া পড়ে, "এবার চল তাহলে। মজদুর অফিসেই সভা হ'বে ঠিক হয়েছে।"

তাহারা অন্ধকারের ভিতর বস্তির পাশ দিয়া বাহির হইয়া যায়।

শিবপূজনের বৌ সেদিকে তাকাইয়া আস্তে আস্তে বলে, "ভগবান বহুৎ মঙ্গল করবেন উহাব।"

তাহারা সকলে মজদুর অফিসে আসিয়া মেঝের উপর বসে।

রমেন রায় বক্তৃতা দেয়। ভাল হিন্দি জানে সে—ঝরঝরে বলার ভঙ্গী। বক্তব্য বিষয়ও খুব স্পষ্ট। মজদুর ভাইবা তন্ময় হইয়া শোনে। কখনও বা সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে।

আশা ভয় ও আনন্দের আলোছায়া খেলিয়া যায় নূতন স্বপ্ন দেখা মনে। বক্তার কথার উচুনীচু সুর বাতাসে কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাহির হইয়া যায়।

অফিসের সামনেই গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া আই-বির লোক দুইটি একটু চঞ্চল হইয়া উঠে। কি যেন সাঙ্ঘাতিক ইঙ্গিত ঐ ওজস্বিনী কথার মধ্যে। মুহূর্তের মধ্যে কি যেন ঘটিয়া যাইতে পারে!

রমেন রায়ের বক্তৃতা শেষ হইয়া যায়।

স্তব্ধ মূক শ্রোতার দল। ইসমাইল উঠে বক্তৃতা দিবার জন্য। সে আরম্ভ করে—

"ভাইসব……

রমেন রায় আর দেরি করিতে পারে না। তাহার একটি জরুরী কাজের কথা মনে পড়িয়া যায়। সে তাড়াতাড়ি চলিয়া যায়।

মিনিট পনের মধ্যেই সভা ভঙ্গ হয়। মজুররা যে যার ঘরে চলিয়া যায়। ইসমাইল আর বিশ্বজিৎ একসঙ্গে বাসে উঠে। ইসমাইল হঠাৎ বিশ্বজিৎকে ইসারা করিয়া দেখায়, রমেন একটা রেস্টুরেন্টে বসিয়া চা খাইতেছে। "এই ওর জরুরী কাজ! সভাটা শেষ হলেই কি আসা চলত না?" ইসমাইল বিরক্তির সুরে বলে।

নাইটস্কুলে কেরাসিনের বাতির সামনে মজুর শিশুরা সমস্বরে পড়ায় ব্যস্ত—ক খ গ ঘ ঙ। একটি ছেলে কিছুতেই "ঙ" উচ্চারণ করিতে পারে না। শুভা তাহাকে লইয়া হয়রান।

বিশ্বজিৎ আরেকটা মাদুরে বসিয়া কয়েকজন ডকমজদুরকে রাশিয়ার

বিপ্লবের ছবির বই দেখাইতেছে। তাহাদের চোখে অজানা কৌতূহল, মনে আশার সুর।

বিশ্বজিৎ বুঝাইয়া যায়।

মাঝে মাঝে সকলেই মাথা নাড়ে—"হ্যাঁ কমরেড।'

ছোট্টঘর। চারিদিকের দেওয়ালের চুনকাম উঠিয়া গিয়াছে সেই কবে। ইট বাহির হইয়া পড়া দেওয়ালগুলির সঙ্গে টিকটিকি আর মাকড়সার সুদৃঢ় মিতালি। টিমটিমে কেরোসিনের আলোতে অন্ধকার কাটে কি কাটেনা। একটা গা ছমছমে ভাব।

বিশ্বজিৎ তাকাইয়া দেখে—শুভার চোখে মুখে একটা দীপ্তি ফুটিয়াছে। সৃষ্টির আনন্দ! চিরবাঞ্ছিত শিশুদের সে গড়িয়া তুলিতেছে—পূর্ণ মানুষ হইয়া উঠিবে তাহারাও। শুভার মনে মমতা ভরা প্রতিজ্ঞা।

নূতন সম্ভাবনাভরা মুহূর্তগুলি।

মজদুররা ঝুঁকিয়া পড়িয়া ছবি দেখে; সম্ভ্রমভরা বিস্ময় চোখে মুখে।

বিশ্বজিতের মন অনেকদূরে চলিয়া যায়।

—নভেম্বর বিপ্লব......রক্তাক্ত রাজপথ......রাশিয়ান ছেলেমেয়েদের অসম্ভবকে সম্ভব করার প্রচেষ্টা! তারপর তাহাদের এই দলিত লাঞ্ছিত দেশেও বিজয়পতাকা উড়িবে—আকাশচুম্বী লাল পতাকা পৎ পৎ করিয়া বাতাসে নড়িবে। আর তাহারই তলায় মুখর হইয়া উঠিবে বিজয়ী জনসমুদ্র, গর্বিত জয় উল্লাসে।

ঘরের বাইরে বাতাসে তাড়ির গন্ধ ভুর ভুর করিতে থাকে। ইউনিয়ান অফিসের সামনেই একটা তাড়িখানা। সন্ধ্যার পর আরম্ভ হয় মাতাল মজুরের হল্লা। উহারা এই লইয়াই ভুলিয়া থাকে নিজেদের ভাগ্যের লাঞ্ছনাকে। মজুর শিশুদের পড়াশেখার ফাঁকে ফাঁকে

মাতলামির চিৎকার কানে আসে। বিশ্বজিতের মন করুণা মিশ্রিত বিরক্তিতে ভরিয়া উঠে।

যেখানে সেখানে বমি করিয়া একাকার করে মাতালগুলি।

মহাদেবও তাড়ি খাইয়া বাড়ী যায় সেদিন রাত্রিতে। মহাদেবের বৌ নালিশ করে বিশ্বজিতের কাছে, "কি মারটাই মেরেছে কালরাত্রিতে। বাড়ী এসেই আমার তলপেটে একলাথি। বলে কিনা, 'বেরিয়ে যা আমার ঘর থেকে।'' মহাদেব লজ্জিত হয়। চোখের ঢুলু ঢুলু ভাব কাটে নাই তখনও।

বিশ্বজিৎ ভর্ৎসনা করে, "তোমার ছেলেপুলে, বৌ আছে, আর তুমি তাড়ি খেয়ে মাতলামি কর মহাদেব!"

মনে মনে ভাবে, 'আর একটু হ'লেই বৌ'টাকে শেষ করতো! ভদ্রঘরের মেয়ে হলে আর বাচতে হ'ত না ঐ লাথির পর।"

দিনদুই শান্তিতে থাকে মহাদেব। আবার একদিন চুপি চুপি তাড়ি খাইয়া ঘরে আসে সে। মুহূর্তেই ধরা পড়িয়া যায়—বমি করিয়া একাকার করে ঘরময়। পরদিন বৌকে কাকুতি মিনতি করে, 'তোর মাথার দিব্যি ;আর আমি তাড়ি খাবনা। তুই বিশ্ববাবুকে বলিস না।"

বৌ কথা দেয়। কিন্তু কয়দিনের মধ্যেই টের পায় তাহার ঘরের লোককে আর ধরিয়া রাখা সহজ নয়, অন্য মেয়ে মানুষের নজর পড়িয়াছে।

বিশ্বজিৎ আর শুভা নাইট-স্কুল হইতে ফিরিতেছে, হঠাৎ বিশ্বজিৎ লক্ষ্য করে, একটা ভাঙ্গা দালানের পাশে গ্যাসপোষ্টটার নীচে একটি মেয়ে মানুষ দাঁড়াইয়া। গ্যাসের বাতির আলোতে মুখটা

পরিষ্কার দেখা যায়—পানদোক্তা খাওয়া ঠোঁটের সরস হাসিতে কামনাতুর লালসা, চোখে বন্য ইসারা।

বিশ্বজিতের শরীর যেন ঘিন ঘিন করিয়া উঠে। মেয়ে লোকটি তাহার সঙ্গে আর একটি ভদ্রমেয়ে দেখিয়া মুহূর্তে যেন দমিয়া যায়। সতৃষ্ণনয়নে তাহাদের দূরে মিলাইয়া যাওয়ার দিকে তাকাইয়া থাকে।

শুভার বুকটা তখনও টিপ টিপ করিতে থাকে।

শিবপূজন খবর পাঠাইয়াছে—তাহার বড়ছেলের ভগবতীর দয়া হইয়াছে। বিশ্বজিৎ ইউনিয়ান অফিসে বসিয়া কয়েকটা রিপোর্ট লিখিতেছিল। কাগজপত্রগুলি গুছাইয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি শিবপূজনের বাড়ী যায় সে। তাহাকে দেখিয়া একটু যেন আশা দেখে শিবপূজন।

ঘরে ঢুকিয়া, ছেলের অবস্থা দেখিয়া বিশ্বজিতের চক্ষু স্থির। মুখটা ফুলিয়া এতবড় হইয়া উঠিয়াছে—বোঝার সাধ্য নাই, উহার ভিতর কোনদিন স্বাভাবিক মানুষের চামড়া ছিল। ঐ একই ঘরে, আরেক দিকে কয়েকটি শিশু শুইয়া আছে। বিশ্বজিৎ মনে মনে প্রমাদ গণে—সর্বনাশ! এরাও ত কেউ নিস্তার পাবে না। বিশ্বজিৎ তাড়াতাড়ি চলিয়া যায়, উহাকে হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে।

'না হ'লে কেউ রক্ষা পাবে না।' মনে মনে ভাবে সে।

হাঁসপাতালে গিয়া দুইদিনও বাঁচেনা শিবপূজনের ছেলে।

খাটিয়ার উপর মাথায় হাত দিয়া বসিয়া থাকে শিবপূজন। ঘরের মধ্যে শোকে মুহ্যমান বৌ ডুকরাইয়া কাঁদে। ছেলেকে বাঁচাইতে পারিল না সে। কত স্বপ্ন কত আশা লইয়া শিবপূজন প্রথম আসে এই কলিকাতা সহরে।

একবছরের শিশু সন্তান লইয়া তাহারা প্রথম ঘর বাঁধে সহরের বুকে। শিশুকে বুকের রক্ত-ঝরা স্নেহ দিয়া বড় করিয়া তোলে

তিল তিল করিয়া। আজ দশবছর পর সে তাহাদের মায়া ছাড়াইয়া চলিয়া গেল কোন অচেনা পথে !

তাহার সেই শৈশবের গ্রামের কথা মনে হয়। কেনই বা সহরে আসিয়াছিল সে—কি এক কুক্ষণে! মুঙ্গের জেলাব সেই লালমাটি ! মমতা ভরা মাটির ঘর। কিন্তু ফেরার পথ নাই সে ঘরে—এতদিনে হয়তো জোতদারের গোয়ালঘর উঠিয়াছে।

* তাহার বাবা জমিদারের ক্ষেতে যোগান খাটিত। ক্ষেতের পাশেই তাহাদের ছোট্ট বাড়ীখানা। মাটির ঘরগুলি তাহার মা লেপিয়া ঝকঝকে করিয়া রাখিত। ঘরের দেওয়ালে 'মেটে-সিন্দুব' আর গেরুয়া মাটি দিয়া ফুল লতাপাতা আঁকা।

দশবছরেব শিবপূজন জমিদারেব গরু মহিষ চরাইয়া বেড়ায আপন মনে। পাহাড়ী লালমাটি আর শিলাস্তূপের মধ্য দিয়া সে চলিয়া যায়—দূরের শালবনে। সেখানে গরু মহিষগুলি মনের খুশিতে চরিয়া খায়। শালের হাওয়ায় পাতা ঝবিয়া পড়ে ছায়ায় ঢাকা লালমাটিব বুকে।

খেলার সঙ্গীদের লইয়া মাঠে মাঠে সারাদিন কাটাইয়া সন্ধ্যায় বাড়ী ফেরে ছোট্ট শিবপূজন। একটু দেরি হইলেই তাহার বাবা চিৎকার করিতে থাকে—"শিবপূজনিয়ারে—"

পাহাড়ী শিলার স্তরে স্তরে সে ডাক কাঁপিয়া আছড়াইয়া পড়ে।

মহুয়াফুলের গন্ধে নাকি বুনোভল্লুক পাগল হইয়া ছোটে। শিব-পূজনের মা—উতলা হইয়া, পথের দিকে তাকাইয়া থাকে।—

মাটির ঘরের পেছনে গম ভুট্টার ছোট্ট একটি ক্ষেত; শিবপূজনের মা নিজের হাতে বেড়া বাঁধে। একটা লাউগাছ লতাইয়া উঠে ঘরের চালে। ক্ষেতের বেড়ার গায়ে শিমগাছটা পাতায় পাতায় ভরিয়া যায়। সপ্তাহে দুইদিন হাট বসে সহরের প্রান্তে। শিবপূজন তরকারি বেচিতে

হাটে যায় মার সঙ্গে। লাউ শিমের ঝাঁকার ভারে তাহার ছোট্ট মাথাটা নুইয়া পড়ে।

হাটের বেচা-কেনা শেষ হইলে পসারীরা যে যার ঘরে ফেরে। ফেরার পথে মুদীদোকান হইতে অড়হর ডাল কিনিয়া নেয় শিবপূজনের মা, ছেলেকে একটু খাট্টা কিনিয়া দেয় শালের পাতায়।

এরই মধ্যে একদিন তেলুয়ার হাটে তরকারি বেচিতে গিয়া ছেলের সম্বন্ধ ঠিক করিয়া আসে শিবপূজনের মা। গণেশ্বরের মা তাহার তিনবছরের নাতনীকে লইয়া হাটে আসে পুঁতির মালা বেচিতে। ফুটফুটে মেয়েটাকে পছন্দ হইয়া যায় তাহার।

এক মাসের মধ্যেই ছেলের বিয়ে দিয়া দেয়। সমস্ত রাত ভরিয়া গাঁয়ের মর্দপুরুষেরা তাড়ি খাইয়া মাদল বাজাইয়া নাচগান করে বিয়ের উৎসবে।...

স্নেহ-মমতায় ভরা সুন্দর সংসার। শিবপূজন বড় হইয়া উঠিয়াছে। সেও বাপের সঙ্গে যোগান খাটে জমিদারের ক্ষেতে। বাড়ীতে ছেলের বৌ মস্ত ঘোমটা দিয়া শাশুড়ীর সঙ্গে জাঁতায় গম ভাঙ্গে। ডাগর হইয়া উঠিয়াছে সেই তিন বছরের মেয়েটা। শিবপূজনও বারে বারে তাকাইয়া দেখে। হাতভরা রংবেরংয়ের কাঁচের চুরী ঝুনঝুন করে জাতা ঘোরানর সঙ্গে সঙ্গে। বেশ লাগে দেখিতে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা ক্ষেতের কাজ শেষ করিয়া, বাড়ী আসিয়া দেখে তাহাদের সাধের ভূট্টাক্ষেত মহিষে শেষ করিয়া গিয়াছে। শিবপূজনের মা মাথায় হাত দিয়া বসে।

পরের দিনও ভরা দুপুরে, কে যেন মহিষ ছাড়িয়া দিয়া যায় ক্ষেতে। শিবপূজনকে ডাকিয়া আনে তাহার মা। তাহার রক্ত গরম হইয়া উঠে। মহিষটাকে টানিয়া আনিয়া ঘরের খুঁটির সঙ্গে বাঁধিয়া রাখে।

বাপ ক্ষেত হইতে আসিয়া চিন্তিত হইয়া উঠে—সর্বনাশ! এ ত জমিদারের তহসিলদারের মহিষ!

সেই মহিষের মামলায়ই আজ শিবপূজনের এই দশা। মামলা চলে বহুদিন। অনুপায় হইয়া শিবপূজনের বাবা ক্ষতিপূরণ দিয়াই আপস করিয়া ফেলে। জোতদারের কাছ হইতে বাড়ী বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার করে। কিন্তু টাকা শোধ দেওয়ার আগেই সে মারা যায়।

তিন বছর কাটিয়া যায়, টাকা আর শোধ হয় না। বাড়ী নিলামে বিক্রয় হইয়া যায়।

শিবপূজন মা, বৌ লইয়া কলিকাতায় আসিয়া ডকে কাজ লয়।

শিবপূজনের বৌ প্রথম বিজুলীর বাতি দেখে। ট্রাম-বাস জনতার কর্মকোলাহলে মুখরিত রাজপথ দেখিয়া গ্রাম্যবধূ অবাক হইয়া উঠে। ঘোমটার ভিতর হইতে বড় বড় বিস্ফারিত চোখে দেখিয়া দেখিয়া আর থৈ পায়না।

বিস্ময় আর আশায় ভরা সংসার পাতে নূতন করিয়া খোলার ঘরে। বছর না ঘুরিতেই সুখের স্বপ্ন ছিড়িয়া যায়—দারিদ্র্যের নিস্পেষণে। তাহার পর এই দীর্ঘ দশ বছর ধরিয়া চলে জীবন আর মৃত্যুর সংগ্রাম।

তবু ত তাহারা অর্দ্ধমৃত ছেলেপুলে লইয়া বাঁচিয়াই ছিল। কিন্তু অদৃষ্টে অতটুকু সুখও সহিল না। হায়রে বিধাতা! অদৃষ্টকে অভিসম্পাৎ দেয় শিবপূজন। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সমাত্র তাহার, এরই মধ্যে দুঃখ আর দরিদ্রতার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া সে ঝিমাইয়া পড়িয়াছে।

বিশ্বজিৎ আসিয়া ডাকে—"কমরেড।" তাহার কণ্ঠে সমবেদনা।

সহানুভূতিভরা কণ্ঠস্বরে শিবপূজনের চোখের পাতা ভিজিয়া উঠে।

শিবপূজনের বৌ শুভাকে দেখিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠে। তাহার মমতাভরা হাতের স্পর্শে সে কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়ে।

তাহার কত আশার প্রথম সন্তান!

ছেলেকে সে ভাল ওষুধ দিতে পারে নাই, সেইজন্যই হয়তো বাঁচিল না সে। ছেলে একটা লেবু খাইতে চাহিয়াছিল অসুখের মধ্যে; কিন্তু কোথা হইতে লেবু জুটাইবে সে। সামান্য একটা কমলালেবুও সে ছেলেকে শেষ সময়ে কিনিয়া দিতে পারে নাই।

শোকে সন্তপ্ত মা বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে থাকে।

—"এত ভাল ছেলে ছিল সে, দিদিমনি, কতদিন উপোস করে থেকেছে; ঘরে চাল নেই, তা'ও কিছু বলেনি। মাবাপের দুঃখ এত বুঝতো সে।"

মাতৃ হৃদয়ের অফুরন্ত স্নেহ আর দারিদ্রের করুণ স্মৃতি!

অঝোরে কাঁদে শিবপূজনের বৌ—।

শুভারও চোখ জলে ভরিয়া উঠে।

শুভা ও বিশ্বজিৎ একই বাসে উঠে। "শিবপূজনের বৌ খুব ভেঙ্গে পড়েছে, না? কেউ যে ওরা টিকে নেবেনা, ঐত মুস্কিল!"

বিশ্বজিতের কণ্ঠে সহানুভূতির সুর বাজিয়া উঠে। শুভা মনে মনে শ্রদ্ধা করে বিশ্বজিতের মনের এই কোমল দিকটাকে। তাহার দাদা একেবারে অন্য ধরণের ছেলে। সে শুনিয়া ঠাট্টা করে, "ওসব বুর্জোয়া রোমান্টিসিজম। খাওয়ার চিন্তা না থাকলে ওরকম কথায় কথায় মন ভিজে ওঠা সহজ।" এসপ্লানেডের মোড়ে রমেন রায়ের সঙ্গে দেখা হয় তাদের।

বিশ্বজিতের কাঁধে হাত দিয়া সে বলে, "ভালই হ'ল দেখা হ'য়ে। চলুন কমরেড—একটু চা টা খাওয়ান।"

শুভা আপত্তি করে, "না, আমার সময় নেই চা খাওয়ার মত। Study circle এ যেতে হ'বে এক্ষণই।"

বিশ্বজিৎ অনুরোধ করে, "চলুন না, কতক্ষণই বা লাগবে। তাছাড়া ক্লান্তও নিশ্চয়। নিজেকে দিয়েই বুঝতে পারছি।"

তিনজনেই কাফেতে ঢোকে।

বিশ্বজিতের নিকট বিদায় লইয়া রাস্তায় নামিতেই রমেনের সঙ্গে তাহার এক বন্ধুর দেখা।

—"কি হে খুব বুঝি চলছে আজকাল কাফেতে।"

রমেন উত্তর দেয়, "কমরেড বিশ্বজিতের ঘাড় ভাঙ্গলাম একটু। তা ওদের পয়সা যখন আছে একটুত Exploit করতেই হয়—কি বল ?"

বিশ্বজিৎ একটু পেছনেই ছিল—তাহারও কানে যায় কথাগুলি।

এক মুহূর্তে তাহার মন বিষাক্ত হইয়া উঠে। এই ধরণের কমরেডদেব সে ঠিক বুঝিয়া উঠে না। সুশ্রী চেহারা রমেনের। গায়ে খদ্দরেব পাঞ্জাবীর উপর জহরলালী কোট। পায়ে মোটা কাবুলীজুতা। কাবুলীটা ঠিক চটিজুতার মত করিয়া পায়ে দেয়। মাথায় তেল নাই, রুক্ষচুল। সর্বদা একটা ব্যস্তভাব চোখে মুখে। সময়ের মুল্য যে খুব বেশী তাহার, তাহারই প্রকাশ প্রতিটি কথায় ও কাজে। নিজের সম্বন্ধে আস্থা খুব বেশী,—অন্যের সম্বন্ধে করুণা। তাহার বিশ্বাস তাহার মত মার্ক্সীজম অন্য কেহ ভাল বোঝেনা। তাহাব মুখে কথায় কথায় তাই অন্যের সম্বন্ধে বিদ্রুপভরা মন্তব্য শোনা যায় 'পেটিবুর্জোয়া', 'বুর্জুয়া' বা 'ফ্যাসিস্ট'।

রমেন তাহার বন্ধুব সঙ্গে জনস্রোতে মিলাইয়া যায়। বিশ্বজিৎ স্তম্ভিত হইয়া তাকাইয়া থাকে তাহাদের দিকে। ব্যথিত হয় সে মনে মনে।

সন্ধ্যার পর ঘরে ঢোকে শুভা। তাহার দাদা বাহির হয় নাই

তখনও। চৌকির উপর শুইয়া বই পড়িতেছে। শুভার হাতে একখানা বই দেখিয়া রমেন রায় জিজ্ঞাসা করে, "কি বই আবিস্কার ক'রে আনলি, দেখি।"

শুভা হাসিয়া বলে, "Ancient History of Art—কুমার স্বামীর। কল্যাণীর কাছ থেকে আনলাম। ও হিস্ট্রিতে অনার্স নিয়েছে কিনা।"

রমেন গম্ভীর হইয়া বলে, "ওসব প'ড়ে কি লাভ—যতসব Fossilised old Past,"

দাদার কথা শুনিয়া শুভার উৎসাহ একটু দমিয়া যায়।

জয়া একদিন বিশ্বজিৎকে বলে, "একদিন আপনার বস্তি দেখাতে নিয়ে যাবেন ?"

"আমার বস্তি মানে!" বিশ্বজিৎ হাসিয়া প্রশ্ন করে।

"অর্থাৎ যা নিয়ে আপনাব দিনেরাতে ঘুম নেই।" জয়া উত্তর দেয়।

"আজই চলনা আপত্তি কি। আজ আমাদের এক ডাক্তার বন্ধুও যাবেন।"

সুব্রত ঠাট্টা করিয়া বলে, "দেখো বোনটিব মাথাটি আর খেয়োনা সাম্যবাদ ঢুকিয়ে। মেয়েবা রান্নাঘরের রাণী হ'যে থাক যুগযুগ ধবে—এটাই আমরা কামনা কবি।"

কযেক মিনিটেব মধ্যেই উহারা বাহির হইয়া যায়।

জয়ার লম্বা বেনীটা দুলিতে থাকে হাটার ছন্দে। খিদিবপুরের বাস। গড়েব মাঠের ধার দিয়া বাস চলে। রৌদ্রস্নাত উন্মুক্ত প্রান্তব।

সামনের সিটে বসে বিশ্বজিৎ। দারুণ 'স্পিডে' বাস চলে। বাতাসে

তাহার চুলগুলি উড়িতে থাকে কপালের উপর। বিশ্বজিতের মনে খুশির সুর—চোখের সামনে কাজের পরিকল্পনা।

জাহাজীদের একটা ছোট বস্তি।

বিশ্বজিৎ তাহার ডাক্তার বন্ধু ও জয়াকে লইয়া বস্তির ভিতরে ঢোকে। পর পর লম্বা লম্বা কয়টা খোলার ঘর—মেঝেগুলি স্যাঁতস্যাঁত করিতেছে। ঘরের মধ্যে না ঢোকে আলো, না বাতাস। উপরে ছাদ ফুটা। আশপাশে নোংরা পচা আবর্জনা।

ঘরের ভিতরে ছোট ছোট একটি মাদুর বা কম্বল বিছাইয়া বহুদিনের পুরান 'তেলসিটে' একজোড়া তাস লইয়া বসিয়াছে জাহাজী মজুরেরা। আরেক দিকে মাছ ধরার জাল বুনাইতেছে বেকাব যাহাবা। আর বৃদ্ধরা চোখ বুজিয়া ঝিমাইতেছে, চোখে তন্দ্রাচ্ছন্ন স্বপ্ন—সুদূর গ্রামে পড়িয়া থাকা স্ত্রীপুত্রকে দেখিবার একটু ক্ষীণ আশা।

জয়ার চোখ বিস্ফারিত হইয়া উঠে ঘরের অবস্থা দেখিয়া। বিশ্বজিৎ নিম্নস্বরে জানায় জয়াকে, "ঐ মাদুর বা কম্বলটুকুই এদেব মাসের পব মাস কাটানুর একমাত্র বাসস্থান। আর বৃষ্টি হ'লে যা অবস্থা হয়, তা' আর মুখে বলবার সাধ্য নেই। ভাঙ্গা নরদমা থেকে সবসময়ই একটা পচা দুর্গন্ধ বেড়িয়ে আসে ঘরে। এইটুকু সময়েই আমরা হাঁপিয়ে উঠি, আর ওরা বছরের পর বছর কাটায় ওরই মধ্যে।"

লোকগুলি বড় বড় চোখে জয়াকে দেখিতে থাকে। পেটের ক্ষুধাব নোটিশ-বোর্ড টাঙান লোকগুলির চোখের তারায়। জয়া যেন সঙ্কুচিত হইয়া উঠে—তাহাদেরই সভ্য জগতের এত কাছে এত বড় জঘন্যতা! তাহার মনে হইতে থাকে সে যেন কোন এক আলাদা জগতে আসিয়া পড়িয়াছে।

সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া উহারা পাশের একটা অন্ধকার গলিতে ঢোকে। গলির ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে একটা অস্পষ্ট গালাগালি কানে আসে, "ফিন আইয়ে শালা।"

জয়া জিজ্ঞাসু নেত্রে বিশ্বজিতের দিকে তাকায়। বিশ্বজিৎ জয়ার মনের অবস্থা বুঝিয়া বলে, "ও হ'চ্ছে লাথিওয়ালা, ঐ যে দেখে এলে একটা ঘরে পঞ্চাশ ষাটজন মজুর বাস ক'রছে ঐ ঘরের মালিক ও। ঐ বাসস্থানের জন্ত ওদের এই লাথিওয়ালার অকথ্য দুর্ব্যবহার সইতে হয় দিনের পর দিন। আর আমাদের উপরও যে সন্তুষ্ট নয়, তা'ত দেখতেই পাচ্ছ।"

সরু গলিটার বা দিকে কয়েকঘর জাহাজী মজুর পরিবার লইয়া বাস করে। তাহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল।

করিমদ্দি তাহাদের দেখিয়া বাহির হইয়া আসে। "সেলাম বাবু।"

বিশ্বজিৎ প্রতি নমস্কার জানায়।

জয়াকে তাহার বাড়ীতে রাখিয়া সে ডাক্তার সেনকে লইয়া বাহির হয় কয়েকজন রোগী দেখিতে। করিমদ্দি জয়াকে ভিতরে লইয়া যায়।

উঠানের উপর কয়েকজন আধবয়সী মেয়েমানুষ গল্প করিতেছিল, তাহাদের সকাল-সন্ধ্যার সুখদুঃখের গল্প। জয়াকে দেখিয়া সকলে বড় বড় করিয়া তাকায় জিজ্ঞাসুনেত্রে।

একজন অবাক হইয়া প্রশ্ন করে ফিস ফিস করিয়া, "কিজন্য এসেছে?" তাহাদেরই একজন উত্তর দেয়, "আরে কর্পোরেসনের মেয়ে নিশ্চয়!"

অল্পক্ষণের মধ্যেই আলাপ জমাইয়া লয় জয়া। একজন প্রশ্ন করে, "বিয়ে হয় নাই?"

মোটা মেয়েমানুষটি অবাক হইয়া বলে, "এত বড় ডাগর মেয়ের বিয়ে হয় নাই! এতদিনে যে খোকা আসতো কোলে।"

জয়া লজ্জায় লাল হইয়া উঠে।

করিমদ্দির বৌ তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলে, "লেখাপড়া করছেন যে, এনরা কি আর আমাদের মত মুখ্যু মানুষ ?"

"তা' আমাদেরও একটু লেখাপড়া শেখান না। আমরা মুখ্যুমানুষ কিছু জানলামওনা শিখলামওনা", একটি বৌ অনুরোধের সুরে বলে।

কথাটা শুনিয়া জয়ার মন করুণ হইয়া উঠে, কি উত্তর দিবে সে ?

করিমদ্দির বৌ জয়াকে তাহার ঘরে লইয়া যায়। ঘরের মধ্যে গিয়া জয়ার যেন দম বন্ধ হইয়া আসে মুরগি ও ছাগলের গন্ধে। একই ঘরে মুরগি ও মানুষের বাস !

অদূরে উঠানের কোনায় একটা ছাইয়ের স্তূপের উপর বসিয়া কতকগুলি রুগ্ন, নগ্ন শিশু আপন মনে খেলিতেছে। জয়া অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখে তাহাদের হাড় বাহির করা, পেট ফোলা দেহের করুণ বিভৎসতা।

বাসে উঠিয়া জয়া স্তব্ধ হইয়া থাকে, চোখের সামনে ফুটিয়া উঠে, বস্তির মেয়েদের অজ্ঞতার ছায়ায় ঢাকা চোখের করুণ জিজ্ঞাসা—আমাদেরও একটু লেখাপড়া শেখান না। চৌরঙ্গীর উপর দিয়া বাস চলে। অফিসফেরতা ভদ্রলোদের বারে বারে উঠানামা। রাস্তার ধারে মস্ত মস্ত বাড়ী। তিনতলায় জানালার 'ধানী' বংয়ের পর্দাব ফাঁক দিয়া ঘূর্ণায়মান বৈদ্যুতিক পাখাটা দেখা যায় একটু।

জয়া মনে মনে কল্পনা করে, ঐ পাখার তলায় 'স্প্রিংয়ের সোফায়' বসিয়া কোনও ধনীব দুহিতা হয়তো এখন সান্ধ্য মজলিস ভাল জমাইয়া তুলিয়াছে—চোখে তাহার মদির স্বপ্ন, হাতে কফির পেয়ালা। ঐ আকাশচুম্বী অট্টালিকার তলার মাটিটায় এত দুঃখ, এত অত্যাচার জমিয়া আছে সে খবর উহারা রাখে কি ?

জয়া নিজেও কি জানিত সে খবর ?

তাহার ফিলসফি সাইকলজির ক্লাসের পড়া মুখস্ত করার ফাঁকে, কোন দিন কি সে ভাবিয়া দেখিয়াছে এই মাটির মানুষের মনের কথা ? জয়ার ভাবপ্রবন মন সজল হইয়া কোন দূরদেশে চলিয়া যায়—বস্তি ঘরের মায়েরা তাহাদের বুভুক্ষু সন্তানদের ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে, হৃদয়হীন কারখানার বিরাট চাকার ছবি দেখিয়া, শিহরিয়া উঠে যুগ যুগ ধরিয়া ; তাহাদের বুক ভাঙ্গা নিশ্বাসগুলি শুধু বাতাসে মিলাইয়া যায়। কেহ তাহার খোঁজও রাখে না।

তাহাদের শিশু সন্তানরা বড় হইয়া ঐ মেসিনের সঙ্গেই জুড়িয়া দিবে তাহাদের দেহ। তারপর মেশিনের চাকায় দেহের সবটুকু রক্ত ক্ষয় করিয়া ঘরে ফিরিবার পথ ধরিবে যেদিন, সেদিন তাদের সঙ্গের শেষ সম্বল থাকিবে শুধু শূন্য থলি আর ভগ্নস্বাস্থ্য।

গড়ের মাঠের ধার দিয়া বসে চলে। আলোর বন্যা মাঠের বুকে।

জয়া ভাবে, পৃথিবীতে এত আলো, এত বাতাস, আর সেই আলো-বাতাসের সঙ্গে মুখামুখি পরিচয়ও হয় না কত অসংখ্য লোকের।

এসপ্ল্যানেডে নামিয়া পড়ে বিশ্বজিৎ। "চলো এটুকু হেটেই যাই।"

ডাক্তার সেন বিদায় নেয় মোড় হইতেই।

"আচ্ছা, নমস্কার কমরেড। আবারও ত যাচ্ছেন নিশ্চয় ঐদিকে ; দেখা হবে।"

জয়া সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে।

"কমরেড" কথাটায় একটা রহস্যময় দোলা দেয় মনে।

বিশ্বজিৎও খুশি হইয়া ভাবে জয়াও যদি তাহাদের সঙ্গে কাজে নামে ! নাইটস্কুলে পড়াইতে পারিবে সে। একটু কল্পনা করিয়া ভাবিয়াও দেখে সে একমুহূর্তে। 'বেশ হয় তাহলে', মনে মনে ভাবে।

রাস্তায় চলিতে চলিতে বিশ্বজিৎ বলে, "কি একেবারে চুপ হয়ে গেলে যে?"

জয়া স্মিত হাসি হাসে একটু।

বিশ্বজিৎ ভাবে, বড় নরম মন।

চিত্তরঞ্জন এ্যভিনিউ দিয়া হাটিতে থাকে তাহারা। বিশ্বজিৎ জয়াকে অনুরোধ করে, "চলো আমার ঘর দেখে যাও—ঐত জানালা দেখা যাচ্ছে।"

দুইজনে উপরে উঠিয়া আসে।

জয়া ঘরে ঢুকিয়া অবাক হয়, "এই নাকি ঘরের নমুনা! উঃ কি অগোছাল বাপরে। খাতাপত্র, বই, কাপড়, তোয়ালে, পেয়ালা পিরিচ সব একাকার। এর মধ্যে ঘুম আসে আপনার?"

"ব্যতিক্রম ত হয়নি কোনদিন।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই যাইবার জন্য ব্যস্ত হয় জয়া। "দাদা হয়তো ভাববে।"

বিশ্বজিৎ উত্তর দেয়, "দাদা জানেন, এমন লোকের সঙ্গে তার বোনকে দিয়েছে, যেখান থেকে তাকে আর বাঘে খেয়ে ফেলতে পারবে না। বোস একটু, আমার বাড়ী এই প্রথম এলে, মিষ্টিমুখ না করিয়ে দেওয়া যায় নাকি? ভাবো বুঝি, কমরেডদের ভদ্রতারও বালাই নেই?"

জয়া পরাস্ত হইয়া বসিয়া পড়ে। তাহার মনে অজস্র প্রশ্ন উকি মারিতে থাকে—উহারা কি কাজ করে বস্তির মধ্যে? উহাদের মতবাদ কি? কর্মপন্থাই বা কি?

নিজের অজ্ঞতায় নিজেই লজ্জিত হয় মনে মনে। সলজ্জভাবে সে বিশ্বজিৎকে বলে, "কমিউনিজম সম্বন্ধে আমাকে বোঝাবেন

একদিন। অবশ্য যদি আপনার কাজের ক্ষতি না হয় এজন্য সময় নষ্ট করে।"

বিশ্বজিৎ হাসিয়া বলে, "ক্ষতি হলেও ত বোঝাব; নূতন একজন কমরেড পাওয়ার মূল্য আমাদের কাছে কম নয়।"

সে তাহার বইয়ের তাক হইতে একটা বই বাহির করিয়া জয়াকে দেয়। "আপাততঃ এই বইটা পড়ো। পড়ে যা যা নূতন প্রশ্ন মনে আসে সেগুলো আমাকে ব'লো, আমি বুঝিয়ে দেবো।"

এরই মধ্যে বিপিন চা আর খাবার লইয়া আসে। জয়া একটু লজ্জিত হইয়া মৃদু আপত্তি জানায়। বিশ্বজিৎ খাবারের ঠোঙ্গাটা ঠেলিয়া দিয়া বলে, "না খেলে চলবেনা—তাহ'লে আমিও খাচ্ছি না।"

বিপিন স্নেহার্ত অভিযোগ জানায়, "দেখুন দিদিমনি, আজ সারাদিন ভাত না খেয়েই ঘুরছেন। সেই সকালে চা খেয়ে বেরিয়েছেন আর এই আসা হল।"

বিশ্ববাবুর প্রতি বিপিনের দরদ খুব বেশী। একবার খুব জ্বরে পড়ে বিপিন। বিশ্ববাবুই তাহাকে সেবা যত্ন করিয়া ডাক্তার দেখাইয়া ভাল করে। সেই হইতে তাহার কৃতজ্ঞতা স্নেহে পরিণত হয়।

জয়া অবাক হয় বিপিনের কথা শুনিয়া। ঘ্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠে, "কি আশ্চর্য, আমাদের বাড়ীতেও খেয়ে নিলে পারতেন। এ ভাবে না খেয়ে শরীর নষ্ট করলে কাজ করবেন কি করে?"

বিপিন, সায় দেয়, "একদিনও, দিদিমনি, সময় মত খাবেন না কেউ। রোদে রোদে ঘুরে দেড়টা দুটোর সময় কোনমতে চারটি খেয়েই আবার বের হওয়া চাই।"

জয়া একটু শাসনের সুরে বলে, "আমাকে কথা দিতে হবে সময়মত খাবেন, না হলে এর কিছুই মুখে দেবোনা।"

বিশ্বজিৎ হাসিয়া বলে, "উঃ কি উল্টোজব্দ। আচ্ছা দয়া করে চাটুকু আর সরবৎ ক'রোনা, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। মেয়েরা চিরদিনই জয়ী।"

কেন জানি শেষের কথাটি শুনিয়া জয়া একটু আরক্তিম হইয়া উঠে।

কি মনে করিয়া সে হঠাৎ প্রশ্ন করে, "আচ্ছা আপনার মা বাবা আছেন না? কয় ভাইবোন আপনারা?

এক মুহূর্তে বিশ্বজিতের মুখখানা ম্লান হইয়া যায়। মনে মনে ভাবে সে—সুব্রতদার কাছে জয়া কি শোনে নাই তাহার জীবনের এই পরিহাসের কথা। বাবা, ভাইবোন, দিদি সবই আছে তাহার কিন্তু জন্মের মত তাহাদের পরিচয় হইতে বিচ্ছিন্ন সে। সকলেই জানে, লক্ষ্মীপুর জমিদারের এক ছেলে সে। কিন্তু জয়াকে সে কি বলিবে? তাহাকেও কি আর সকলের মতই আত্মপরিচয় হইতে বঞ্চিত রাখিবে? বিশ্বজিৎ চুপ হইয়া যায়।

একটু মৌন থাকিয়া বলে, "আর একদিন শুনো জয়া, আজ থাক।" তাহার চোখের ম্লানছায়া লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হয় জয়া।

গভীর রাতে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় বিশ্বজিতের। তন্দ্রাভিভূত মন। খোলা জানলা দিয়া তাকাইয়া থাকে বিশ্বজিৎ। স্তিমিত রাত্রির তারাহীন আকাশ। নিদ্রাবিভোর রাজধানী। অন্ধকারের ভিতর হইতে এক জোড়া অনিমেশ চোখের ছবি ভাসিয়া উঠে। উজ্জ্বল অচঞ্চল দৃষ্টি।

বুকের মধ্যে এক আলোড়ন। যুঁইফুলের মৃদু গন্ধের মত ধীরে ধীরে ঝরে পঞ্চশরের শব্দহীন মৃদু টংকার।

বিশ্বজিৎ অনুভব করে, এক অস্পষ্ট নূতন জীবের আবির্ভাব; অশরীরী ব্যথায় বুকটা ভারী হইয়া উঠে।

বিশ্বজিৎ শুইয়া শুইয়া ভাবে দিনের টুকরা টুকরা ঘটনা। আবেশ ভরা মধুর স্মৃতি।

আবার ভোর হয়। দিনের আলোর প্রথম স্পর্শে ঘুমন্ত পৃথিবীটা নড়িয়া চড়িয়া উঠে কর্মের নাড়ীর প্রাণশক্তিতে। তন্দ্রালস চোখে বিশ্বজিৎ উঠিয়া পড়ে। রাত্রিজাগার অবসাদ। একটু লজ্জিত হয় সে মনে মনে। কি বিরাট পরিবর্তন আনিয়া দিয়াছে তাহার কুমারী মনে।

অদ্ভুত মেয়ে জয়া। কোন সূত্রেই তাহার মনের সন্ধান পাওয়া যায় না। কোমল সহানুভূতিভরা ব্যবহার, সূক্ষ্ম খুটিনাটি সবকিছুতেই সস্নেহ সজাগ দৃষ্টি। কিন্তু এ আন্তরিকতার আড়ালে আর কোন কারণ আছে কি? না শুধু নারীসুলভ পরিচর্যা মাত্র।

বিশ্বজিৎ ঝাড়িয়া ফেলিতে চায় এ কীট। বিপ্লবী মনে বৃথাই এ ভ্রূণ সৃষ্টি।

কাজের মধ্যে ডুবাইয়া দেয় সে নিজেকে। ইউনিয়ন অফিসে গিয়া একটা দরখাস্ত লেখে সে লেবার ট্রাইবুন্যালের কাছে। জাহাজীদের ঘরের অবস্থা এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে একটা ভাল রকম তদন্ত না করিলে আর নয়।

অর্দ্ধেকের উপর জাহাজীদের অসুখ, নিমুনিয়াই বেশি। ডাক্তার সেন বলিয়া দিয়াছেন, "মিছিমিছি আর রোগী দেখে কি করবো—যদি ব্যবস্থাই না হয় কিছু প্রেস্‌ক্রিপসন্ মত।"

এদিকে লাথিওয়ালার আক্রোশ বাড়িয়া গিয়াছে। "অন্যের ব্যাপারে উহাদের মাথাব্যথা কেন এত?"

ডাক্তার সেনকে লইয়া রিপোর্ট লিখিয়া ফিরিতেছে ইসমাইল ও বিশ্বজিৎ। সন্ধ্যার আগেই শেষ করা চাই। সন্ধ্যার পর আবার ম্যাজিকলণ্ঠনের ব্যবস্থা আছে ইউনিয়ন অফিসে।

সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়। অন্ধকার ঘুপসি গলি। হঠাৎ কোথা হইতে একটা বড় ইট আসিয়া বিশ্বজিতের কপালে লাগে। কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতে থাকে। রুমাল দিয়া কপালটা চাপিরা ধরে সে। মুহূর্তের মধ্যেই অবস্থাটা বুঝিয়া লয় তাহারা।

কয়েকজন গুণ্ডা আগে হইতেই ঠিক করা ছিল। তাহারা গলিব মুখটা আটকাইয়া ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন জাহাজীও বাহিব হইয়া আসে।

মারামারি লাগিয়া যায় প্রায়। ইসমাইল আগাইয়া আসিয়া থামাইয়া দেয়। করিমদ্দি তাহার ঘরে লইয়া যায় বিশ্বজিৎকে। ডাক্তার সেন ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দেয়।

আর একটা সরু গলি দিয়া তাহাদের বড় রাস্তায় পৌঁছাইয়া দেয় জাহাজীরা। "এর একটা হেস্তনেস্ত আমরা করবই। ও শালাকে খুন করে ফেলবো।"

বিশ্বজিৎ বলে, "এ ভাবে খুনোখুনি করে তো কোনও লাভ হবে না। সবাই যদি একজোট হ'তে পার, তবেই এর প্রতিশোধ নিতে পারবে একমাত্র।"

ইসমাইল ইউনিয়ন অফিসে চলিয়া যায়। বিশ্বজিৎ তাহাকে ডাকিয়া বলিয়া দেয়, "Arbitration boardএ রিপোর্টটা পাঠিয়ে তদারক করা হয় যেন; আমি ত আর যেতে পারলাম না আজ।" ডাক্তার সেন বিশ্বজিৎকে তাহার বাড়ী লইয়া যায়। "চলুন একটু ওষুধ্ দিয়ে দি। সেপ্‌টিক্ টেপ্‌টিক্ হ'য়ে গেলে মুস্কিল হবে।"

ডাক্তার সেনের বৌ সব শুনিয়া ঘাবড়াইয়া যায়, "সর্বনাশ! প্রাণ নিয়ে যে ফিরে এসেছ তোমরা, এই তোমার সাত পুরুষের ভাগ্যি।"

ডাক্তার হাসিয়া বলে, "যমের হাত থেকে বাঁচতে তোমার ভাগ্যই

যথেষ্ট—তার জোরেই বাঁচবো আরও বহুদিন—সাত পুরুষের ভাগ্যির আর দরকার হবে না।"

যাবার সময় বিশ্বজিৎকে বলিয়া দেয় ডাক্তার, "দুটো দিন একটু সাবধানে থাকা ভাল। আর ওদেরও বলে দেবেন কাল যেন বস্তিতে একটু সতর্ক হয়ে যায়। যা ক্ষেপে আছে মনে হ'চ্ছে।"

ইউনিভারসিটিতে মেয়েদের কমন রুমে মস্ত টেবিলটার উপর পা ঝুলাইয়া বসে শান্তা, কোলের উপর খোলা সাপ্তাহিক একটা। চারপাশে ঘিরিয়া আছে 'ফিপ্‌ত-ইয়ারের' সাত আটটি মেয়ে। শান্তা বুঝাইয়া যায়, 'পলিটিক্স শুধু ছেলেদের একচেটিয়া নয়, মেয়েদেরও পূর্ণ অধিকাব আছে রাজনীতিতে।'

বেয়ারা আসিয়া ঘুরিয়া যায় একবার, দুয়ার বন্ধ করিবার তাগিদে। ছুটি হইয়া গিয়াছে অনেকক্ষণ, ছাত্র ছাত্রীরা চলিয়া গিয়াছে সবাই। থম থম করে প্রকাণ্ড করিডোরগুলি।

লাল সন্ধ্যা। সূর্য ডুবিয়া গিয়াছে। কাচের জানলা দিয়া মেঘ-ভাঙ্গা আকাশের কালি দেখা যায়। দূরের আকাশের দিকে তাকাইয়া আছে 'সংস্কৃত ক্লাসের' মেয়েটি। ভাল লাগিতেছে না তাহার শান্তার কথাগুলি। শান্তার স্পষ্ট কাটা কাটা কথার ফাঁকে ফাঁকে, ফিলসফি ক্লাসের ছেলেটির ভেজা ভেজা নরম কথাগুলি উঁকি মারিয়া যায়। থাকিয়া থাকিয়া লাইব্রেরী হইতে নামিয়া আসা ছাত্রদের জুতার একটানা শব্দ কানে আসে।

এদিকে স্পষ্টভাষী মেয়েটি অনর্গল বলিয়া চলিয়াছে। 'সংস্কৃত'র

মেয়েটি একটু মন দিয়া শোনে—সে বলিতেছে ভীরুর পত্নী হওয়ার চাইতে বীরের বিধবা হওয়া শ্রেয়। এ কার উক্তি? কি যেন একটা বিদেশী নাম বলিয়া যায় মেয়েটি। ইংরাজী ক্লাসের নমিতা অভিভূত হয় কথাটা শুনিয়া। "চমৎকার কথাগুলি!"

বেয়ারা আসিয়া দ্বিতীয়বার তাগিদ দিয়া যায়। শান্তা সেইদিনের মত ক্ষান্ত হয়। "আবার আসছে শুক্রবার আমরা মিট করব এই ঘরেই।"

দুই তিনটী মেয়ে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। মনে মনে ভাবে, 'বাবাঃ রেহাই পাওয়া গেল।'

নমিতার শ্রদ্ধা ঝরা মনে নাড়া দেয় শান্তার কথাগুলি। মনে মনে বারে বারে উচ্চারণ করে সে—লা পাসিওনারিয়া। লা পাসিওনারিয়া।

শান্তা বাড়ী ফেরে। ঘরে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে রমাপতি। শান্তাকে চায় সে তাহাদের দলে। তাহাদের দলে future আছে, prospect আছে। আর এখানে দিনরাত ঐ কুলি মজুরের সঙ্গে থাকিয়া কি উন্নতি করিতে পারিবে সে রাজনৈতিক জীবনে?

তুমুল তর্ক লাগিয়া যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তর্ক করে দুইজনে। তবু পরাস্ত করিতে পারে না শান্তাকে।

'লাষ্ট বাস্' ধরার জন্য রমাপতি উঠিয়া পড়ে। যাইবার আগে আবারও স্মরণ করাইয়া দিয়া যায়, তাহার প্রতিভাকে সে যেন এভাবে পাগলামি করিয়া মাটি না করে।

শান্তা আবার কাগজপত্র লইয়া বসে। 'ফুলকির' জন্য অনেক লেখা আসিয়া জমিয়া আছে, সেগুলি দেখিতে হইবে। দিনে মুহূর্ত সময় পায় না। কাজে অকাজে লোক আসে অনবরত। নীচের তলার বৌটি পর্দা ফাঁক করিয়া দেখে একটু, কাহারা এত ঘন ঘন আসে যায় উপর তলার ঐ অবিবাহিত মেয়েটির কাছে?

দুয়ারের কড়া নড়ে ঘণ্টায় ঘণ্টায়। "শান্তাদি বাড়ী আছে? কোথায় গেছে শান্তা? কখন আসবে কমরেড শান্তা?" প্রশ্নের পর প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে বিরক্ত হইয়া উঠেন রন্ধনরতা শান্তার মা।

"মেয়ে আমার বাড়ীতে থাকে কখন? তবু লোক আসার বিরাম নেই।"

যেটুকু সময় বাড়ীতে থাকে শান্তা, লোকে ভরতি হইয়া থাকে ঘরটুকু। এদিকে স্কুলের ত্রৈমাসিক পরীক্ষার খাতা দেখা বাকি এখনও। কড়া হেডমিস্ট্রেস; একদিনও Lesson-notes না লইয়া যাওয়ার উপায় নাই। কাজে ঠাসা মিনিটগুলি। তবু কাজে ক্লান্ত হয় না সে। কাজ না থাকিলে বোকা বোকা লাগে দিনগুলি।

শান্তা দুয়ারটা বন্ধ করিয়া দেয়—আজকের মত নিশ্চিন্ত।

শান্তার মা মাঝে মাঝে বোঝান, "এবার বিয়ে থা' কর, শান্তা। তোর নিজের পছন্দমতই কর। এভাবে আর কতকাল থাকবি! আমিও একটু নিশ্চিন্ত হ'তে পারি।"

কিন্তু শান্তা পছন্দ করিবে কাহাকে? রথীন্দ্র, রমাপতি, না শেখর?

রথীন্দ্র বড় বেশী কাব্য ঘেষা, কবিতা লইয়া বিভোর। শান্তার চোখদুইটিকে সুন্দর দেখে রথী। তাহার হাটাচলার সাবলীল ভঙ্গিটুকুও নাকি ভাল লাগে রথীন্দ্রের। কিন্তু অনুপায় শান্তা।

রমাপতির সঙ্গে রাজনীতির মূলসূত্রেই মিল হয় না তাহার, কি করিয়া মিল হইতে পারে ব্যক্তিগত জীবনে। রমাপতি ভালবাসে শান্তার প্রগতি-মুখী মনকে, কিন্তু শান্তা পছন্দ করে না রমাপতির মতের গোঁড়ামিকে। তারপর শেখর। শেখরকে ভাল লাগে তাহার। কিন্তু সে ভাললাগাটুকু অক্ষয় রাখিতে চায় সে বন্ধুত্বের বন্ধনে। বিবাহের পক্ষে একমাত্র ভাল-লাগাটুকুই যথেষ্ট নয়। শেখর তাহা বুঝিতে চায়না।

শেখর যখন তখন আসিয়া লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলে শান্তার খাতপত্র। একটা টানিতে আরেকটা বাহির করে। শান্তার পরিপাটি বিছানাটার উপর শুইয়া পড়ে পত্রিকাটা লইয়া।

শান্তা আসিয়া টানিয়া উঠায়, "অত নবাবী চলবে না; আমার সব কাগজ পত্র গুছিয়ে দিয়ে যেতে হবে।" শান্তা শাসনের সুরে বলে, "চব্বিশ ঘণ্টা এখানে যে পড়ে থাক, কাজকর্ম নেই?"

"কেন প'ড়ে থাকি, তুমি বোঝ না শান্তা?"

শান্তা তাহার সার্টের উল্টানো 'কলার'টা ঠিক করিতে করিতে বলে, "অত বোকামী করেনা শেখর।"

শেখর চায় শান্তাকে।

শান্তার মাও স্নেহ করেন ছেলেটিকে। বাড়ীর ছেলের মত হইয়া গিয়াছে সে। কিন্তু ঐ একরোখা মেয়েকে কিছুতেই রাজী করাইতে পারেন না।

ইসমাইলদের ঘরে পাঠচক্র আরম্ভ হয়।

দশবারোটি ছাত্র মাদুরের উপর আসিয়া বসে। শান্তাও আসে; তাহার সঙ্গে নূতন একটি মেয়ে। মনে হয় কোনও অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে। সাজসজ্জায় ধনীর দুহিতারই সুস্পষ্ট ছাপ। তাহার চোখের ভাবে একটা ঔৎসুক্যের সারল্য। ছাত্রদের মধ্যে অগ্নিময় চাঞ্চল্য। বিশ্বজিতের ঘরের দুয়ার ভেজানো। সে শুইয়া শুইয়া পত্রিকাটা দেখিতেছে, মাথায় পটি বাঁধা।

আজকের পাঠচক্রে অমলেন্দু বক্তা। তাহার তেজস্কর কণ্ঠস্বর মানুষের হালকা মনের মোলায়েম স্বপ্নগুলিকে যেন ছিঁড়িয়া কুটি কুটি করিয়া ফেলে। নূতন ভবিষ্যতের ইঙ্গিতভরা কণ্ঠস্বর।

অমলেন্দু বুঝাইয়া যায়—শ্রেণীবিহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজই আমাদের লক্ষ্য। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরের রাশিয়ান বিপ্লব মানব ইতিহাসে একটা নূতন অধ্যায় এনে দিয়েছে। শ্রেণীবিহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টিই এর মূল উদ্দেশ্য।

এক শ্রেণীর মানুষ যে আরেক শ্রেণীর মানুষকে নিয়তই তাদের ন্যায্য অধিকার হ'তে বঞ্চিত ক'রে চলেছে তা' সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পাবে···

আরেকটি ছাত্র ঘরে ঢোকে। একমুহূর্তে ঘরের চারদিকে একটু চোখ বুলাইয়া মাতুরের উপর বসে সে। পোষ্টগ্রাজুয়েট ছাত্র। এইমাত্র অধ্যাপক বিনয় সরকারের ক্লাস শেষ হইয়াছে। হাতঘড়িটা একটু উল্টাইয়া দেখে সে, দশমিনিট দেরি হইয়া গিয়াছে। অমলেন্দু বলিয়া যায়ঃ সমাজের ক্রমবিকাশের দিনে ক্যাপিটাল দেশগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে প্রথমেই দুইটি বিপরীত শ্রেণীর পর্বতপ্রমাণ পার্থক্য চোখে পড়ে। একদিকে ধনিক সম্প্রদায়ের রম্য প্রাসাদ, মনোরম বিটপী ছায়ায় ঢাকা সুন্দর রাজপথ, আমোদ প্রমোদের জন্য সুরম্য ময়দান; আরেকদিকে নোংরা স্যাংস্তেতে বস্তির অন্ধকার গলি, আলোবাতাসহীন জীর্ণ বাসস্থান, যার নিরানন্দ আবহাওয়ার মাঝে দিনের পর দিন কাটায় মজুরশ্রেণী। এই ক্যাপিটাল যুগে, সমাজ দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধাত্মক শ্রেণীতে বিভক্ত।

নূতন আসা মেয়েটি একটু তাকাইয়া দেখে, নিরব শ্রোতাদের বিপ্লবের বীজ গর্ভ উদ্দীপনা তরুণ মনে।

আকাশভরা বিরাট কালোমেঘের আড়ালে যে রুদ্রমূর্ত্তি, তাহারই আগমন প্রতিক্ষায় যেন স্তব্ধমুহূর্ত্তগুলি। বক্তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যেন অগ্নিবীজ ঝরে। তাহার ধমনীতে যে ধনীর রক্তের প্রাণশক্তি লুকান, তাহারই প্রতি হিংস্রঘৃণা ঐ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাভরা কণ্ঠস্বরে। বক্তা এখনও থামে নাই—হয়তো তাহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সে থামিবে না। মেয়েটি ভয়ে ভয়ে শোনে: 'বুর্জ্জোয়া শ্রেণী সমস্ত অর্থ সমস্ত শক্তি নিজের মুঠির মধ্যে ধরে রেখেছে। সমস্ত কলকারখানা, খনি, জমি, ব্যাঙ্ক, রেলপথ, সবকিছুরই মালিক এরা। এরাই শাসকশ্রেণী। আর অন্যদিকে সর্বহারাদের একমাত্র সম্বল দরিদ্রতা। সর্বহারা ও বুর্জ্জোয়ার মধ্যে এই বিরাট পার্থক্য ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। আর এই পর্বতপ্রমাণ পার্থক্যই মজুরশ্রেণীকে নিজেদের শক্তি ও সামর্থ সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তাদের সংঘর্ষের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে।'

ইকনমিক্সের ছাত্রটি প্রশ্ন করে: "সর্বহারা বিপ্লবে মধ্যবিত্তের স্থান কোথায়?"

অন্য ছাত্রদের চোখেও ঔৎসুক্য ভরা জিজ্ঞাসা।

বক্তা উত্তর দেয়, "মধ্যবিত্তদের স্থান সর্বহারার মাঝেই। আলাদা ক'রে নয়। সর্বহারা শ্রেণীই যে ভবিষ্যতের স্রষ্টা—এই সচেতনতাই তাদের যথার্থ বিপ্লবী ক'রে তোলে, আর তখনই তারা শ্রেণীচ্যুত হ'য়ে সর্বহারাদের সঙ্গেই মিশে যায়।"

পাঠচক্র শেষ হইয়া গেলে শান্তা নমিতার কানে ফিস ফিস করিয়া বলে, "আমাদের একজন ছাত্র নেতা।"

ছাত্ররা সবাই নীচে নামিয়া যায়। সিঁড়ির উপর একসঙ্গে অনেকগুলি জুতার শব্দ আস্তে আস্তে নিস্তব্ধতায় মিলাইয়া যায়। শান্তা নমিতাকে লইয়া বিশ্বজিতের ঘরে ঢোকে।

"শুভার কাছে শুনলাম তোমার মাথা ফাটানর কথা। কি রকম আছে ঘা টা ?"

নমিতা অবাক হইয়া ভাবে, 'এদেরও মাথা ফাটানর লোক আছে পৃথিবীতে !'

নমিতার বাবা গুরুনাথ মুখার্জ্জী ইংরাজীর অধ্যাপক ছিলেন বাংলার বাইরে। বর্তমানে তিনি আইন পরিষদের সভ্য। দক্ষিণ কলিকাতায় তাহার বিরাট বাড়ী। ঐ একটি মাত্র সন্তান নমিতা। মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতেছে। পিতাপুত্রিতে অনেক রাত পর্যন্ত সেকস্‌পিয়ারের আলোচনা চলে।

নমিতার মা সংসার লইয়াই ব্যস্ত। দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়ার পর পত্রিকাটা একটু নাড়াচাড়া করিতে না করিতেই ঘুম আসে চোখে। তারপর বিকালে চায়ের আয়োজন, সান্ধ্য অতিথিদের সম্বর্ধনা, পেনসন প্রাপ্ত স্বামীর পরিচর্যা। তাহার সময় ঘড়ির কাটায় হিসাব করা।আবার অবসরমত মাঝে মাঝে মোটরে করিয়া শাড়ি গহনার দোকান ঘুরিয়া আসেন একটু।

নমিতার বাবা মেয়ের সঙ্গে রাজা লিয়ারের আলোচনা করিতেছেন, এমন সময় ঘরে ঢোকে নমিতার মা। প্রাক্তন অধ্যাপক চশমা খুলিয়া তাকান স্ত্রীর দিকে। "বিজলীর জন্য নূতন চুর গড়িয়েছে দেখলাম— নারকেল ফুল ; আমাদের নমিতার জন্যও গড়ালে হ'ত—"

বাধা দেয় নমিতা, "মা, তোমার যদি একটু রসবোধ থাকতো। বাবা পড়ছেন কিং লিয়ার, আর তুমি এর মধ্যে এনে হাজির করলে সোনার নারকেল ফুল—।" নমিতার মা হাসিয়া বিদায় হন।

তিনজনেই একসঙ্গে খাইতে বসে রাত্রিতে। রাত্রির খাওয়ার পর একটু মদ্যপান করার অভ্যাস নমিতার বাবার।

তাহাতে নমিতার মার কোনও ক্ষোভ নাই। শান্তির ঐশ্বর্যেভরা সোনার সংসার—গর্ব অনুভব করে নমিতার বাবা।

কাব্য ও কল্পনামুখর দিনগুলি সুখেই কাটিতেছিল নমিতার।

একদিন তাহাদের কমনরুমে একটি নূতন মেয়ে আসে– কতকগুলি সাপ্তাহিক বিক্রী করিতে; সামান্য একটু আলাপ পরিচয়ও হয় সকলের সঙ্গে—নমিতাও আলাপ করে শান্তাদির সঙ্গে।

পর পর কয়দিনই আসে সেই মেয়েটি, জেলেও নাকি গিয়াছিল সে। এই অল্প পরিচয়েই ভাল লাগিয়া যায় শান্তাদিকে। সম্ভ্রমভরা মনে কয়েকখানা বই নেয় সে পড়িতে।

"এক সপ্তাহের মধ্যেই ফেরৎ দিয়ে দেবো।"

শান্তা মিষ্টি হাসিয়া বলে, "অত তাড়ার কোনও দরকার নেই, যেদিন খুশি ফেরৎ দিও। আর তার সঙ্গে জানিও কেমন লাগলো বইগুলো।"

নমিতা বাড়ী ফিরিয়া নূতন পাওয়া বইগুলির মধ্যে ডুবিয়া যায়। অদ্ভুত বই সব। এতদিন সে কত বই পড়িয়াছে, সাহিত্য চর্চা আর কাব্য আলোচনা লইয়াই ত তাহার দিন কাটে। কিন্তু এ জাতীয় বইত' সে কোনদিন পড়ে নাই। পড়িতে পড়িতে উত্তেজিত হইয়া উঠে মন; সহস্র প্রশ্নে ভরা বাস্তবের নিখুঁত চিত্র সব।

তাহার মনে নূতন সংশয় দেখা দেয়। সে বাবার সঙ্গে সাহিত্য আলোচনায় বসিয়া আর চুপ করিয়া বিনা দ্বিধায় সব মানিয়া লইতে পারে না।

তাহার বাবা তাহার পড়ার টেবিল হইতে একখানা নূতন উপন্যাস

আবিষ্কার করেন সেইদিন। বইখানা পড়িয়া একটু বিরক্তির সঙ্গেই মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা নমিতা, এসব বাজে বই প'ড়ে সময় নষ্ট কর কেন?"

নমিতা ব্যথিত হয় পিতার কথায়। "বাজে বই বলছো কেন বাবা?"

গম্ভীর ভাবে উত্তর দেন প্রৌঢ় অধ্যাপক, "বড় বেশী রিয়ালিষ্টিক।"

নমিতা মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয়। সে প্রতিবাদ করে। শান্তাদিরই কথার প্রতিধ্বনি, "সাহিত্য কি বাস্তবেরই সক্রিয় ছায়া নয়?

সাহিত্যের অধ্যাপক আপত্তি জানান, "না, শুধু বাস্তবের ফটোগ্রাফী নয় সাহিত্য। সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য রস সৃষ্টি করা। রসার্থে কাব্যম্। দেশকাল অনপেক্ষ এই সাহিত্য রস।"

তর্কে পরাস্ত করিতে পারে না পিতাকে—কিন্তু পিতার যুক্তিও আর নিঃসন্দেহে মানিয়া লইতে পারে না নমিতা। চুপ হইয়া ভাবে সে—'এর উত্তর দিতে পারতো শান্তাদি।'

কয়দিন যাবৎ গুরুনাথ মুখার্জী লক্ষ্য করিতেছেন, মেয়ের পড়ায় আর আগের মত উৎসাহ নাই। বড়বেশি অন্যমনস্ক থাকে সে। মাঝে মাঝে সন্ধ্যার পরও বাড়ী ফেরে। চিন্তিত হয় পিতা মেয়ের লক্ষণ দেখিয়া। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, "শান্তাদির বাড়ী গিয়েছিলাম।" ৫ শান্তাদিটি কে?

পাশের ঘরে টেলীফোন বাজিয়া উঠে—তাহাকেই ডাকিতেছে। জরুরী পার্টি মিটিং—Coalition মন্ত্রীমণ্ডলী No-confidence motion আনিতেছে।

গুরুনাথ মুখার্জী তাড়াতাড়ি পোশাক পরিবর্তন করিয়া লয়। নমিতা বাবার মিটিং-এ যাইবার পোশাক বাহির করিয়া দেয়—খদ্দরের ধুতি, পাঞ্জাবী ও চাদর।

বাহিরে দুয়ারে ড্রাইভার মটর লইয়া প্রস্তুত। বারান্দায় একদল লোক প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অধীর হইয়া উঠিতে থাকে।

একজন তরুণ অধ্যাপক পরীক্ষক হইবার উমেদারীতে আসিয়াছে; জন দুই বন্যারিলিফ কমিটির লোক কিছু একটা বিহিতের আশায় অপেক্ষা করে। আরও দুইদিন আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। গুরুনাথ বাবুর নিজের জেলার একটি লোকও আসিয়াছে চাকুরির সুবিধার জন্য। তাঁহারাই বাল্যবন্ধুর অনুরোধ পত্র হাতে। চিঠিটা একটু উল্টাইয়া দেখেন—স্বাক্ষর কারীর নামটা আগে পড়িয়া লন—কিন্তু দেরি করার সময় নাই এখন। তাড়াতাড়ি মোটরে চড়েন, "আচ্ছা, আরেক সময় আসবেন আপনারা; বড় ব্যস্ত আছি এখন।"

ড্রাইভার মনিবের ইঙ্গিতে গাড়ীতে স্টার্ট দেয়। দুয়ারে প্রতীক্ষমান প্রার্থীর দল ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকে দূরে বিলীয়মান মোটরটার দিকে। একটু পেট্রলের গন্ধ শুধু নাকে লাগিয়া থাকে।

নমিতা উপরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া করুণ নেত্রে দেখে কর্মপ্রার্থী জনতার নিস্ফল উষ্মা। সহস্রপ্রশ্নে তাহার মন যেন মথিত হইতে থাকে। অমলেন্দুর সেই উত্তেজিত অথচ ধীর গম্ভীর কথাগুলি কানে বাজিতে থাকে —"যুগে যুগে এমনি ক'রে বঞ্চিত মানুষের দলের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। কিন্তু এরাই হ'চ্ছে আগামী কালের স্রষ্টা।"

অ্যাসেম্বলী হাউজের মোড়ে মোড়ে পুলিস। দুয়ারের পাশে পাশে লোকের ভীড়। ভিতরে চাপা উত্তেজনা। উর্দিপরা আরদালীরা ঘন ঘন আসা যাওয়া করিতেছে। এখানে ওখানে সার্জেন্টের ত্রস্ত গতি।

কমিটিরুমে প্রবল উত্তেজনা। দারুণ বাকবিতণ্ডা আরম্ভ হইয়াছে। আর দুই ঘণ্টা পরেই কোয়ালিশনী মন্ত্রীর ভাগ্য পরীক্ষা। ঘোষালের গলা সপ্তমে উঠিয়াছে। ডিপুটি লিডারকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়াও তাহার ভ্রূক্ষেপ না করার ভাব।

সভ্য বিগড়াইবার ভার তাহাকে দেওয়া হইল না বলিয়াই ত আজ কংগ্রেস পার্টির পরাজয় বরণ করিতে হইবে। আর মাত্র তিন হাজার টাকা যদি মঞ্জুর হইত, তবে ঐ দোয়াশীলা তপশীল নেতাকে আজ কংগ্রেসের পেছনেই দেখা যাই ত নাকি ?

ঘোষালের বড়ই আপসোস।

এই No-Confidence এর সরগরমে অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার টাকার বেচা কেনা কি আর না হইয়াছে ? Deputy leader গুরুনাথ বাবুর নূতন গাড়ী কেনার রহস্যটাও এই সঙ্গে বাহির হইয়া পড়ে ঘোষালের মুখ হইতে।

ঘোষালের সর্বত্র অবাধ গতি—মারোয়ারী পট্টি হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রমিকদের সভা পর্যন্ত। কত হবু শ্রমিকনেতাকে ঘোষাল সামলে রাখে, কোয়ালিশনীরা তাহাকে ভয় করে, ভাবও রাখে। ছোটখাট দালালী যোগার কবিয়া দিয়াই এতদিন তাহার বেশ চলিতেছিল। কিন্তু এখন এই চড়তি বাজারে নয়া মরসুমে ঘোষাল ভবিষ্যতের হিসাব করে। কেই বা না করে ? গুরুনাথবাবু ত শুধু মটরের উপর দিয়াই, আর হরিচরণবাবু, শ্যামলবাবু, তাহারা ত অনাস্থা প্রস্তাবের তিনদিন আগে নিখোঁজ। তার দশদিন পরেই নোয়াখালী ব্যাঙ্কে তাহাদের নামে পনের হাজার টাকার Bank-Balance—

আলোচনাব গতি হঠাৎ বাধা পড়ে। পরিষদের বেল বাজিয়া উঠে। ডাক পড়িয়াছে—সবাই হন্ত দন্ত হইয়া ছোটে।

বাইরে দারুন বৃষ্টি। এই বৃষ্টির মধ্যে বাহির হইয়া লাভ নাই ; বিশ্বজিতের ঘরে বসিয়া গল্প করে চার জনে। ইসমাইল চেঁচাইয়া বলে— "যাও ত বিপিন, নীচের দোকান থেকে মুড়ি আর চিনেবাদাম কিনে নিয়ে এস ; তারপর খুব ভাল করে একটু চা বানিয়ে যদি খাওয়াও—"

সুধীর নাগ বাধা দিয়া বলে, "আর আজ রাতে যে খিচুড়ি, সেটা তোমায় ব'লে না দিলেই চলতো, কি বল। এই মুষলধার বৃষ্টি দেখেই তুমি তা' বুঝতে পেরেছ, তাই না বিপিন ?"

বিপিন একগাল সলজ্জ হাসি হাসিয়া বাহির হইয়া যায় মুড়ি কিনিতে।

বিশ্বজিৎ চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া শুইয়া কি একটা খাতা-দেখিতেছিল ; সে হঠাৎ প্রশ্ন করে, "আচ্ছা অমলেন্দুবাবু এবার হারলেন কেন কংগ্রেস প্রতিনিধি নির্বাচনে।" অমলেন্দু তাহার বাবার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার বাবা পুরাতন কংগ্রেসকর্মী, সহরের প্রতিষ্ঠাবান লোক। তবু অমলেন্দুর পপুল্যারিটি এত বেশি যে, উহারা নিশ্চিন্ত ছিল তাহার দাঁড়ান সম্বন্ধে।

বিশ্বজিতের প্রশ্নে ইসমাইল জোরে হাসিয়া উঠে, "সে এক গল্পই বটে !"

সুধীর নাগ গম্ভীর হইয়া বলে, "কমরেড অখিলের কাকা মিউনি-সিপালিটির হেল্‌থ-অফিসার। জীবনে স্বদেশীর ধার ধারেন নি। কিন্তু যেই শুনছেন, কমিউনিষ্টরা দাঁড়িয়েছে—অমনি উঠে-পড়ে লাগলেন আমাদের বিরুদ্ধে। 'পোলিং বুথে' পঞ্চাশ জন মেথর আমাদের ভোট দিতে এসেছে। অখিলের কাকা সকলকে আড়ালে ডেকে নিয়ে খুব শাসা'লেন—'পিটিয়ে শেষ করবো—যদি কথামত ভোট না দিস। কারও চাকরি থাকবে না।' ভয়ে মেথরদের মুখ শুকিয়ে উঠে।

হেলথ-অফিসারের লাথির গুঁতোর ব্যথা কারও কারও শরীরে তখনও আছে। তিনি বোঝাতে থাকেন, 'যখন বলবে 'এক' বলবি 'না', যখন বলবে 'দুই' বলবি 'না', যেই বলবে, 'তিন' বলবি 'হ্যাঁ'। বুঝলি?'' হ্যাঁ সব ঠিক সাহেব।' সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে মেথরেরা সকলে।"

ইসমাইলের হাসিতে হাসিতে পেট ফাঁটে প্রায়। সে সুধীর নাগকে বাধা দিয়া বলে, "সুধীরদা ত খুব নিশ্চিন্তে বসে আছে—মেথরদের পঞ্চাশটা সলিড্ ভোট। সেই আমাদের এজেণ্ট। মেথরদের ভোট নেওয়া আরম্ভ হয়। পোলিং অফিসার ব'লে যাচ্ছে, '"এক", ওরা উত্তর দেয়, "উঁহু"। "দুই", ওরাও বেশ টেনে টেনে সুর করে বলে যায় "উঁহু"—যেই "তিন" বলা—উত্তর আসে "হ্যাঁ"। পর পর পঞ্চাশ জন মেথরই ঐ এক কাণ্ড করে গেল। সুধীরদা ত দাঁত কিড়মিড় করছে রাগে। আমরা হাসবো কি কাঁদবো—ওদের মুখের ভঙ্গি দেখে। আগের দিন থাকলে, সুধীরদা হয়তো সেই রাতেই অখিলের কাকাকে একচোট উত্তম মধ্যম দিয়ে আসতো; কিন্তু এখন ত তার বড় অসুবিধার দিন—নিরামিষ যুগ।"

সুধীরনাগ হাসে একটু ইসমাইলের কথা শুনিয়া। ইসমাইল বলিয়া যায়, "আর তাছাড়া বলবেন না ব্যাপার সব। আমাদেরই গ্রামের বিড়িওয়ালা—চিরদিন সে নবীন পাল, আজও সে নবীন পাল—কিন্তু ভোটের দিন সে হরিচরণ সাহা হ'য়ে গেল। এই ত সব ব্যাপার।"

সুধীর নাগ গম্ভীর হইয়া বলে—"এই জন্যই ত—সব উঠে প'ড়ে কম্যুনিজম করা। exploit করার দিন আর বেশী দিন নেই।"

বিপিন চা ও মুড়ি লইয়া ঘরে ঢোকে। ইসমাইল খুশি হইয়া বলে,

"থ্যাঙ্ক ইউ বিপিন।" বিপিন দাঁত বাহির করিয়া তাহার 'পেটেণ্ট' হাসি এক গাল হাসিয়া যায়।

সুধীর নাগ হঠাৎ বিষণ্ণ মুখ করিয়া বলে, "তুই ঘরে তুই সাধু নিয়ে মুস্কিলই হ'য়েছে। একটা যে সিগারেট পাব কারও কাছে, তার সাধ্যি নেই। খেতে হয়, নিজের পয়সা ভেঙ্গে খাও—আর নিজের পয়সার দৌড় ত বড় জোর বিড়ি পর্যন্ত।" অমলেন্দু হাসিয়া বলে, "ও অভ্যেসটা এখন ছেড়ে দাও। বহু দিনইত চালিয়েছ—সেই এতটুকু বয়স থেকে। এবার ত্যাগ কর ওকে।"

"ওরে বাপরে!" সভয়ে উত্তর দেয় সুধীর নাগ, "জীবনে হু'টো জিনিষ আর ছাড়া সম্ভব নয়—কম্যুনিজম আর সিগারেট।"

ইসমাইল হাসিয়া বলে, "এই জন্যই ত কয় বছর আগে তোমাদের দেখতে পারতাম না—সিগারেট খাও বলে।"

সুধীর নাগ ঠাট্টা করিয়া বলে, "কম্যুনিষ্টরা সব এক জোটে সিগারেট ছেড়ে দিলে আজই আমাদের দেশ থেকে সিগারেট কোম্পানী বিদায় হবে—কি বল?"

বিশ্বজিতের মন চলিয়া গিয়াছে বহুদূরে। খাঁকি প্যাণ্ট-সার্ট পরিহিত হেলথ-অফিসারের শাসনদণ্ডের কালশিরাগুলি অত্যাচাবিত পদদলিত কালচামড়ার উপর আর কত কাল নীল হইয়া থাকিবে! তাহাদের রক্ত জমাট হইয়া নীল হইয়া উঠে—তবু তরল আগুনের মত গরম হইয়া উঠে না কেন আজও? স্তব্ধ জনসমুদ্রের উত্তালতরঙ্গে গর্জিয়া উঠিবে কবে? আর কত দেরি।

লক্ষ্মীপূর্ণিমা। বিশ্বজিৎ সপ্তমীপূজার দিন বাড়ী আসিয়াছে। দুই তিন দিনের মধ্যেই আবার চলিয়া যাইবে সে।

প্রশান্তও আসিয়াছে। পূজার বন্ধটা সে এখানেই থাকিবে।

ওপরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া তন্ময় হইয়া বিশ্বজিৎ দেখে—পৃথিবীর বুকে জ্যোৎস্নার ঢল নামিয়াছে। অপরূপ সৌন্দর্য। স্বচ্ছস্ফটিকের মত আকাশ। অপলক নেত্রে বিশ্বজিৎ দেখে। প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করে সে এ অপূর্ব সৌন্দর্যের বন্যা।

গোপালঘরে ঘণ্টা বাজিয়া উঠে—পূজা শেষ হইয়া যায়।

তাহাদের সরিকে বিগ্রহের পালা এবছর। পূর্বের অবস্থা আর নাই। অনাড়ম্বর আয়োজন। তবু মাঝি, বাগ্দী, নমপাড়াব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা প্রতিবছরের অভ্যাসমত পাতা লইয়া বসিয়া গিয়াছে প্রসাদের অপেক্ষায়। মিষ্টান্ন ও খিচুড়ি প্রসাদ। কাল, অর্দ্ধনগ্ন শিশুগুলি পরিবেশনকারীর মিষ্টান্নের পাত্রর দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া পাতা চাটে।

বিশ্বজিৎ মনে মনে ভাবে—ইহাকেই বলে দরিদ্রনারায়ণ সেবা! তোমাদেরই প্রাপ্য ক্ষুধান্ন হইতে বঞ্চিত অন্ন দিয়া তোমাদের সেবার পূণ্যার্জন। বিধাতাপুরুষের পূণ্যের খাতা কি এই বঞ্চনার পুঁজি দিয়াই ভরিয়া আসিতেছে যুগের পর যুগ?

অনেক রাত্রি পর্যন্ত বারান্দায় মাদুরের উপর শুইয়া শুইয়া প্রশান্ত ও বিশ্বজিৎ মার সঙ্গে গল্প করে। সুব্রতর গল্প হয়।

"তারা বুঝি এখন কলকাতায়ই থাকবে?" বনলতা জিজ্ঞাসা করে, "তার বোনের কি যেন নাম বলেছিলি? কেমন মেয়েটিরে? কলেজে পড়ে বুঝি?" বনলতা খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া প্রশ্ন করে।

প্রশান্তই উত্তর দেয়, "চমৎকার মেয়ে মাসীমা, বি এ পাশ করেছে এবার। বিশ্বদার বৌ করে নাও—বেশ মানাবে।"

বিশ্বজিৎ প্রশান্তর হাতে একটু চাপ দিয়া অস্ফুটস্বরে বলে, "স্টুপিড্"।

বনলতা ভীত হইয়া উঠে মনে মনে 'কি জানি সত্যি যদি হয়। বি এ পাশ করা মেয়ে বিয়ে ক'রে আনে যদি ছেলে; সে বৌ কি আর তার কর্তৃত্ব মানিয়া চলিবে ?'

"আমি কিন্তু ঠাট্টা করছি না, সত্যি বলছি—বেশ মানাত বিশ্বদার সঙ্গে।" প্রশান্ত আবার বলে।

"কিন্তু শিক্ষিত, পাশকরা মেয়ে কি আর আমাদের ঘরে মানায়। এই পল্লীগাঁয়ে তারা থাকতে পারবে কেন ?" বনলতা কথাটা উড়াইয়া দিতে চায়।

প্রশান্ত উত্তর দেয়, "তুমি কি নোলকপরা মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতে চাও নাকি ? তাহ'লে ছেলেকেও লেখাপড়া না শিখিয়ে জমিজমা দিয়েই বসিয়ে রাখলে পারতে।"

বনলতা হাসিয়া বলে, "আচ্ছা দাদার বৌর জন্যে তোমার ভাবতে হবে না। তোমার জন্যে না হয় একটি বিবি বৌ খুঁজলেই হ'বে। তাহ'লেই ত হ'ল। অনেক রাত হ'ল, এবার শুয়ে পড় গিয়ে।"

বনলতা শুইয়া শুইয়া ভাবে, 'এবাব শীগ্‌গীর শীগ্‌গীব ছেলেব বিয়ে দিতে হবে। কি জানি আজকালকার ছেলেদের মন, বলা ত যায় না—দুধ দিয়ে কি শেষে কালসাপ পুষবো ঘরে। মুকুলের ছোট বোনের সঙ্গেই না হয় ঠিক ক'রে ফেলি। চারুবালা ত কথা তুলেছিল সেদিন। দেখতেও সুন্দর, বয়সও কম—বাধ্য হবে নিশ্চয়।'

বিশ্বজিৎ উপরে আসিয়া প্রশান্তকে বলে, "তোর এ অন্যায়। তুই বুঝি ভাবিস আমি জয়াকে বিয়ে করার ইচ্ছায় আছি।"

প্রশান্ত জবাব দেয়, অন্তত ভাবি সেটা হ'লেই ভাল হ'ত। আমার দাদাটির মুখের এই বিমর্ষ ছায়া ঘুচতো তাহ'লে। তুমি বুঝি ভাব আমি কিছুই টের পাইনি।"

বিশ্বজিৎ একটু লজ্জিত হয় মনে মনে, প্রশান্তর নিকট ধরা পড়িয়া যাওয়ায়।

দুপুরবেলা যমুনার চরে বসিয়া বিশ্বজিৎ স্বপ্নের জাল বুনে। মধুর আবেশ স্বপ্নালু চোখে। হালকা মেঘের ছায়া পড়ে চরের বুকে। কৃষক কুমারীরা জল নিতে আসে নদীতে—কাজলপরা চঞ্চল চোখ।

দূরে জলাভূমিতে লাউয়ের ঝাকায় স্তিমিত রৌদ্রের আলিঙ্গন। ক্ষেতের বেড়া বাঁধিতে বাঁধিতে কৃষকবধূ প্রেমাকুল দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখে—শ্যামায়মান ধানের ক্ষেত ওপারে। বহুদূরে সবুজ ধানের শীষের আড়ালে গেরুয়া রংয়ের নৌকার পালগুলি দেখা যায় শুধু।

কৃষকবধূ তার দয়িতের নৌকার পালে লালসূতা দিয়া ঈদের চাঁদ শেলাই করিয়া দিয়াছে; তাহার প্রেমঝরা দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া আসে—লালসূতায় বোনা ঈদেব চাঁদ চোখে পড়ে না।

মাথার উপব দিয়া এক ঝাঁক সাদা বন্যহাস উড়িয়া যায়।

বিশ্বজিৎ তাকাইয়া দেখে দূরে চবেব বুকে মমতায় ভরা মাটির ঘর গুলি। তাহার মনের মধ্যে কি যেন কামনা সজাগ হইয়া উঠে। দীর্ঘ-দিনের চলাব পব যাযাবব মন একটু নীড় খোজে, চায় বিশ্রাম—স্নেহ প্রেম প্রীতিভবা নিবিব বন্ধন!

বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া জয়াদের সঙ্গে দেখা করিতে যায় বিশ্বজিৎ। জয়ারাও দেশে গিয়াছিল পূজার ছুটিতে, সাতদিন হইল ফিরিয়াছে।

জয়া বিশ্বজিৎকে দেখিয়া খুশি হইয়া বলে, "আয়ু আছে আপনার। এইমাত্র আপনার কথাই হ'চ্ছিল।"

বিশ্বজিৎ হাসিয়া বলে, "এ আমার সৌভাগ্য।"

জয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া বলে, "ভাই ফোঁটার নিমন্ত্রন রইল; কাল আসবেন ফোঁটা নিতে।"

বিশ্বজিৎ এক নিমিষে ম্লান হইয়া যায়। তাহার বুকের মধ্যে কোন একটা শিরা যেন ছিড়িয়া যায়। একটু মৌন থাকিয়া উত্তর দেয় সে, "আমায় ক্ষমা করো জয়া—আমি কাল আসতে পারবো না।"

জয়া ক্ষুন্ন হইয়া বলে, "আমার জন্য একটা দিনও দিতে পারবেন না।"

বিশ্বজিৎ বিষন্ন স্বরে উত্তর দেয়, "আমাকে দ্বিতীয়বার বলতে হ'ত না জয়া—যদি আমার আসা সম্ভব হ'ত।"

"আচ্ছা বেশ আমিই আপনার বাড়ী গিয়ে ভাই ফোঁটা দিয়ে আসবো। সেটাতো পারবো?" জয়ার কথায় অভিমানের সুর ফুটিয়া উঠে। "জয়া!" —বিশ্বজিৎ আর কিছু বলিতে পারে না, তাহার কণ্ঠে বেদনার্ত সুর।

জয়া স্তম্ভিত হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখে—বিশ্বজিতের দৃষ্টিতে ব্যথাহত এক পাণ্ডুর ছায়া পড়িয়াছে। কি যেন বলিতে চায় সে! কি যেন বলিতে পারিল না!

সেও চুপ হইয়া যায়।

বিশ্বজিতের দিনের চাকা ঘুরিয়া চলিয়াছে একটানা কাজের স্রোতে। শীতের শেষ, তবু আকাশের মেঘলা ভাব কাটে না।

সেদিন সন্ধ্যা হইতে হঠাৎ বৃষ্টি আরম্ভ হয়—বিশ্বজিৎ কোথা হইতে দারুন ভিজিয়া বাড়ী ফেরে। সেই দিনই রাত্রে তাহার খুব জ্বর আসে। তিনদিন চলিয়া যায়, তবু জ্বরের উপশম হয় না।

ইসমাইল চিন্তিত হইয়া ভাবে, 'যা বৃষ্টিতে ভিজেছে সেদিন, সইবে কেন।' প্রশান্ত আসিয়া সুব্রতকে খবর দেয়। সুব্রত বুক পরীক্ষা করিয়া দেখে নিমুনিয়ার লক্ষণ। পাঁচদিন চলিয়া যায়—অসুখের লক্ষণ খারাপের দিকেই যায়। সবাই চিন্তিত হইয়া উঠে। প্রশান্ত রাত্রিতে থাকে রোগীর কাছে, ইসমাইল ও অমলেন্দু পালা করিয়া থাকে দুপুরে।

সুব্রত জয়াকে ডাকিয়া বলে, "বিশ্বর অসুখটা যা দেখছি ভোগাবে মনে হচ্ছে। ওখানে ঐ তো বিপিন পথ্য তৈয়ার করে। কি দিয়ে কি যে করে ঠিক নেই—তুই বরং বার্লি টার্লিটা একটু করে দিয়ে আসিস।" জয়ার মন উতলা হইয়া উঠে।

সে রোজই দুইবার করিয়া যায় বিশ্বজিতেব বাড়ী। একদিনেই ঘবের শ্রী ফুটিয়া উঠে। মনে মনে ভাবে, 'এই ঘবে রোগী থাকতে পারে!'

প্রশান্ত ডাক্তার বাড়ী হইতে ফিবিয়া দেখে অদ্ভুত পবিবর্তন ঘরের। বিপিনকে ডাকিযা খুশির সুবে বলে, "উঃ এতদিনে যে সুবুদ্ধি খেলেছে মাথায়—"

বিপিন লজ্জিত হইয়া বলে, "আমি না দাদাবাবু। ঐ জয়া দিদিমনি এসেছিলেন কিনা। উনিই তো সব গুছিয়ে গেলেন। আবার বিকেলে আসবেন।" প্রশান্ত খুশি হয়, নিশ্চিন্তও হয়।

চৌদ্দ দিন পর বিশ্বজিৎ একটু ভালর দিকে। সকাল বেলা ঝির ঝিরে হাওয়া আসিয়া তাহার রোগপাণ্ডুর কপালে লাগে। চোখ বুজিয়া সে কি ভাবিতেছিল। প্রশান্ত ঘরে ঢুকিতেই বলে, "পত্রিকাটা দে'ত এনে। খবর কি স্পেনের।"

"অবস্থা ভাল নয়—চেম্বারলেনই দিয়েছে শেষ করে।"

বিশ্বজিতের চোখে উদ্বিগ্ন ছায়া পড়ে। অবসন্ন মন। শুইয়া শুইয়া আর ভাল লাগে না। কাজের কত ক্ষতি হইতেছে। নাইট-স্কুলেরই বা কি অবস্থা! একা শুভা।

প্রশান্ত বাহির হইয়া যায়। যাইবার সময় বলিয়া যায়, "জয়া এলে ব'লো পথ্যটা আজ বদলে দিয়েছে, ঐ কাগজে লেখা রইল টেবিলের উপর—দেখে যেন নেয়।" বিশ্বজিৎ বলে, "তোরা ত খুব খাটিয়ে নিচ্ছিস ওকে। তোর দাদার অসুখে আরেক বাড়ীর মেয়েকে খাটতে হবে, তার মাথা ব্যাথা কিসের?"

প্রশান্ত হাসিয়া উত্তর দেয়, "মাথা ব্যথা আছে কি নেই দেখাই যাবে।"

সে বাহির হইয়া যায়। বিশ্বজিৎ একটু বিষণ্ণ হইয়া কি যেন ভাবিতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জয়া ঘরে ঢুকিয়া বলে, "আমার একটু দেরি হ'য়ে গেল আসতে। বাড়ীতে একটু কাজ ছিল।"

"প্রশান্ত এতক্ষণ অপেক্ষা করে গেল। ঐ টেবিলের উপর কাগজটুকু আছে ওটা দেখে নিও।"

জয়া শ্লিপটা পড়িয়া স্টোভ ধরায়।

বিশ্বজিৎ কর্মরত জয়াকে দেখিতে দেখিতে মনে মনে ভাবে, "ও কেন আজও বুঝলো না!"

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রিয়ব্রত কতকগুলি দোলনচাঁপা লইয়া ঘরে ঢোকে। চমৎকার একটা স্নিগ্ধ গন্ধে ভরিয়া যায় ঘরটা। জয়া দেখিয়া বলে, "এ ফুল কোত্থেকে সন্ধান করলি এ ইটপাটকেলের দেশে। এই জন্য বুঝি ঘুম থেকে উঠেই কবিত্ব করতে বের হয়েছিলি?"

"কবিত্ব করতে মোটেই নয়, জন্মদিনের উপহার। দস্তুর মত কষ্ট করেই এ ফুল সংগ্রহ করা হয়েছে"

প্রিয়ব্রত বিশ্বজিতের দিকে তাকাইয়া বলে, "এমন ফুলই দিদির প্রিয় যে ফুল সহরে দুষ্প্রাপ্য। প্রশান্তদাকে বলতে এসেছিলাম, দিদির জন্মদিনে গান শুনাবে সে।"

একটু আক্ষেপের সুরে বলে সে, "আমাদের একটা বিশেষ দিনে বিশ্বদাই পড়ে রইলেন।"

জয়ার মন স্নেহে ভরিয়া উঠে। মা-মরা ভাইটিকে সে-ই বড় করিয়া তুলিয়াছে স্নেহ-ভালবাসা দিয়া।

স্নেহের সুরে সে বলে, "দেখছেন কি পাগল ছেলে।" বিশ্বজিৎ অপলক দৃষ্টিতে দেখে ফুলগুলি, ভাইবোনের সহজ স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহ-মাখা মাধুরী।

বিশ্বজিৎ উত্তর দেয়, "পাগল ছেলে বলছ, জয়া,—এ জিনিষ পৃথিবীতে দুর্লভ।"

"আচ্ছা চলি বিশ্বদা, দিদিকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবেন আজ!" প্রিয়ব্রত বাহির হইয়া যায়।

একফালি সোনালি রোদ ঢুকিয়াছে বিশ্বজিতের বিছানার উপর। মধুর আবেশ মাখানো রোদটুকু।

জয়ার কাজ শেষ হইয়া যায়। সেও যাইবার জন্য প্রস্তুত। "এবার চলি। প্রশান্তকে সন্ধ্যা বেলা যেতে বলবেন আমাদের ওখানে।" তারপর একটু শাসনের সুরে বলে জয়া, "এবার সেরে উঠলে বেশ কিছুদিন বিশ্রাম নেবেন। অসুখ সারতে না সারতেই আবার ঘুরতে আরম্ভ করবেন না কিন্তু।"

"আর একটু বোস জয়া, যাবার জন্য অত ব্যস্ত কেন।"—বিশ্বজিৎ অনুরোধ জানায়। তারপর কি একটু ইতস্তত করিয়া আবার বলে, "জয়া এ বাড়ীর সঙ্গে কি তোমার শুধু রোগীর পরিচর্যা করাই

একমাত্র সম্বন্ধ? আর কিছুই নয়?” উৎসুক উজ্জ্বল দৃষ্টি বিশ্বজিতের।

জয়া বিছানার পাশে বসিয়া ঠাট্টার সুরে উত্তর দেয়, “তা ছাড়া আর কি সম্বন্ধ! আমি তো আর আপনার দলের মেয়ে নই যে কোনও জরুরী কাজের সম্বন্ধ থাকবে আপনার বাড়ীর সঙ্গে?”

“সত্যি কি তাই? আর কিছুই কি টের পাও নাই জয়া এতদিনেও?” গভীর আবেগে জয়ার হাতটা তাহার হাতের মুঠার মধ্যে ধরে বিশ্বজিৎ। প্রেমাকুল স্বরে ডাকে—“জয়া!”

অকথিত কথাগুলি ধরা দেয় প্রেমঝরা দৃষ্টিতে।

জয়ার রক্তের অনুপরমানুগুলি যেন কোন এক যাদুস্পর্শে ঝঙ্কার দিয়া উঠে। এক অজানা অবোঝা বিস্ময়কর চঞ্চলতা নাড়ীতে নাড়ীতে। তাহার নারী জীবনে প্রথম পুরুষ স্পর্শ। বিহ্বল দৃষ্টিতে সে তাকায় বিশ্বজিতের দিকে। প্রতীক্ষাকুল দৃষ্টিতে কি যেন জানিতে চায় বিশ্বজিৎ—বড় বেশী স্পষ্ট বড় বেশী তীব্র সে দৃষ্টি।

জয়া চোখ নত করে।

কিন্তু উত্তর দিতে পারে না জয়া।

সে বোঝে, কত বড় আঘাত দিতেছে সে বিশ্বজিতের বলিষ্ঠ মনে। বিশ্বজিতের পরাজয়ের ব্যথায় তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিতে চায়। তবু মৌন থাকে সে।

নির্বাক জয়া বাহির হইয়া যায় নিঃশব্দে। রুগ্ন বিশ্বজিতের ভিতরটা যেন এক কল্পনাতীত আঘাতে চুরমার হইয়া যায় এক নিমেষে।

বহুদিন পর আবার সে তাহার ডায়রী খাতাটা লইয়া বসে। প্রকাশ করিতে চায় সে তাহার এই পাজর ভাঙ্গা জমাট ক্রন্দনগুলি।

কিন্তু কাহার কাছে প্রকাশ করিবে সে। তাই নিজের কাছেই লেখে সে তাহার জীবনের অভিশাপ ভরা এক চিঠি। অবসন্ন লেখনী পদে পদে হোচট খায় যেন। তবু সে লেখেঃ—

"দিনের শ্রান্ত ছায়া এসে ধরাকে ধরা দিয়েছে। আমার সামনে রয়েছে বিরাট বিশ্বের বেদনার্ত ব্যথার গান। বেদনার গভীরতায় বিশ্ব হয়ে উঠেছে মধুর। আজ এই সুগভীব মুহূর্তে আমি প্রাণ খুলে বলতে পারছি—'আমি একা, চির একা।' তাই আজ আমি লিখতে বসেছি আমার এ চিঠি, নিজের কাছে, আমার বেদনার্ত মুহূর্তের কাছে।

কোন এক অশুভ আলোকের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। যার সাথে আমার প্রথম পরিচয় হ'ল, সেও আমাকে ফেলে চলে গেল। আমার সমস্ত অসহায়তাও তাকে ধরে রাখতে পারলো না। দুনিয়ার বুকে আমি রয়ে গেলাম একা—এক সৃষ্টিছাড়ার মত।

তারপর গেছে কত বিপর্য্যয়; কত বহুরূপী স্রোতের গা বেয়ে এসেছি; কত পাহাড় কত বন্ধুর পথে নেমে। কিন্তু আজ আমি ক্লান্ত।......

দূরের বন্ধুর পথ আমার সামনে; তবু চলতে হবে আমাকে একা। আজ আমি এসেছি, যেখানে ছিলাম কয়েক মাস আগে। ব্যথায় আমার বুক কেঁপে উঠছে; আঘাতের পর আঘাতে আমি হয়েছি শতছিন্ন। তবু এই অসহায়তা আমাকে মানিয়েছে। এই আমার প্রাপ্য, এই আমার সঞ্চয়।"

দুপুর বেলা প্রশান্ত আসিয়াই ঘরের পরিচ্ছন্নতা লক্ষ্য করে; হাসিয়া বলে, "জয়া এসেছিল বোঝাই যাচ্ছে। না হলে কে আর অত দরদ ঢেলে

যত্ন করতে আসবে।” প্রশান্তর কথা থামিয়া যায় বিশ্বজিতের দিকে তাকাইয়া। মনে মনে ভাবে, “নিশ্চই আঘাতদিয়ে গিয়েছে মেয়েটা, যা চাপা মেয়ে, এতটুকু বহিঃপ্রকাশ নেই মনের।”

জয়া বাড়ী আসিয়া সারাদিন কাজ করে। তবু এক ছোয়াচে রোগ মন হইতে ঝারিয়া ফেলিতে পারেন। বুকের মধ্যে যেন এক বেদনাক্লিষ্ট জীব চাপিয়া ধরিয়াছে।

সন্ধ্যাবেলা প্রশান্ত গান করে তাহার জন্মদিনের গান। গানের সুরগুলি নিস্তব্ধ সন্ধ্যার বুকে ছড়াইয়া পড়ে। গানের সুরে সুরে তাহার মন আরও করুণ হইয়া উঠে। মনে হয় যেন তাহার মনের কথাগুলিই গান হইয়া উঠিয়াছে সুরের ছোঁয়া লাগিয়া।

একটা জমানো কান্না বুকের মধ্যে হু হু করিয়া উঠে।

সে ধরা দেয় নাই নিজেকে তাহার প্রিয়তমের কাছে। সযত্ন আয়াস দিয়া সে নিজেকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। জয়া বিশ্বজিৎকে শ্রদ্ধা করে। সে শ্রদ্ধা, অতি ধীরে তাহারই অজ্ঞাতসারে ভালবাসায় রূপান্তরিত হইয়া উঠে।

কিন্তু বিশ্বজিৎ যে তাহার মনকে এমন করিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে তাহা সে নিজেও জানিত না এর আগে। বিশ্বজিতের নিঃসঙ্গ জীবনে ব্যথা দিয়া আসিয়াছে সে শুভ মুহূর্তে। তাহাব বুকের মধ্যে সে ব্যথা দ্বিগুণ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

অলক্ষ্যে চোখেব পাতা ভিজিয়া উঠে। অনুপায সে। স্বাধীন প্রেমের রীতি নিষিদ্ধ এ দেশে। তাহার আজন্মের সংস্কার আর ভালবাসার অন্তর্দ্বন্দ্ব। বিশ্বজিতের এ প্রেম তাহার জীবনে জয় না পরাজয় ?

রবিবার দুপুর বেলা প্রশান্ত আসিয়া জয়ার সন্ধান করে, "চা খাওয়াও জয়া—অনেকদিন তোমার হাতের চা পাইনি।"

জয়া চা করিতে বসে, প্রশান্ত স্টোভ ধরায়। কয়দিন যাবৎ জয়ার যেন কিছুই ভাল লাগে না। সে লক্ষ্য করে, বিশ্বজিৎ ভাল হইয়া আর আসে নাই তাহাদের বাড়ী।

বিশ্বজিৎ তাহাকে ভুল বুঝিয়া রহিল—এ যন্ত্রনা যেন সে আর সহিতে পারে না। মনের মধ্যে কি যেন কেবলই বিঁধিতে থাকে। বিশ্বজিতের বিষণ্ণ দৃষ্টিটা বারে বারে মনে পড়ে।

চা করিতে করিতে প্রশান্তকে জিজ্ঞাসা করে সে, "প্রশান্ত, তোমার বিশ্বদা কেমন আছেন এখন ?"

প্রশান্ত জয়ার ম্লান মুখখানা লক্ষ্য করিয়া মনে মনে ভাবে, 'ভাল মানুষকে আঘাত দেওয়া অত সোজা নয় মেয়ে!' মুখে বলে, "অসুখ সারতে না সারতেই ত আবার যা ঘোরাঘুরি আরম্ভ করেছে। কাজের বোঝা দ্বিগুণ চাপিয়েছে কাঁধে। মনে হচ্ছে শীগগীরই সে আবার এক কঠিন কিছু বাঁধাবে শরীরে। বললেও ত শুনবেনা। তবে আমার মনে হয়, তুমি বললে হয়তো রাখতো তোমার কথা। কিন্তু তুমিও ত যাওয়া ছেড়ে দিয়েছ। পূর্ণ বয়কট। কেন বল ত ?"

প্রশান্ত জয়ার হাতে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়া বলে, "এভাবে নিজেকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি জয়া ?"

তাহার সহানুভূতিভরা স্বরে জয়া আর নিজেকে সামলাইতে পারে না। তাহার চোখ জলে ভরিয়া উঠে।

প্রশান্ত বোঝে সব। তাহার কষ্ট হয় জয়ার জন্য। বড় ভীতু, বড় দুর্বল। গড়তে জানে কিন্তু ভাঙ্গতে জানে না।

প্রশান্ত একদিন সুব্রতর নিকট কথা তোলে, "বিশ্বদার সঙ্গে জয়ার বিয়ে হ'লে বেশ হ'ত। বিশ্বদাকে ত তুমি ভালভাবেই জান, তোমার বাবার কাছে লেখনা।"

সুব্রতও লক্ষ্য করিয়াছে সব কিছু।

চিন্তান্বিত ভাবে উত্তর দেয় সে, "ভাবছি বাবার মত হবে কিনা। তিনি তাঁর নিজের পছন্দকরা ছেলের সঙ্গেই হয়তো মেয়ের বিয়ে দিতে চাইবেন। সেটাই বেশী স্বাভাবিক নয় কি তাঁর পক্ষে ?"

প্রশান্ত উত্তর দেয়, "তুমি মাষ্টার মশায়কে জান না। তাঁর অমত কিছুতেই হবে না, আমি জানি। তোমাদের কতখানি যে স্নেহ করেন তিনি, তা' তুমি জেলে থাকতেই আমি টের পেয়েছি। তাছাড়া অত রক্ষনশীল মনও তাঁর নয়।"

সুব্রত বলে, "রক্ষনশীল না হ'লেও কোন বাপমাই ছেলেমেয়ের প্রেমের বিয়ে সহ্য করতে পারেন না। তাঁরা মনে করেন এতে তাঁদের কর্ত্তৃত্বের উপর অবমাননা করা হচ্ছে। তাঁদের সংস্কারে বাধে। আর ছেলে-মেয়েদের অত ভালবাসেন বলেই ত চিন্তার বিষয়। তাঁর অমতে এতে পা বাড়ান যাবে না। খুবই আহত হবেন তিনি।"

প্রশান্ত তবু বলে, "তুমি সাহস না পাও আমিই তাঁর মত করাব। তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পার এ বিষয়ে। স্নেহের চাইতে সংস্কার বড় নয়।"

সুব্রত হাসে একটু। "ঐটাইত আজকের দিনের বড় সমস্যা। স্নেহ প্রেম প্রীতিতে মন ক্ষ'য়ে যাচ্ছে, তবু সংস্কারের দেওয়াল ধসে পড়ছেনা।"

বন্দীমুক্তি আন্দোলন। কর্মীদের কাজের চাপ দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। বিশ্বজিৎ সারিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু শরীর এখনও দুর্বল। অমলেন্দু শাসন

করে, "একটু সামলে চলো, না হ'লে ত, আবার বিছানায় পড়বে। এত রোদে ঘোরাঘুরি সইবে না।"

কিন্তু বিশ্বজিৎ ভ্রূক্ষেপ করে না। বৈশাখের রৌদ্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন। পায়ের তলায় গলা পিচের তাপ অসহ্য লাগে, তবু বিশ্বজিতের হাঁটার বিরাম নাই। আজকের সভার সে-ই আহ্বায়ক। এখনও অনেক কাজ বাকি মাথার উপর।

মাইকের দোকান হইতে আরম্ভ করিয়া বক্তাদের বাড়ী পর্যন্ত।

স্কুল কলেজ ধর্মঘট। হাজার হাজার লোকের বিরাট শোভাযাত্রা মির্জাপুর ছাড়াইয়া শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ঢোকে। বিশ্বজিতের মনে শান্ত উত্তেজনা। কাতারে কাতারে জনস্রোত, পার্ক ভরিয়া যায়।

ইউনিভারসিটির ছাত্রছাত্রীরা ষ্ট্রাইক করিয়া শোভাযাত্রায় বাহির হয়।

বন্দীদের অনশন আজ কুড়ি দিন। কাহারও কাহারও অবস্থা সঙ্কটজনক। এ অত্যাচারের প্রতিবাদস্বরূপ হরতাল চলিতেছে। কলেজষ্ট্রীটে ছোট বড়, সমস্ত দোকান গুলি তালাবন্ধ। দূর হইতে সঙ্ঘধ্বনি শোনা যায়—"বন্দীদের মুক্তি চাই" জয়া ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ক্লাস হইতে বাহির হইয়া শ্রদ্ধানন্দ পার্কে চলিয়া যায়।

সভামঞ্চের উপর মাইক গর্জিয়া উঠে।

সরোজিনী নাইডুর শুভেচ্ছা-বাণী—'যতদিন পর্যন্ত ভারতের প্রত্যেকটি কাবাগারেরব দ্বার আমরা উন্মুক্ত করতে না পারবো ততদিন আমাদের মনে আর কোনও শান্তি থাকতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদের নিষ্পেষণকে এরা পরাজিত করেছে। জাতি এই বন্দীবীরদের ভুলতে পাবে না...'

জয়ার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে—লোহার গারদেব ভিতর সারি সারি লোহার খাট। তাহার উপর শায়িত মৃত্যুপথযাত্রী দেশপ্রেমিকের দল। মনে মনে প্রশ্ন করে জয়া—দুইশত বৎসরের এই মেরুদণ্ড-ভাঙ্গা

অত্যাচারের জবাব আসিবে কবে? কত দেরি আর? বিভীষিকাময় বাস্তিল কারাপ্রাচীরের চাইতেও কি কঠিন লৌহে ঘেরা এই সাম্রাজ্যবাদের বন্দীশিবিরগুলি।

সভা শেষ হয়। ভারীমন লইয়া হাটে জয়া। সেও কিছু করিতে চায়—সেও কিছু করিবে।

শ্রান্ত বিশ্বজিৎ ঘরে ঢোকে। বিছান মাদুরটার উপর শরীর এলাইয়া দেয়।

বাহিরে যতক্ষণ থাকে কাজের নেশায় নিজেকে ভুলিয়া থাকে সে। কিন্তু ঘরে ফিরিলেই চুপ হইয়া যায়। বড় একা বোধ করে সে নিজেকে।

শুইয়া শুইয়া হঠাৎ চোখ পড়ে ঘরের পরিপাটি গোছান খাতা-পত্রগুলির দিকে। জলের কুজাটি পর্যন্ত কে যেন সযত্নে ঢাকিয়া রাখিয়া গিয়াছে। মৃদু আশা উকি মারিয়া যায় মনে, 'জয়াই কি?'

বিছানার উপর তাহার ডায়রীর খাতাটাও পড়িয়া আছে। খাতাটা খুলিয়াই প্রথম চোখে পড়ে একছত্র মেয়েলী হস্তাক্ষর।

তাহার সেইদিনের সেই লেখাটার তলায় জ্বলজ্বল করিতেছে নরম হাতের ছোট্ট কয়টি লেখা, "প্রিয়, তুমি একা নও।" জয়ারই লেখা!

বিশ্বজিতের মনে নূতন এক দমকা হাওয়ার ঝলকানি খেলিয়া যায়। ক্ষুদ্র মেয়েলী অক্ষরগুলি তাহার মনে আগুন ধরাইয়া দেয় যেন। রক্তের উষ্ণতা অনুভব করে বিশ্বজিৎ। কল্পনায় বহু দূরে বহু আগে চলিয়া যায়—জয়া—তাহারই জয়া!

বিশ্বজিতের সঙ্গে জয়ার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। সুব্রত বাবাকে টেলী করিয়া আনায়। প্রথমটায় জয়ার পিতা মনে মনে একটু ব্যথিত হন। তাঁহার একমাত্র কন্যার যোগ্য পাত্র নির্বাচন তিনি ছাড়া আর কেহ করিতে পারিবে এ তিনি ভাবিতেই পারেন না।

তাঁহার মত আর কেহ ভালবাসে কি জয়াকে? মা-হারা মেয়ের ভবিষ্যৎ সুখী করিবার গুরুদায়িত্ব তিনি ছাড়া আর কে নিতে পারে? এ যেন তিনি বিশ্বাসই করিতে পারেন না।

কত আশা করিয়া রাখিয়াছিলেন—তাহার শেষ সাধ্যমতই তিনি মেয়েকে সৎপাত্রস্থ করিবেন। তাহার কোন ত্রুটি দেখিয়া মৃতাপত্নী স্বর্গ হইতে যেন তাহাকে অনুযোগ না দেয়।

ছেলেমানুষ সুব্রত কি অত সব চিন্তা করিয়াছে? তাঁহার আদরের জয়া সুখী হইবে তো? সবকিছু মিলাইয়া কেমন যেন বিভ্রান্ত বোধ করেন বৃদ্ধ পিতা।

কিন্তু বিশ্বজিৎকে দেখিয়া আব আপত্তি করিতে পারেন না এ প্রস্তাবে। কেমন একটা মায়া জন্মিয়া উঠে দুইদিনেব ভিতব। মনে হয়, এ যেন পূর্ব জন্মেবই রহস্য। সবকিছুই বিধাতার ইঙ্গিত মাত্র; তিনি উপলক্ষ শুধু।

মুক্ত মনেই তিনি আশীর্বাদ করিয়া যান—কন্যা ও ভাবীজামাতাকে।

তবু কেন জানি একটা ক্ষীণ ব্যথার চাপ উপলব্ধি করেন মনের গোপন স্তরে।

১৯৩৯ সাল। ৩রা সেপ্টেম্বর। অস্বাভাবিক উত্তেজনার মধ্যে বিশ্বজিৎ ভোরের কাগজ খোলে। নাৎসী সেনা ওয়ারসর দিকে। দুর্ধর্ষ

কামানের গোলায় অগণিত শিশু, নর নারীর বিচ্ছিন্ন আর্তনাদ খবরের কাগজের কাল অক্ষরে, পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে।.........

মধ্যাহ্নের খবর দেয় রেডিও হইতে।

"বাংলা খবর—জরুরী ঘোষণা।"

বিশ্বজিতের সজাগ কান উন্মুখ হইয়া উঠে। "......জার্মানীর বিরুদ্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের যুদ্ধ ঘোষণা......"

বিশ্বজিৎ চুপ হইয়া যায় আকস্মিক বিহ্বলতায়। কেমন যেন খেই হারা হইয়া পড়ে সে। 'যুদ্ধ! দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ—তাহ'লে সুরু হ'ল! মহাদানবের তাণ্ডবলীলায় সমস্ত পৃথিবী দলিত মথিত হ'য়ে নিংশেষ হ'য়ে যাবে না ত!'

নিদারুণ অভিশাপ মানবজাতীর উপর। স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত! এই ত বর্তমান সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।—বিশ্বজিতের মনের তলায় এলো মেলো বহুকথা একসঙ্গে ভীড় করে। বাহির হইয়া পড়ে সে। আজ সে শুধু ঘুরিয়া বেড়াইবে—রাস্তায়, রাস্তায়, মোড়ে মোড়ে। সে দেখিবে বিলাসী নগরীর উৎক্ষিপ্ত প্রবাহমানতা।

বিশ্বজিৎ দেখিতে চায়—মহাযুদ্ধের ঝড় কেমন করিয়া আন্দোলিত করে এই মহানগরীকে। এস্‌প্লানেডের মোড়ে আসিয়া নামে সে। মোড়ে, মোড়ে 'টেলিগ্রাফে'র হকার ছুটাছুটি করে। বিশ্বজিৎও কেনে একখানা।

সত্যিই মহাযুদ্ধ আরম্ভ!

এক নিমেষে গিলিতে থাকে সে কাল কাল অক্ষরগুলি। যেন সহস্র কামানের গোলা ফাটিয়া পড়ে কাগজের জলন্ত অক্ষরে।

হঠাৎ মৃদুস্পর্শ অনুভব করে সে কাঁধের উপর। "একি দেবব্রত! তুমি কোত্থেকে এলে," অবাক হয় বিশ্বজিৎ।

তাহারা হাঁটিয়া চলে কার্জন পার্কের দিকে। একটি লোক তাহাদের দিকে আড়চোখে লক্ষ্য রাখিয়া কিছুদূর গিয়া একটা বিড়ি ধরায়। একটি ইরাণী মেয়ে আসিয়া পয়সা চায়। বিশ্বজিৎ ফিরিয়াও তাকায় না।

তাহার কাছে আজকের দিনটা এক বিরাট ঐতিহাসিকরূপে দেখা দিয়াছে। তাহাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা, তাহাদের বিপদের কতখানি সম্ভাবনা —সব কিছুই একটু একটু আলোচনা হয়। কেমন যেন একটা অজানা আশঙ্কা, অজানা সম্ভাবনার রোমাঞ্চ। সব মিলিয়া কিসের যেন একটা ব্যথা কাটার মত খচ খচ করিতে থাকে। রহমানের খোঁজে তাহারা বাহিব হইয়া পড়ে।

বিশ্বজিতের উপব ভার পড়িয়াছে দেশে গিয়া আন্দোলন করার। সে জিনিসপত্র গোছাইতে থাকে। বাত্রিতে ট্রেন। ইসমাইল ও সুধীর নাগ একরাশ রজনীগন্ধা লইয়া তাহার ঘরে ঢোকে।

"আপনার জলের কুজোটা একটু চাই—ফুলগুলি রাখতে।" সুধীর নাগেব হাতে ফুল দেখিয়া বিশ্বজিৎ হাসিয়া ফেলে, "হঠাৎ আবার এ কাব্য চেষ্টা কেন। ডাণ্ডাবেড়ি দেওয়া হাতে এ ফুল ত মানায় না— কাঁকনপরা হাতেই এ ফুল একমাত্র শোভা পায়।" সুধীর নাগ অতি মনোযোগের সঙ্গে ফুলগুলি কুজায় রাখিতে রাখিতে বলে, "আরে, কাঁকনপরা হাতেই ত যাবে। অমলেন্দু আর নমিতা দেবীর আজ বিয়ে, তা ও জানেন না? সাধে কি আব কাব্য-চেষ্টা।"

বিশ্বজিৎ অবাক হয় খুশিও হয়।

শান্তা ঘরে ঢুকিয়া বলে, "নমিতা আমাদের বাড়ীতেই আছে।

সেখান থেকেই রেজিষ্ট্রি অফিসে যাওয়া হবে। আপনারা সময় মত যাবেন কিন্তু।"

বিশ্বজিৎ একটু অবাক হইয়া তাকায় শান্তার দিকে। শান্তা তাহার বিস্মিতভাব লক্ষ্য করিয়া বলে, "জাননা বুঝি কিছুই। নমিতার বাবা কিছুতেই মত দিলেন না এ বিয়েতে। ছেলে ম্যাট্রিক পাশও নয়—তাঁহার বি, এ পাশ মেয়ের সঙ্গে কিছুতেই বিয়ে দিতে পারেন না তিনি। বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের কাছে তাঁর সম্মান হানি হয় তাতে।"

বিশ্বজিৎ ভাবে, অমলেন্দুর মত বিদ্বান ছেলে, কি অগাধ জ্ঞানের পরিধি, তারও এই অপবাদ !

শান্তা যাইবার আগে আবারও বলিয়া যায়, "তোমাদের আজ আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ—নমিতার বিয়ে উপলক্ষে। মা সেখানে নমিতাকে আশীর্বাদ করবেন।"

সন্ধ্যার পর ইসমাইল, সুধীরনাগ ও বিশ্বজিৎ একসঙ্গেই শান্তার বাড়ী যায়।

শান্তার মা নমিতার সীথিতে সিন্দুর দিয়া আশীর্বাদ করেন, "সুখী হও ; জন্ম-এয়োস্ত্রী হও।"

শান্তার মা অমলেন্দুকে কিছুতেই ছাড়িবেন না। "আজ রাতে ওরা আমার এখানেই থাকবে। বিয়ের রাতে আবার আলাদা থাকে নাকি বর কনে ?"

নমিতার এই অনাড়ম্বর বিবাহের বেশে সকলেরই মনে একই কথা উঁকি মারিয়া যায়—কত বড়লোকের মেয়ে ; তাহার বিয়েতে বিরাট প্রাসাদ মুখরিত হইয়া ওঠার কথা ছিল। আর আজ তার বাবাও

একমাত্র কন্তার বিবাহে অনুপস্থিত, হয়তো জীবনে আর মুখও দেখিবেন না তিনি।

নমিতার স্মিতমুখে উজ্জ্বল দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে—সে জহর পান্নার রং চংয়ে ভোলে নাই—হীরাই চিনিয়া লইয়াছে।

প্রশান্ত আসিয়া জয়াকে খবর দেয়, "বিশ্বদা দেশে চলে গিয়েছে। যাবার আগে দেখা ক'রে যেতে পারলো না তোমার সঙ্গে—আমাকে ব'লে গিয়েছে—খবরটা তোমায় জানাতে। অবস্থা বড় গুরুত্বপূর্ণ এখন; যে কোনও মুহূর্তে সে গ্রেপ্তার হ'তে পারে।"

প্রশান্ত জয়ার হাতে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়া বলে, "বিশ্বদার উপযুক্ত সহধর্মিণী হ'তে হ'বে তোমাকে। এখন থেকে মন শক্ত কর।"

মনে মনে ভাবে প্রশান্ত—'বড় দুর্বল মেয়ে—সইতে পারবে ত ?'

বিশ্বজিৎ দেশে চলিয়া আসিয়াছে।

জাবেদালীর বাপ কাশীমুদ্দি বুড়া হইয়া গিয়াছে। ছেলেই এখন হাল ধরিয়াছে। নিড়ানের সময়। বিশ্বজিৎ কাশীমুদ্দির বাড়ী যায়। বুড়া তাড়াতাড়ি আদাব জানাইয়া চৌকি আনিয়া দেয় বসিতে।

তাহার বৌও আদাব জানাইয়া হাসিয়া বলে, "সেই ছোট্ট খোকাবাবু আজ এত বড় হইছেন—এখন ত দেখলে সরমই লাগে।" বিশ্বজিৎও আদাব জানাইয়া জলচৌকিটা টানিয়া বসিয়া পড়ে।

কাশীমুদ্দির ছেলের বৌ ঘরের পিছন হইতে ঘোমটার ফাঁক হইতে দেখে তাহাদের মনিবকে। মনিব নিজে আসিয়াছে তাহাদের বাড়ীতে; অবাক হইয়া যায় সে।

বিশ্বজিৎ গল্প আরম্ভ করে কাশীমুদ্দির সঙ্গে, "জাবেদালী কৈ? খামার হইতে ফেরে নাই?"

"এখন ত নিড়নের কাজ আরম্ভ। আসতে একটু দেরি হইব।"

"কি রকম চলছে সংসার...ছেলের বিয়ে দিয়েছ?"

জাবেদালীর মা হাসিয়া উত্তর দেয়, "আমাগো কি আর আপনাগো মত্ত, যে এলে বিলে পাশ করবো বিয়া থা না কইরা। আমাগো মধ্যে ছাওয়ালপাল একটু ডাগর হইতে না হইতেই বিয়া দিয়া দি। জাবেদালীর কি আর আউজকা বিয়া হইছে। পাচ বছর হইয়া গেলনা।"

বিশ্বজিৎ আসমানীর খবর জিজ্ঞাসা করে। "শ্বশুর বাড়ীতেই আছে বুঝি? কয়টি ছেলেমেয়ে?"

জাবেদালী নিড়ানি হাতে বাড়ী ফেরে। বিশ্ববাবুকে বাড়ীতে বসা দেখিয়া হাসিয়া আদাব জানায়। বিশ্বজিৎ তাহাকে দেখিয়া বলে, "এই যে জাবেদালী তোমার জন্যই বসে আছি। আজ সন্ধ্যায় একবার গোকুলের বাড়ী যেতে হ'বে। আজ সেখানেই সভা হ'বে।

জবেদালীর মা অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করে, "সভা হইব? কিসের সভা?"

কাশীমুদ্দি ধমকে দেয়,"তুমি মাইয়া লোক এর বুঝবা কি?"

বিশ্বজিৎ জাবেদালীর মার দিকে তাকাইয়া হাসিয়া বলে, "এই তোমাদের সুখ সুবিধার কথাই হ'বে সেখানে।"

বিশ্বজিৎ উঠিয়া পড়ে। জাবেদালী সঙ্গে সঙ্গে রেললাইন পর্যন্ত যায়।

"করিমদ্দি আর ইউনুসকে খবর দিয়ে রেখো কিন্তু!" জাবেদালীকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

বিশ্বজিৎ রেললাইন ধরিয়া হাঁটিতে থাকে। মনে মনে ভাবে, সেই

ছোট্ট জাবেদালী বাপের সঙ্গে তাহাদের বাড়ীতে আসিত—মাদারের খেলা দেখাইতে। আজও মনে পড়ে, তাহাদের সেই ছড়াবলার অদ্ভুত সুর, "ছিকা নড়ে ছিকা নড়ে—ঝমঝমাইয়া টাকা পড়ে—"

আর আজ সে কত বড় হইয়া গিয়াছে—বলিষ্ঠ দেহের ভঙ্গিতে চাষীর ছেলের পূর্ণ প্রতিক। গৃহস্থ সন্তান। মা বাপ বৌ ঘরে। ছনের ছাউনি দেওয়া মাটিব ঘর। আম কাঠালের ছায়ায় ঢাকা গোবর দিয়া লেপা উঠান।

কিন্তু উহাদের আসল জীবনের খেলা ঐ বিস্তৃত ক্ষেতের বুকে—ফসলকাটাব সুরে।

বিশ্ববাবুকে সড়কে তুলিয়া দিয়া জাবেদালী বাড়ী ফিরিয়া আসে।

রোজার দিন। অন্ধকার থাকিতেই নাস্তা খাইয়া বাহির হইয়াছে সে। সারাদিন জলগ্রহণ নিষিদ্ধ। ক্ষেতে নিড়ানি দিতে দিতে বারে বারে গলা শুকাইয়া আসে। বেলা যেন আর কাটেনা।

জাবেদালী নমাজ শেষ করিয়া আখিগুড়-পানা দিয়া রোজা ভাঙ্গে।

মুন্সীবাড়ীতে আজ জোগানদারদের রোজার খাওয়ান দিতেছে; জাবেদালীরও নিমন্ত্রণ সেখানে। আধমন দুধ কিনিয়াছে পায়েসের জন্য—বাছুর জবাই দেওয়া হইয়াছে একটা।

"ভালই খাওয়াইতেছে মুন্সী।" জাবেদালীর মা খুসি হইয়া বলে।

কাশীমুদ্দি উঠিয়া যায় মুরগীগুলিকে খোঁপে ঢুকাইতে। বাড়ীর আর কারও যদি সে খেয়াল থাকে। শিয়ালের জ্বালায় মুরগী পালাই দায়। খুঁজিয়া খুঁজিয়া এখান-ওখান হইতে মুরগী বাহির করিয়া খোঁপে বন্ধ করে।

গরুগুলিকে ঠিকমত বিচালি দেওয়া আছে কিনা—দেখিয়া আসে।

বুড়া হইয়া গিয়াছে, তবু রেহাই নাই।

রাত্রের খাওয়া দাওয়া মিটাইয়া জবেদালীর মা ও বৌতে নৌকার ছেড়া পালটাতে তালি দেয়। আর ত কয়দিন পরই কেরায়ায যাইবে জাবেদালী। দিনে মুহূর্ত সময় পায় না। ঈদের দিন আসিতেছে। অবস্থাপন্ন মিঞা, মুন্সীদের বাড়ী বাড়ী মুড়ি মুড়কি ভাজিয়া দিয়া আসিতে হয়। বাবুদের বাড়ীর ছোট ছাওয়ালের কাথার ফরমাইসও আছে এক গাদি। এই মাসেই শেষ করিয়া দিতে হইবে।

এই সব টুকটাক করিয়াই ত সংসার চলে। বাড়ীর বুড়া ত আর খামারে যাইতে পারে না—নিত্যি জ্বর লাগিয়াই আছে। একা জবেদালীর আয়। ক্ষেতের কাজ ত কয়মাস বন্ধ থাকে। নাগাৎ সেই ফসল কাটার দিন পর্যন্ত। জাবেদালী তাই একখানা "দোমালা" নৌকা কিনিয়াছে এই বছব। ক্ষেতের কাজ শেষ হইলেই কেরায়া খাটাইবে সে।

মুন্সীবাড়ীতে হাকডাকেব শব্দ কানে আসে—জোগানদাররা সবাই আসিয়া গিয়াছে। জাবেদালী লুঙ্গিটা বদলাইয়া চলিয়া যায়।

অনেক রাতে খাওয়া দাওয়া শেষ হয়।

কামলারা সবাই খুসি হইয়া জিগির দেয়—"ও-ও-ও—ওঃ।"

নদীর ধারে ছোট্ট মসজিদের সামনে দলে দলে মুসলমান চাষীরা জমা হয়। রোজার মাস পড়িয়াছে। দুপুরের নমাজ পড়া শেষ হইয়া যায়।

বিশ্বজিৎ আগাইয়া আসে।

রেল কোম্পানী চাষীদের জমি দখল করিয়াছে; কিন্তু ক্ষতিপূরণ দেয়

নাই। চাষীরা অসহায়। ছয়মাস চলিয়া যায়। কি ভাবে ক্ষতিপূরণ আদায় হইবে বুঝিয়া উঠে না।

বিশ্বজিৎ বুঝায়, "এই সব অন্যায়ের প্রতিকাব পেতে হ'লে তোমাদের একজোট হওয়া দরকার। কৃষক সমিতির ঝাণ্ডাব তলায় একত্র হ'তে হবে তোমাদের। সরকারের জুলুম, দালালের উস্কানি, কোন কিছুতেই দমলে চলবেনা। কৃষকসমিতিই তোমাদেব কেল্লা।"

মুদি বাড়ীতে, মসজিদেব সামনে, পোড়োবাড়ীর মাঠে ছোট ছোট বৈঠক করিয়া বিশ্বজিৎ বুঝায়—চাষী ভাইদের ভবিষ্যতের উন্নতির সম্ভাবনা—তাহাদের জীবন মবণ সমস্যা—তাহাদের এই দুঃখ দুর্দশাব জন্য দায়ী কাহারা।

বিশ্বজিৎ বুঝাইয়া যায়—"তিন দফায় তোমাদেব শোষণ করছে, একদিকে জমিদাবের খাজনা—অন্যদিকে সরকাবে ট্যাক্স—তার উপর মহাজনের সুদ। আজ তোমাদের বড় শত্রুই হ'চ্ছে জমিদার। তাদের মত নিষ্কর্মা আব নেই। তোমাদের সর্বনাশের প্রধান মূলেই এরা। কাজেই এই বর্তমান ভূমি-প্রথার আমূল পবিবর্তন না হ'লে তোমাদের নিষ্কৃতিব পথ নেই। এই পবগাছা জমিদাব শ্রেণীকে জিইয়ে বাথার অর্থ তোমাদের সর্বনাশকে পুষে রাখা।"

জয়ার বাবা আসিয়াছেন মেয়ের বিবাহ দিতে। সময় সংক্ষিপ্ত। আত্মীয় পরিজন কাহাকেও আনা সম্ভব হয় নাই। সময় নাই—যে কোনও মুহূর্তে বিশ্বজিৎ গ্রেপ্তার হইতে পাবে। সকলের মন আশঙ্কায় ভারী হইয়া আছে—কি জানি কি হয় কখন।

বিবাহ প্রাঙ্গন। বাদ্য নাই—উৎসব কলরব নাই। মাঙ্গলিক যজ্ঞাগ্নির ধারে বৃদ্ধ পিতা গোধূলিলগ্নে কন্যা সম্প্রদান করেন। মাথার উপরে ধ্রুবতারা শাশ্বত প্রেমের সাক্ষী।

"ধ্রুবং ঈক্ষ্যস্ব ময়ি ধ্রুবা এধি।" বিশ্বজিৎ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যায়। যজ্ঞের আগুনের লালশিখা প্রতিবিম্বিত হয় সলজ্জ বধূর মুখে। বিশ্বজিৎ মুগ্ধ নেত্রে দেখে বধূবেশী জয়ার চোখের মধুর লাজুক দীপ্তি।

বিশ্বজিৎ জয়াকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতেছে।

ছোট্ট প্রাঙ্গণটুকু মন্ত্রপাঠের ওজস্বিনী সুরে মুখরিত হইয়া উঠে—"এনাং কন্যাং সালঙ্কারাং তুভ্যমহম সম্প্রদদে।"

পিতার নিকট হইতে কন্যার কতবড় গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিতেছে সে। সবে মিলিয়া তাহার মনে এক অদ্ভুত অনুভূতির আলোড়ন হইতে থাকে। বিচ্ছেদ ও মিলনের অদ্ভুত সমন্বয়।

কন্যা শ্বশুরবাড়ী রওয়ানা হইয়া যায়। বৃদ্ধ পিতা চোখের জল গোপন করেন। কেমন একটা থমথমে আবহাওয়া। মেয়েটার জীবনে কি আছে কে জানে। শূন্য ঘরে ফিরিয়া আসে পিতা। কিছুই ভাল লাগেনা। একখানি উপনিষদ্ খুলিয়া বসেন, কিন্তু ঘুরিয়া ফিরিয়া মেয়ের কথাই মনে হইতে থাকে।

বিশ্বজিৎ জয়াকে লইয়া দেশে ফিরিতেছে।

বিশাল যমুনার বুকে খরস্রোত। চঞ্চল চপল কন্যা মূক হইয়া যায়। মধুর মৌনতা। জয়া চুপ করিয়া একটা ডেকচেয়ারে বসে রেলিংয়ের ধারে। প্রশান্ত হাতলটার উপর আসিয়া বসে—

"কি অত চুপ হ'য়ে গেলে যে! শ্বশুর বাড়ীর ভয়ে নাকি!" দুষ্টামি ভরা হাসি হাসে সে। কিন্তু তাহার মন কেন জানি ভারি হইয়া আছে।

থাকিয়া থাকিয়া মনে হয়—কি জানি কি একটা ঘটিয়া গেল তাহার জীবনে। এক অস্পষ্ট বেদনাতুর অনুভূতি—বুঝিয়া উঠে না প্রশান্ত।

নদীর বিশালতায় আরও বেশী স্তব্ধ হইয়া যায় সে। হাসি ও কথা দিয়া মুখর করিয়া তুলিতে চায় সে নিজেকে।

"বোস, বিশ্বদাকে ডেকে আনি। শিবশঙ্কর কাকা ত ঘুমুচ্ছেন দেখে এলাম।" বলিয়া উঠিয়া পড়ে সে। মনে মনে ভাবে, "উঃ এত ভীরু ছেলের ভাগ্যে দুঃখ অনিবার্য।"

বিশ্বজিৎ আসিয়া বসে। প্রশান্ত অনুযোগ দেয়, "জয়া যাচ্ছে তোমার বাড়ী; আর তুমি ত বেশ লোক। দিব্যি ওকে একা ফেলে ঘুরে বেড়াচ্ছ।" প্রশান্ত উঠিয়া যায়, "দাঁড়াও চায়ের ব্যবস্থাটা করি আগে।"

বিশ্বজিৎ চেয়ারটার হাতলের উপর বসে। বধূবেশী জয়ার অনুরাগ ভরা রক্তিমশ্রীর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখে। মনে মনে কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠে, "বড় দুঃখের মধ্যে টেনে আনলাম তোমাকে, বড় স্বার্থপর আমি।"

নিঃশব্দে জয়ার হাতটা তুলিয়া লয় নিজের হাতের মধ্যে। অকথিত প্রেমকাকলি অনুভূত হয় নিরব স্পর্শে।

অদূরে চরের বুকে সাদা বকগুলি উড়িয়া যায়। একটি কৃষক মেয়ে তন্ময় হইয়া দেখে, চলমান ষ্টীমারের আরোহীদেব, নব পরিণীতা দয়িতদম্পতি

ষ্টীমার আসিয়া ঘাটে ভিড়ে। এইটুকু সময়ের মধ্যেই জয়া তাহার শ্বশুর বাড়ীর আবহাওয়াটা অনুমানে বুঝিয়া লইয়াছে। বাড়ী হইতে চলনবাদ্য লইয়া ঘাটে আসিয়াছে আত্মীয় পরিজন। গ্রামের রায়ত-জনরাও আসিয়াছে বিশেষ করিয়া বিশ্ববাবুর পাশকরা বৌ দেখিতে।

কানাঘুষা, মৃদুগুঞ্জন চলিতে থাকে, "তিনটা পাশ দিয়েছে যখন,

বয়স নিশ্চয়ই দেড় কুড়ির কম নয়। বিশ্ববাবুর বড় ত হবেই। সাজ সজ্জায় নাকি কত বাহার—মেমসাহেবদের মত নাকি চুল ছাটা।" কেউ বলে, "শুনেছি বিশ্ববাবুর চাইতে লম্বায়ও নাকি বড় দেখতে।"

সকলের ভীতি, আশঙ্কা, অনুমান ব্যর্থ করিয়া নূতন বৌ ষ্টেশনে নামে থালি পায়ে গ্রাম্য বৌদের মতই শাড়ি পরা—ঘোমটা টানা পল্লীবধূ। অদূরে দাঁড়াইয়া মুকুলের ছোট ভাই কল্যাণ মনে মনে হাসে, 'চালাক মেয়ে বটে।'

সহর হইতে আগত অল্পবয়স্ক ছেলে মহলেও একটু চাঞ্চল্য ভরা মৃদু গুঞ্জন আরম্ভ হয়, "সেয়ানা মেয়ে বটে! দেখলি কেমন জব্দ করেছে গ্রামের বুড়িদের। খুব অপদস্ত হবে বুড়িগুলি। এবার তারা নিশ্চয়ই গবেষণা করতে বসবে গোল হ'য়ে— কি খুঁত বার করা যায় পাশ করা বৌর!"

ষ্টেশনে পালকি দাঁড়ান। জয়া মনে মনে ভীত হইয়া উঠে। প্রশান্ত লক্ষ্য করে। সে আস্তে আস্তে বলিয়া যায় নিম্নস্বরে, "কিছু ভয় নাই জয়া, আমরাও ত আছিই।"

একটা বেদনার্ত সহানুভূতিতে তাহার মন ভরিয়া উঠে জয়ার ভীতি ব্যাকুল চোথ দুইটি দেখিয়া। মনে মনে বিরক্ত হয়, "এত গোবেচারা হবার কি প্রয়োজন ছিল বিশ্বদার। মেয়েটাকে শেষ করবে বুঝেছি।"

ছেলের বিবাহের গোলমাল কাটিয়া গিয়াছে। কয়েকদিনেই বনলতার মন হইতে শিক্ষিত মেয়ের ভয় কাটিয়া যায়—তবু মনের সংশয় কাটিয়া উঠে না। 'বড় বেশী কম কথা বলে মেয়েটি। ছোট ছোট উত্তরে মনের যেন থেই পাওয়া যায় না বৌর।'

ভবিষ্যতে তাহাকে মানিয়া চলিবে কি চলিবে না, তাহা যেন সম্পূর্ণ রূপে বুঝিয়া উঠিতে পারে না বনলতা। রায়ত প্রাণকৃষ্ণের মা ও নিতাইর পিসি আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, "কেমন বৌ পাইলেন ছোট কর্ত্রী ?"

বনলতা দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে উত্তর দেয়, "এখন তো ভালই দেখি, পরে কি হবে কে জানে ?"

জয়াও শোনে সব। সে বুঝিযা উঠে না, এত সংশয় কেন শাশুড়ীর মনে।

মাস না কাটিতেই জয়া বুঝিতে পারে, বিশ্বজিৎ এত বিমর্ষ থাকে কেন সর্বদা। তাহাকে মন খুলিয়া হাসিতে দেখে নাই কোনদিন সে এ বাড়ীতে আসিয়া। জয়া বোঝে, স্বামীব কোন স্নেহের জোর নাই মার উপব। মার সঙ্গে তাহাব সম্পর্কটা সমাজের শিকল দিয়া শুধু বাঁধা—মনের শিকর গাঁথে নাই। সেও তাই নিজেকে থাপ খাওয়াইয়া চলে এই বাড়ীর সঙ্গে। সর্বদাই সতর্ক—গ্রামের বৌ সে।

চারুবালা ও মুকুল ভাবিয়াছিল, কলেজে পড়া মেয়ে—তার চালচলন না জানি কত ফ্যাশান দুবস্ত হইবে। কথায় বার্তায় তুখড় সহুরে ভাব ফুটিয়া উঠিবে।

কিন্তু সাজ সজ্জায় সাদাসিধা জয়াকে দেখিয়া কেমন জানি অশ্বস্তি লাগে মুকুলের। একটু আশ্বস্তও হয়, "পাশ করা মেয়ে হইলে কি হইবে—আধুনিকতায় তাহাকে ছাড়াইতে পারে নাই।"

চারুবালা জয়াকে ডাকিয়া বলে, "এস চুল বেঁধে দি।" জয়া ফিতাকাঁটা লইযা চুল বাঁধিতে বসে খুড়ী শাশুড়ীর কাছে। চারুবালা খুশি হয়। নিজেব বোনঝি মুকুলও ত কোনদিন রাজী হয় নাই—সেকেলে চুল বাঁধা নাকি আজকাল আর চলে না।

জয়ার এই নম্রভাবটুকু চারুবালার বেশ ভালই লাগে। 'কোনও দেমাক নাই বিশুর বৌর।' মনে মনে ভাবে।

কিন্তু বনলতার সহুরে আর শিক্ষিতের বিরুদ্ধে ঝাঁঝ যেন আর শেষ হয় না। সমস্ত জীবনের ব্যর্থতার পুঞ্জিভূত আক্রোশে থান থান করিতে চায় সে নিজের বরাতকে। পেটের ছেলে হইলে কি তার এ পরাজয় মানিতে হইত, ছেলের কাছে?

বনলতার প্রতি কথায় একমাত্র প্রচ্ছন্ন সুর ধরা পড়ে জয়ার কাছে—গরীবের সন্তান বিশ্বজিৎ, তাহারই কৃপায় আজ তাহার এত উন্নতি, এত প্রতিপত্তি। তাহারই টাকা, তাহারই সম্পত্তি, তাহারই রায়তজন, তাই বিশ্বজিতের উপর একমাত্র তাহারই কর্ত্রীত্ব করার পূর্ণ অধিকার।

কিন্তু বনলতা তাহাও করিতে পারে নাই। পরাস্ত বনলতা, পরাজিত তাহার অর্থের অহঙ্কার।

বৈষয়িকতার নিকট মাথা লুটায় নাই বিশ্বজিৎ। তাহার দৃষ্টি প্রসারিত বহুদূরে লাঞ্ছিত পৃথিবীর মাঝে। তাই আজ আত্মনিপীড়ন আরম্ভ হইয়াছে বনলতার। ছেলেকে বশীভূত করিতে পারে নাই, এখন শেষ চেষ্টা পুত্রবধূকে দিয়া।

তাই প্রথম হইতেই বৌকে বাবে বারে জানাইয়া রাখে বনলতা—ছেলের সমস্ত উন্নতি তাহারই কৃপায় হইয়াছে। গরীবের সন্তান সে। জয়ার আর সব দেওর, ননদরা সবাই গরীব।

ছেলের নিকট যে ভুল করিয়াছে বনলতা পুত্রবধূর কাছেও সেই একই ভুল করিল সে। অর্থের পায়ে মাথা লুটাইতে জানে না জয়া—একমাত্র মানুষের স্নেহ-ভালবাসা মমতার নিকট পরাজিত সে।

কিছুদিনের মধ্যেই বনলতা টের পায়—তাহাকে ভয় করে না জয়া,

অথচ অমান্যও করে না। কোন কিছুতেই খুঁত নাই—নম্র বিনয়ী। তবু কেমন যেন স্বাধীন গর্বিত ভাব।

গ্রামের অন্য পাঁচজনের মত ভয়ে জড় সড় নয় মোটেই। বৌর এই নির্লিপ্ত নির্ভিকতায় সূক্ষ্ম পীড়া বোধ করে বনলতা। মনে মনে ভাবে সে, 'বড় চালাক সহুরে মেয়েরা!'

এত করিয়াও শাশুড়ীর উত্তপ্ততা কমাইতে পারে না জয়া। ক্লান্ত হইয়া পড়ে সে, "উঃ এই বিষাক্ত আবহাওয়ায় সমস্তটা জীবন তাহার কাটাইতে হইবে!"

বিশ্বজিৎ সারাদিন বাহিরে বাহিরেই থাকে। কাজের চাপ খুব বেশী পড়িয়াছে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া উঠে বিশ্বজিৎ।

জ্যৈষ্ঠ মাস। বৃষ্টির নাম গন্ধ নাই। এককোঁটা জল নাই ক্ষেতে। চষামাটি তাঁতিয়া আছে। আগুনের হলকা যেন বাহির হইয়া আসে মাটির তলা হইতে। মাথার উপরে মেঘশূন্য আকাশ হইতেও তপ্ত আগুনের তাপ নামিয়া আসে। তাকান যায় না রৌদ্রের দিকে; তীব্র তেজ, চোখে জ্বালা ধরে।

হাহাকার পড়িয়া যায় চাষীদের ঘরে ঘরে। "আল্লা পানি দাও পানি দাও।" কাল শঙ্কায় ভরিয়া উঠে মন—এখনও বৃষ্টি হইল না, কি উপায়? মেঘের কারসাজির উপর নির্ভর বাংলার চাষী।

জয়ার ঘর উপর তলায়। ঘরের জানলা দিয়া গ্রামের একাংশ ছবির মত দেখায়। বাহির বাড়ীর সামনে একটা পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর অনতিদূরেই একটা টিউব-ওয়েল। খালপারের মুসলমান মেয়েরা অনবরত কলসী লইয়া আসে 'টিউব-ওয়েল' হইতে জল লইতে। গ্রীষ্মের কয় মাস খালের জল দুষিত হইয়া যায়।

তাহাদের দেখিয়া জয়ার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। নীচে দশ আনির 'সিটিং-রুম' হইতে গান ভাসিয়া আসে। রেডিয়োতে গাহিতেছে কোন খ্যাতনামা গায়ক, "বৈশাখ হে......"

গানের সুরে জয়ার মন হালকা হইয়া দূরে চলিয়া যায়। তাহার কৈশোরের গ্রামখানি। নৌকায় চড়িয়া বিলে বেড়াইতে যাইত সে বাবার সঙ্গে, প্রশান্ত আর প্রিয়ব্রত। প্রশান্ত হালে বসিয়া গান করিত, "সকল দেশের চাইতে সেরা আমাদের এই জন্মভূমি।" আর তাহার ভাই বোনে শাপলা তুলিয়া নৌকার পাটাতন বোঝাই করিত।

তারপর সাত বছর কাটিয়া গিয়াছে। আজ সে তাহারই গ্রামের বৌ তাহারই দাদার বৌ। অবাক লাগে ভাবিতে।

প্রশান্ত একা মানুষ বাড়ীতে। বাবার আমলের বুড়া চাকরই বাড়ীর সবকিছু দেখাশুনা করে। বাবা যথেষ্ট টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। কোন চিন্তা নাই, ভাবনা নাই, ছন্নছাড়া জীবন। সারাদিন বিশ্বজিতের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করিয়া ক্লান্ত হইয়া বাড়ী ফেরে যখন, কিসের যেন এক অভাব অনুভব করে সে। একটি যদি বোনও থাকিত তাহার—ভাবে প্রশান্ত।

বাড়ীটার বড় বড় ঘরগুলিতে নিস্তব্ধ মৌনতায় মনটা উদাস হইয়া উঠে। বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগে ঘরগুলি।

বুড়া চাকর আর সে—দুইটিমাত্র প্রাণী এতবড় বাড়ীটার মধ্যে।

মাঝে মাঝে চোখ পড়ে জয়াদের ঘরের দিকে। তাহার ঘর হইতে জয়ার ঘরটা দেখা যায়। প্রায়ই দেখে—জয়া কেমন এক কয়েদীর মত জানালার ধারে দাঁড়াইয়া আছে। দুঃখ হয় তাহার জয়ার জন্য—বেচারাকে জেলখানায় পু'রে রাখা হ'য়েছে যেন।

একদিন খুব ভোরে উঠিয়া প্রশান্ত বনলতাকে বলিয়া আসে, "মাসীমা, তোমার বৌর আজ আমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ।"

বনলতা আসিয়া বলে, "তোকেই কে রেঁধে খাওয়ায় ঠিক নেই, তুই আবার নিমন্ত্রণ খাওয়াবি দাদার বৌকে! আগে নিজেও একটি বৌ নিয়ে এস ঘরে—"

প্রশান্ত বাধা দিয়া বলে, "কেন, তোমাব বৌ কি আমাব পব নাকি যে, তাকে রেঁধে খাওয়াতে হ'বে। সে নিজেই বেঁধে আমাদের খাওয়াবে।"

বনলতা হাসে, "ও, এই তোমার বৌদিকে নিমন্ত্রণ, বললেই হয়—বৌদি আজ আমাব বাডীতে গিয়ে রাঁধবে।"

জয়া প্রশান্তর ঘব দেখিয়া খুশি হয়, "বাঃ চমৎকার গোছান ঘরত! তা চিরদিনই ত তোমাব একটু সুরুচিব দিকে ঝোঁক।"

শেলফ্‌ভরা অজস্র মূল্যবান গ্রন্থ। মাটিতে এক কোনায় কুজা ভর্তি শাপলা ফুলের গুচ্ছ—সাদা, গোলাপী ও নীল রংয়েব সুন্দর ফোটা ফুলগুলি। জয়াব আগমন উপলক্ষেই আজ সে সংগ্রহ করিয়াছে এ ফুল।

দেওয়ালে টাঙান রবীন্দ্রনাথ ও লেনিনের ছবি। আবেক দিকে একটা পৃথিবীব মানচিত্র।

জয়া একটু ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে।

"উঃ একটু যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম—"

প্রশান্ত মনে মনে বলে 'এইজন্যইত এত ঘটা কবে নিমন্ত্রণ করে আনা। তুমি কি বুঝবে এসব কারসাজি।' মুখে বলে, "বিশ্বদা এল না যে! আমি ত কাল রাত দেড়টা অবধি জেগে সব কথা সেরে এসেছি। তা'ও এ অধমের বাড়ীতে তার একটু পায়েব ধূলা পড়তে এত কার্পন্য।"

প্রশান্তর রাগ দেখিয়া হাসিয়া ফেলে জয়া।

"নাঃ, উঠি এবার। রান্নাঘরে যাই—যে জন্য ডেকেছ..."

প্রশান্ত বাধা দিয়া বসাইয়া দেয় জয়াকে—"সে জন্য অন্নপূর্ণার না ভাবলেও চলবে। বিনা অন্নপূর্ণায়ও আমার ঘরে দৈন্য নাই।"

রান্নাঘরে গিয়া অবাক হয় জয়া। আয়োজন সব ঠিক। আশ্চর্য খেয়াল প্রশান্তর। তাহার প্রিয় জিনিসগুলি সব বাছিয়া বাছিয়া যোগাড় করিয়াছে। প্রশান্তর জন্য একটা ক্ষীণ বেদনার অস্পষ্ট চাপ অনুভব করে জয়া বুকের মধ্যে। এই বাড়ীতে আসিয়া এই প্রথম জয়া দেখিল তাহার জন্যও কেউ এত ভাবে।

জয়ার যেন চোখে জল আসিতে চায়।

বিশ্বজিত আসিয়া পড়ে। সমস্তটা দিন একটা খুশির আমেজে কাটিয়া যায় তিন জনের।

তিনজনে দুপুরবেলা গল্পের জাল বোনে।

পুরান স্মৃতির রোমন্থন।

বিশ্বজিতের কপালের উপর এলোমেলো ভাবে উড়িয়া আসে জয়ার হালকা চুলগুলি। মেয়েলী চুলের মৃদুগন্ধ একটু।

জয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে পুরান দিনের কথায়। তাহার চোখে মুখে খুশির বন্যা নামিয়া আসে।

"উঃ কি দিনই তখন গিয়েছে! প্রশান্ত লুকিয়ে লুকিয়ে বেণু পত্রিকাগুলি দিয়ে যেত পড়তে। সেও একদিন কেটেছে—রোমাণ্টিক যুগ। একনিঃশ্বাসে প'ড়ে ফেলতাম পত্রিকাটা!"

প্রশান্তর মন বহুদূরে ভাসিয়া যায়—

কৈশরের জয়া—কালসুতার রাখি বাঁধিয়া দিয়াছিল তাহার হাতে দীনেশগুপ্তের ফাঁসির পর।

বীরশহিদের স্মৃতির রাখি।

আজও সেই কাল সুতাব রাখি তাহাব বাক্সে সযত্নে তোলা আছে।

জয়ারও মন চলিয়া যায দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া তাহার বাল্যেব অতি পবিচিত গ্রামেব কোলে। দীর্ঘদিনেব ফেলিয়া আসা একটা সোনালী সন্ধ্যা। বিলেব মধ্য দিয়া বেড়াইতে যাইত তাহারা। নৌকার গায়ে গায়ে লাগিয়া ধান গাছেব শীষগুলি সন সন কবিয়া উঠিত।

বিলের ঘন কাল জলেব উপর ভাসিয়া থাকা শাপলা ফুলগুলি অপরূপ সুন্দর।

জয়ার স্বপ্নালু চোখদুটিতে অতীতেব ছায়া পড়ে।

জয়া হাসিয়া প্রশান্তকে জিজ্ঞাসা কবে, "আচ্ছা তুমি যে সেই বিলেব জলে প'ড়ে গিয়েছিলে মনে আছে ?"

প্রশান্তও হাসিয়া উত্তব দেয, "তা আব মনে থাকবেনা? সবষে ফুল দেখে উঠছিলাম সেদিন।"

বিশ্বজিৎ বলে, "আমি এবাব উঠলাম। তোমাদের ঐ পদ্মানদীব মহাকাব্যে আমাবও কোন স্থান নাই।"

জয়া বিশ্বজিতেব হাতটা টানিয়া বসায়।

"পদ্মানদীব দেশের গল্প শুনতে বুঝি ভাল লাগলোনা। আচ্ছা আমবা চুপ কবি ; তুমি এবাব যমুনা পারের বীরের কাহিনীই শুনাও। সেদিকেও ত দারুণ কৃপণ। নিজেব জীবনেব সঞ্চয় থেকে অন্যকে ভাগ দিতেও কার্পণ্য—আবার অন্যেরটা শুনেও ঈর্ষা আসে মনে।" বিশ্বজিৎ ভাবে—কেমন সহজ হইয়া উঠিয়াছে জয়া।

মুখে বলে, "তা' ত আসেই। সেই পদ্মার চঞ্চল কন্যা যে আজ আমার ঘরে এসে মুখই খোলেন না।" জয়া হাসে—বিষণ্ণ, মিষ্টি হাসি। মনটা একটু বিমর্ষ হইয়া যায়—আবার ত ঐ রাক্ষুসে বাড়ীটায় ঢুকিতে হইবে।

প্রশান্ত উঠিয়া যায়, "যাই রামুদাকে ডেকে তুলি। যদি একটু চা খাওয়ায় দয়া করে।"

স্টোভ ধরাইতে ধরাইতে প্রশান্ত গানের সুর টানে গুন গুন করিয়া—

"তোমার হৃদয় পাত্র উচ্ছলিয়া
মাধুরী করেছ দান—
' তুমি জান নাই—তুমি জান নাই—"

গানের সুরে চঞ্চল হইয়া উঠে মন। আবেশভরা মধ্যাহ্ন। জয়া প্রীতি মাখা মৃদু হাত বুলায় বিশ্বজিতের চুলে। মধুময় হইযা উঠে মুহূর্তগুলি।

জয়া চায়ের জল ঢালে—তিন পেয়ালা চা।

কিন্তু সাতটার গাড়ী চলিয়া যায়, তবু প্রশান্ত আসে না।

বিশ্বজিৎ একটু উসখুস কবিতে থাকে, "আজকের সভায়ত ওবই বক্তৃতা দেবার কথা—কিছু হ'লই না কি ?"

জয়াও প্রশ্ন করে, "প্রশান্ত এখনও এল না ?"

এরই মধ্যে সংবাদ লইয়া আসে কল্যাণ, "প্রশান্তদা গ্রেপ্তার হ'য়েছে—আপত্তিজনক বক্তৃতা দেওয়ায়।"

একমুহূর্তে ম্লান হইয়া যায় জয়া। বিশ্বজিৎ শীগ্‌গীরই কলিকাতায় যাইবে, প্রশান্তও গ্রেপ্তার হইল—সে থাকিবে কি করিয়া এই বদ্ধপুরীতে।

বিশ্বজিৎ ঘুরিয়া আসে একটু। অবস্থা আশঙ্কাজনক মনে হইতেছে—কৃষাণ অফিসটা দেখিয়া রাখা দরকার। কল্যাণ আর বিশ্বজিৎ বাহির হইয়া যায়।

ফেরার পথে দূর হইতে কান্নার শব্দ কানে আসে। কেউ মারা গিয়াছে হয় তো। একটু আগাইয়া যায় বিশ্বজিৎ। শিবশঙ্কর রায়ের রায়ত, বংশীধরের ছেলে মারা গিয়াছে। ছেলেটা অমানুষ ছিল—অল্প বয়সেই মদ ধরে। তারই ফলে কঠিন দুরারোগ্য রোগ দেখা দেয় শরীরে। "এইত সেদিন বিয়ে করলো ছেলেটা—একেবারেই কচি বৌটা।" মন সজল হইয়া উঠে বিশ্বজিতের অদেখা অচেনা নাবালিকা সদ্যবিধবা বৌটির দুঃখে।

বাড়ী আসিয়াও শুনে, সেই একই আলোচনা চলিতেছে। ক্ষ্যান্ত বনলতাকে বলিতেছে, "বৌটাকে ত সেরকম কান্নাকাটি করতে দেখলাম না!"

চারুবালা বলে, "শুনলাম দত্তক নেবার অনুমতি লিখিয়ে রেখেছে ছেলেকে দিয়ে।"

একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বনলতা বলিয়া যায়, "আর নিজের পেটেই যখন ছেলে হয় নাই তখন দত্তক নিয়েই বা আর কি লাভ? নিজের সম্পত্তি নিজে খাও, দাও, বিলাও; মরলে পর বারভূতে খায়ও যদি—কেউ আর দেখতে আসবেনা। কাজেই পরের ছেলে পুষে' আর লাভ কি?"

বনলতা টের পায় বিশ্বজিৎ উপরে উঠিতেছে। ইচ্ছা করিয়াই একটু স্বর চড়াইয়া জোরে জোরে বলিতে থাকে, "পরের ছেলে কি কোনদিন আপন হয়? আপনার পেটের ছেলের মত দরদ পরের ছেলের কোন দিনই হ'তে পারে না।"

বিশ্বজিৎ উপর হইতে শুনে সব। বনলতার প্রতিটি কথা, প্রতিটি কথার সুর সে তলাইয়া দেখে। সে বোঝে, এ কথা মার নিজেরই মনের হাহাকারের প্রতিধ্বনি। বংশীধরের ছেলের বৌ উপলক্ষমাত্র।

কোন্ অপরিণত বয়সের কৃতকর্মের জন্য মা কি ঠিক এইভাবেই

অনুশোচনায় পুড়িয়া মরিতেছে। নিরুপায় সে। প্রাণের সম্পর্ক গড়িয়া উঠে নাই মার মনের সঙ্গে। নাড়ীতে নাড়ীতে আকর্ষণের বন্ধন সৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু সে দোষ কি তাহার? না মার মনের কর্ত্রীত্বপরায়ন ধনগরিমা? এই অভিসম্পাৎ ভরা জীবনের জন্য দায়ী কে? সে না—মা? না এই জরাগ্রস্থ সমাজ ব্যবস্থা?

বিশ্বজিৎ ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়ে। মাথাটা যেন অবশ হইয়া আসিতেছে চতুর্দিকের নানা চিন্তায় ও অশান্তিতে।

পরের দিন খুব ভোরে প্রশান্তর ঝাঁকুনিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। চমকিয়া উঠে বিশ্বজিৎ। প্রশান্ত হাসিয়া বলে, "বাপরে কি ভীষণ ঘুম!"

সে জামিনে খালাস পাইয়াছে—একমাস পর তাহার বিচারের তারিখ।

দুপুরবেলা সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। জয়া উপরে বারান্দায় বসিয়া পত্রিকাটা পড়িতেছে। নীচ হইতে একটা ভিখারী মেয়ের করুণ সুর ক্রমাগত কানে আসিতে থাকে, "মা চারটি ভিক্ষা দিবেন—মাগো একমুঠা ভাত দিবেন—"

জয়া পত্রিকাটা রাখিয়া উঠিয়া পড়ে। নীচে গিয়া ভাণ্ডার হইতে চাউল বাহির করিয়া ভিক্ষা দেয়, কিছু চিড়া মুড়িও আনিয়া দেয় ভাণ্ডার হইতে।

মনে মনে ভাবে—বেচারা এই দুপুর রদ্দুরে ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে অতটুকু কচি ছেলে লইয়া, এরপর কখন রান্না করিবে কখনই বা ওকে খাওয়াবে। ভাত দিতে পারিলে ভাল হইত। মধ্যাহ্নের রৌদ্র খাঁ খাঁ করে। উদাস মমতায় ভরিয়া উঠে শূন্য মন।

বনলতা লক্ষ্য করে, তাহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়াই ছেলের বৌ

ভাঁড়ার হইতে ভিক্ষা বাহির করিয়া দিল। মনের ভিতর খচ করিয়া উঠে। ছেলে এখন সাবালক; কর্ত্রীত্বত বৌর হাতেই চলিয়া যাইবে ধীরে ধীরে। তাহার নিজের হাতে গড়া সাজানো সংসারে তাহারই একমাত্র কর্ত্রীত্ব ছিল এতদিন। আজ বৌর হাতেই বুঝি সে কর্ত্রীত্ব চলিয়া যায়।

বিকালবেলা অকারণে উত্তপ্ত হইয়া উঠে বনলতা। কোন এক তৃতীয় ব্যাক্তির উদ্দেশে ক্রমাগত অসংলগ্নভাবে বকিতে থাকে।

"আমি এখন আদার ব্যাপারী, আমার আর এখন জাহাজের খবরে কি দরকার? সবাই স্বাধীন এখন—আমাকে কোন কিছুতে এতটুকু জিজ্ঞাসারও দরকার হয় না কারও। কিন্তু এ সম্পত্তি যে আমারই, সে কথা যেন কেউ ভুলে না যায়।"

জয়া বোঝে না শাশুড়ীর এ উত্তপ্ততার মূলে কে? কাহার উদ্দেশ্যে এ অন্তর্জ্বালা? স্তম্ভিত হইয়া সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনে সব।

এই কয়মাসেই পাড়ার গরীব মহলে জয়ার প্রশংসা ছড়াইয়া পড়ে, "এত যে বিদ্বান তা'ও একটু গরিমা নাই মনে। কেমন মায়া দয়া শরীরে।"

রাধা বষ্টুমী আসিয়া বনলতার স্তুতি আরম্ভ করে, "একখানা কাপড় দিবেন বৌঠান; শীত সামনে, গায়ে দিয়া বাচতাম। আপনার ছেলের শরীরে দয়ামায়া যেমন, আপনার বৌও হইছে তেমনই।"

বনলতা জ্বলিয়া উঠে মনে মনে 'ছেলের শরীরে দয়ামায়া? কিন্তু ছেলে বড় হইয়াছে কার টাকায় সে কথা ত একবারও বলে না!'

বনলতা ঝাজিয়া উঠে, "কাপড় টাপড় মিলবে না এখন। ছেলের শরীরে দয়া—তা' ছেলে কি আমাকে রোজগার করে টাকা পাঠায় যে এখানে দানছত্র খুলে বসবো?"

এই নিপীড়িত গ্রামবাসীর সঙ্গে বিশ্বজিতের যে নাড়ীর সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে, বনলতা সে খবর রাখে না। আভিজাত্যের গরিমায় গর্বিতা বনলতার চোখে শুধু মনিব আর প্রজার সম্পর্কটাই বড় করিয়া ধরা পড়ে।

অন্দরের পুকুর হইতে স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে ফেরে বনলতা। জয়া উপরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেখে। এই বয়সেও শাশুড়ীর কি রূপ! যেমন সুডোল গড়ন—তেমনি গায়েব রং। শ্রী যেন ফাটিয়া পড়ে। নিখুঁত সুন্দরী বলা চলে আজও। একপিঠ কালচুল; ধবধবে সাদা একখানা থান কাপড় পরনে—মাথায় সামান্য ঘোমটা।

নিরাভরণ দেহে কি অসামান্য লাবণ্য। জয়া মুগ্ধ হইয়া তাকাইয়া থাকে। মনটা ভিজিয়া উঠে। এই অসামান্য সৌন্দর্যের আড়ালে কি নিদারুণ ব্যর্থতার দাবানল!

রিক্ততার অভিশাপে পূর্ণ ভোগের পাত্র। মনের কোনায় সহানুভূতি ভরা করুণা জমাট বাঁধিয়া উঠে। শাশুড়ীর এই দিকটা ত সে কখনও ভাবিয়া দেখে নাই। কি নিদারুণ নিঃসঙ্গ জীবন! এত প্রাচুর্যের অহঙ্কারের আড়ালেও কত বঞ্চিত জীবন! একাকী জীবনেব কি করুণ অভিশাপ!

নূতন বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে—একটানা বৃষ্টির পর একটু গা ঢাকা রোদের ঝিলিক খেলে উঠানে। জয়া রেললাইনের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে।

এখনও ফিরিতেছে না বিশ্বজিৎ—কি জানি গ্রেপ্তারই হইল নাকি!

তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে চোখ ঝাপসা হইয়া আসে। দূরে মিছিলের মত কি একটা দেখা যায়। লাল পতাকার সারি।

কল্যাণের গলা শোনা যায়। গ্রামোফোনের 'চোঙ্' লইয়া সে স্লোগান দিতেছে—"সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হউক—ইনক্লাব জিন্দাবাদ!" কালীবাড়ীর মাঠে সভা হয়। দূব হইতে বক্তৃতা শোনা যায়, কিন্তু কথাগুলি ধরা যায় না; মাঝপথেই বাতাসে মিলাইয়া যায়।

কলিকাতায মেথর ষ্ট্রাইক আরম্ভ হইয়াছে। রাস্তায় আবর্জনার স্তূপ। দুর্গন্ধে টেকা যায় না। ট্রামে বাসে ভদ্রলোকদের মুখে শুধু ঐ এক কথা, "দেখছেন রাস্তার অবস্থা।"

"আর মশাই এ ভাবে বেশী দিন চললে যে কলেরা হ'য়ে মরবো দেখছি। মনে হ'চ্ছে, যেন নরক রাজ্যে বাস করছি।"

কোণের সিটের ভদ্রলোকটি যেন তাহার মনের ঘেন্না আর বিরক্তি প্রকাশ করার একটু সুযোগ পাইলেন, "সে আব বলবেন না মশাই; আমার বাড়ীর সামনে মস্ত এক 'ডাষ্ট্‌বিন' ফুলে উঠেছে। এমন নোংরা পদার্থ নেই পৃথিবীতে, যা' তা'তে নেই। দুর্গন্ধে বাড়ীতে টেকা দায়।"

মাঝে মাঝে আবার বৃষ্টি হইয়া রাস্তা জলে, আবর্জনায় একাকার। রাজপথের বুকের উপর নরককুণ্ডের বীভৎসতা নামিয়া আসিয়াছে। পচা গন্ধে যেন পেটের ভাত উল্টাইয়া আসে।

কেউ কেউ ফিস ফিস করিয়া বলাবলি করে, "কম্যুনিস্টদের চোট্ দেখেছো—একটা কাণ্ড করিয়ে ছাড়লো বটে।"

ঘরে গৃহিনীদের চাপা ক্রোধ আর বিক্তিতে ভদ্রলোকেরা অস্থির হইয়া

উঠে। "একটা বিহিত না করলে আর নয়। মেথর আসে না আজ সাতদিন হ'য়ে গেল। বাড়ীর নোংরা টিনের চারপাশটায় কি অবস্থা হ'য়ে উঠেছে—বর্ণনাতীত। কাকগুলির যন্ত্রণায় আরও অস্থির—নোংরা ছিটিয়ে একাকার। কেন, মিটিয়ে ফেললেই ত হয় মেথরদের সঙ্গে। মেথর ছাড়া কি সহরে থাকা চলে?"

প্রতি ঘরে, ট্রামে বাসে, পথে পথে, মোড়ে মোড়ে শুধু ঐ এক কথা—"মেথর ছাড়া আর চলে না।"

অমলেন্দুর ছোট ভাই বিজয় একটা নোংরা গলি ঠেলিয়া তাড়াতাড়ি হাটিতে থাকে। পায়ের তলায় কি যেন পচ্ পচ্ করিয়া উঠে—তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। মনে মনে খুশি সে, চারিদিকের এই আবর্জনা দেখিয়া। মনে মনে ভাবে—'বুঝুক ঠেলাটা।'

বাবুলালের ঘরে ঢুকিয়া দেখে অমলেন্দু, ইসমাইল, কানাইলাল আগেই আসিয়াছে।

বিজয় ঘরে ঢুকিয়াই খুশির সুরে বলে, "উঃ যা অবস্থা দেখে এলাম রাস্তায়; এবার আর কাবু না হ'য়ে পারছে না কর্পোরেশনের বাবুরা। দাঁড়াও পা'টা একটু ধুয়ে নি।" বিজয় স্ফূর্তির চোটে একটু কবিতাও আওড়ায় সুর করিয়া—"কে বলে মেথর তোমায় অস্পৃশ্য অশুচি।"

তাহার ছেলেমানুষী উচ্ছাস দেখিয়া সবাই হাসিয়া ফেলে।

সন্ধ্যা হইতে না হইতেই আই-বি, পুলিসে কাশীপুর বস্তিটা ভরিয়া যায়। হাবুলের বুড়া বাপ খাটিয়ার উপর বসিয়া বিড়ি টানে আর আড়চোখে দেখে পুলিসের চলাফেরা।

আজ কোনও তোয়াক্কাই করে না আর তাহাদের। মনের খুশির আমেজ গোঁফের ভিতর দিয়াও যেন ফাটিয়া পড়িতে চায়।

আই-বির লোকটি আসিয়া খোঁজ করে, "রমেনবাবু কোথায় রে?"

হাবুলের বাপ নির্লিপ্ত সুরেই উত্তর দেয়, "আমি কি করে জানবো সে বাবু কোথায় ?"

আই-বির লোকটি মনে মনে ভাবে, 'শালার কথা বলার কি ধরন—যেন লায়েক হ'য়ে উঠেছে এ দু'দিনেই।'

এরই মধ্যে হাবুল আসিয়া বসে খাটিয়ার উপর। হাবুল ষ্ট্রাইক কমিটির ভলাণ্টিয়ার।

অদূরে একটা টিউবওয়েল হইতে জল পাম্প করে হাবুলের বৌ। সারাটা দিন সে অবসর আজ। গ্যাসবাতির ঝাপসা আলোতে বস্তির ভূতুরে অন্ধকার দূর হয়না। দুপুর বেলায় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। একটা ভাপসা গন্ধ বাহির হয় আলো-বাতাসহীন সরু গলিটার ভিতর হইতে। "কিরে ওদিকে কেমন দেখে এলি ?" হাবুলের বাপ জিজ্ঞাসা করে।

"উঃ যা জমে উঠেছে। কিন্তু কথা হচ্ছে ভদ্রলোক বাবুরা যে ময়লা সাফ করতে লেগে গিয়েছে দেখে এলাম।"

আরও চার পাঁচজন আসিয়া বসে। সকলেই চিন্তিত হইয়া উঠে হাবুলের কথা শুনিয়া।

সিভিক গার্ড দিয়া রাস্তা পরিস্কার করা হইতেছে বড় বড় রাস্তাগুলিতে।

ট্রাম বাসে আবার চাপা গুঞ্জন আরম্ভ হয়। "ভদ্রলোকের ছেলে সব, তাদের দিয়ে ঝাড়ুদারের কাজ করান হ'চ্ছে। আরও কতই যে দেখতে বাকী আছে জীবনে।"

কেহ কেহ মনে মনে একটু আমোদ অনুভব করে উহাতে।

পাড়ায় পাড়ায় বাড়ীর ছেলেরা নোংরা পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করে—না হইলে আর টেকা যায় না। কেহ কেহ মন্তব্য করে, "এভাবে আর কদিন বা চলতে পারে ? একটা মিটমাট করাই উচিত।"

এরই মধ্যে আবার আরেকটা কাল আশঙ্কায় ঘরে বাইরে সকলের মন শঙ্কিত হইয়া উঠে। "সর্বনাশ একেই এই অবস্থা, এর উপর জল না এলে কি ভয়ানক কথা! পাম্পওয়ালারাও নাকি স্ট্রাইক করবে শোনা যাচ্ছে।"

কাশীপুর নাইটস্কুলের ঘর হইতে স্কোয়াড বাহির হয়। বিজয় অমলেন্দু শুভা আর ইসমাইল সন্ধ্যাবেলা নাইটস্কুলে জড়ো হয়। হাবুল, কানাইলাল ও পটু আগেই আসিয়াছে।

কানাইলাল চাঁদারখাতাটা হাতে লইয়া বলে, "দর্জিপাড়ার চাঁদা তোলাটা আজই সেরে আসতে হবে কিন্তু।"

সবাই বাহির হইয়া পড়ে লিফলেটের বাণ্ডিল হাতে। রামকানাই ঘর হইতে বাহির হয় খইনি টিপিতে টিপিতে। মুখে অবিশ্বাসমিশ্রিত অনাসক্ত ভাব। ইসমাইল জিজ্ঞাসা করে, "কি ভাই তোমাকে কয়দিন যাবৎ দেখিনা যে?"

রামকানাই নির্লিপ্তস্বরে উত্তর দেয়, "আর কি হ'বে! কতই দেখলাম! শেষে বাবুরা ঘুষ খেয়েই মিটিয়ে ফেলে সব। শেষ পর্যন্ত কিছুই হয় না।"

অমলেন্দু বুঝাইয়া বলে, "তোমরা যদি নিজেদের কাজের দায়িত্ব নিজেরা না বোঝ; শুধু বাবুদের উপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে বসে থাক, তবে বাবুরাত ঠকাবেই। তোমরাই ত দেখবে বাবুরা ঠিকভাবে যাচ্ছে কি না। পেছনে যদি তোমাদের চাপ থাকে, তাহলে বাবুদের সাধ্য নাই তোমাদের বিপক্ষে সব মিটিয়ে ফেলতে পারে।"

রামকানাই মাথা নাড়ে, "তা' অবশ্য ঠিক।" কিন্তু তাহার সংশয় তবু দূর হয় না।

রামকানাইর বাড়ী হইতে সবাই টালার পুলের মাঠে জড়ো হয়। সেখানে ইতিমধ্যেই আরও অনেক আসিয়াছে।

রমেন রায় হিন্দিতে বক্তৃতা দেয়। মুক শ্রোতার দল। মনের মধ্যে আশা ও আশঙ্কার ভীড়।

রমেন বলিতে আরম্ভ করে ঃ—

"ভাইয়ো আজ তুমহার সামনে যো সওয়াল আয়া ও সওয়াল তোমাহারা খোদ রুটিকো সওয়াল, তোমহারা জেনানাকো পিহ্‌নেকো, সওয়াল। তোমহারা ইউনিয়নসে হরতালকা যো রায় নিয়া তব রায় খাস ধাঙ্গর মুজদরকা রায়। পিছুঁমে খাস কোলকাত্তা কা জনতা মদত দেতেহেঁ। তোম্‌হাঁরা উপর মে লাঠি চল শকতি' গুলি ভি চল শকতি লেকিন তোমহারা রায় এক রায় ওসকে ওয়াস্তে তোম সব জান কুবলকিয়া হায় তোমহারা কোরবাণী বিফল না হোয়ে।"

কাশীপুর বস্তি। সকাল হইতে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়িতেছে। সোহনসিং আর কানাইলাল ভোরে উঠিয়াই পাড়াটা ঘুরিয়া আসে।

"ভাইসব কাজ কামাই চলবে আরও সাতদিন।" এখনও মিটমাট কিছু হয় নাই। বৃদ্ধদের চোখে মুখে শঙ্কা ফুটিয়া উঠে কি হইবে শেষ পর্যন্ত কে জানে। কম বয়সের ছেলেদের রক্তে চাঞ্চল্য।

"মিট মাট না করে উপায় কি?" চাপা হাসি খেলিয়া যায় বিদ্রূপ-মাখান পুরু ঠোট।

সন্ধ্যা হয় হয়। হাবুল তাড়ির দোকানটার পাশ দিয়া একটু ঘুরিয়া আসে। একটা বিড়ি কিনিতে বাহির হয় সে। তালগাছটার মোড়ে আসিতেই একটা পুলিসে বাধা দেয়, "এই উল্লুক কাঁহা যাতা।" হাবুল গালাগালি শুনিয়া চটিয়া যায় মনে মনে।

আরেকটা গলি দিয়া বাহির হইতে যায়। সেখানেও পুলিস বাধা দেয়, হাতে বন্দুক। পেছন হইতে কানে আসে, "শালা ষ্ট্রাইক করে?" ভীত হইয়া উঠে সে মনে মনে, 'ব্যাপার কি!' মুহূর্তের মধ্যে অদূরে গুলির শব্দ কানে আসে। চঞ্চল হইয়া তাড়াতাড়ি পা চালায় হাবুল।

অফিস ঘরের সামনে জড়ো হইয়াছে সকলে—মিটিং ডাকা হইয়াছে। রোয়াকের উপর বসিয়া জটলা করে যুবকের দল—কর্পোরেসন এবার আর মজুরী না বাড়াইয়া পারিবেনা কিছুতেই।

হঠাৎ চুপ হইয়া যায় সকলে। চমকিয়া সভয়ে তাকায়। আবছা-আলোতে অস্পষ্ট মূর্তিগুলি পাগড়ি মাথায় নড়াচড়া করে। মুহূর্তে পুলিস কনেষ্টবলে ভরিয়া যায় গলিটা। কিছু বুঝিবার আগেই গুলি চলে।

গুলি ছোটে। দিশাহারা মেথর বস্তিটা। এলোমেলো ছত্রভঙ্গ হইয়া প্রাণপণে ছুটাছুটি করে সকলে। সর্বনাশ! পুলিস গুলি আরম্ভ করিয়াছে। কানাইর বড় ছেলেটা গলির মোড়ে খেলা করিতেছে এখনও ঘরে ফেরে নাই। ব্যস্ত হইয়া ছোটে কানাইর বৌ, "ভজুয়া ও ভজুয়া।"

হঠাৎ একটা কি যেন ঢুকিয়া যায় পেটের মধ্যে। "উঃ মাগো," বলিয়া উপুড় হইয়া পড়ে কলতলার উপর। রক্তে ভাসিয়া যায় কলতলাটা। রক্তের গঙ্গা।

আরেকটা বুড়ো নরদমার মধ্যে ঢলিয়া পড়ে। বারুদের গন্ধে, ধুঁয়ায় ভরিয়া যায় ঘুপসী গলিটা। বিভ্রান্ত মেয়ে পুরুষ। গলির মোড়ে মোড়ে বন্দুকধারী পুলিস মোতায়েন। বাহির হইবার পথ নাই।

সারাদিনের পরিশ্রমের পর শ্রান্তদেহে ঘরে ফেরে অমলেন্দু। সিড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে চিঠির বাক্সটা খুলিয়া দেখে। একটু চিন্তিত হইয়া উঠে

আশায উদগ্রীব মন, "আজও আসিল না নমিতাব চিঠি। অসুখ বিসুখই কবিল নাকি ?"

ঘবে ঢুকিয়া মাতুরটাব উপব দেহ এলাইয়া দেয়।

নমিতা শ্রীবামপুবে একটা স্কুলে শিক্ষিকাব কাজ কবিতেছে। তাহাব বাবা মেযেব সঙ্গে আব সম্পর্ক বাখেন না। অমলেন্দু শুইয়া শুইয়া ভাবে নমিতাব কথা। আজন্ম আদবে প্রতিপালিত সে—কিসেব আকর্ষণে আজ এ দুঃখ, কষ্ট স্বেচ্ছায় মাথা পাতিয়া গ্রহণ কবিল। এ শ্রদ্ধাব দানেব মর্যাদা সে দিতে পাবিবে ত ?

পনেব মিনিটও কাটে না—দুয়াবে কড়া নাড়াব শব্দে সে উঠিযা পড়ে।

সোহনসিং ও ইসমাইল ঘবে ঢোকে। তাহাবা সংবাদ লইযা আসিযাছে—কাশীপুবে গুলি চালান হইযাছে, কয়েকজন আহত হইয়াছে, কানাইব বৌব অবস্থা খাবাপ।

অমলেন্দু বাহিব হইযা যায।

লোহাব পুলেব তলায কতকগুলি লোক জটলা কবিতেছে—চোখে-মুখে দিশাহাবা শঙ্কা। গলিব মোড়ে মোড়ে উদভ্রান্ত চঞ্চলতা।

একজন বলিয়া উঠে, "বেশ কবেছে ছোটু। আবও দু'এক ঘা লাগিযে দিলেই হ'ত শালা পুলিসকে।"

একজন বৃদ্ধ লোক গম্ভীব হইযা বলে, "কিন্তু এব ফল যে কোথায দাঁড়াবে সেটাই ভাবনাব কথা।"

অমলেন্দুকে দেখিযা সকলে ঘিবিযা দাঁড়ায। "গুলিব কথা শুনেছেন ? কানাইব বৌব অবস্থা সাংঘাতিক—কপালে লেগেছে গুলি।"

কেহ বলে, "না, কপালে কিসেব। আমি নিজে দেখে এলাম পেটের কাপড় রক্তে ভিজে গিযেছে।"

অমলেন্দু চিন্তিত হইয়া প্রশ্ন করে, "আব কে কে জখম হয়েছে ?"

তাহারা অনেকগুলি নাম বলিয়া যায় একসঙ্গে।

অমলেন্দু কানাইলালের ঘরে যায়। কানাইলাল এইমাত্র হাসপাতাল হইতে ফিরিয়াছে। তাহাকে দেখিয়াই চোখ ছলছল করিয়া উঠে, "বৌটা হয় তো বাঁচবে না বাবু। সাংঘাতিক রক্ত পড়ছে দেখে এলাম।"

চিন্তিত সুরে প্রশ্ন করে অমলেন্দু, "জ্ঞান আছে?"

"হ্যাঁ বাবু—কথা কইছিল।"

ঘরের মধ্যে এক মাসের একটি শিশু পড়িয়া ট্যাঁ ট্যাঁ করিতেছে। বাকি ছেলেপুলেগুলি কতকগুলি বাসী রুটি লইয়া চিবাইতেছে।

অমলেন্দুর মন শিশুগুলির জন্য মমতায় ভরিয়া উঠে। মনে মনে ভাবে, "বৌটা যদি নাই বা বাঁচে!"

মুখে বলে, "আমি এক্ষুনি হাসপাতালে যাচ্ছি। তুমি চিন্তা করো না। আর এক কাজ কর। ছোট ছেলেটাকে হাবুলের বৌর কাছে রেখে এস। এভাবে ত আর অতটুকু ছেলে থাকতে পাবে না।"

অমলেন্দু হাসপাতালে চলিয়া যায়।

ঝোপের মধ্য হইতে একটা 'বৌ-কথা-কও' পাখী সমানে ডাকিয়া চলিয়াছে—বৌ-কথা-কও, বৌ-কথা কও।

জয়া ঘুম হইতে চোখ মেলিয়াই শুনে, আবেগ মাখান ছোট্ট দুইটি কথা—বৌ-কথা-কও। বিহঙ্গ দয়িতের অভিমান ভাঙ্গানর কি অপরূপ আকুলতা।

তাহার প্রেমাকুল মন এক অবুঝ ব্যথায় ভারী হইয়া উঠে প্রিয়জনের স্পর্শ কামনায়। গভীর প্রেমে জয়া মনে মনে আকুল হইয়া ডাকে তাহাব

প্রিয়তমকে। বুকের মধ্যে উপলব্ধি করে প্রিয় সান্নিধ্য। কেন যে সে স্বামীকে ক্ষত বিক্ষত করে উপেক্ষা অনাদর তাচ্ছিল্য দিয়া। তাহার ব্যবহার রূঢ় হইতে রূঢ়তর হইয়া উঠে। কিন্তু কেন? তাহাকে আঘাত দিয়া সে-আঘাত ত নিজের বুকেই ফিরিয়া আসে দ্বিগুণ ভারী হইয়া; তবু সে তাহাকে আঘাত না দিয়া পারে না। জয়া বুঝে না কেন এমন হয়।

এক অলস ব্যথাতুর চিন্তাসূত্র লইয়া তাহার সমস্তটা দিন কাটে। কোনও কাজে উৎসাহ নাই। অনাসক্ত মন লইয়া কর্তব্য কাজ করিয়া যায় সে।

এই প্রাচীন বংশের আভিজাত্যকে ঠেলিয়া নিজেকে বিশ্বের মাঝে জনতার মাঝে লুটাইয়া দেয়, এমন শক্তি তাহার নাই।

দিন দিনই সে নিস্তেজ, নিস্পৃহ হইয়া পড়িতেছে। এদের সে সহ্য করিয়া যায়। কিন্তু তাহাব অন্তরাত্মা এদের মর্যাদাকে স্বীকার করিতে পারে না।

জয়া বুঝিয়া উঠে না—এর শেষ কোথায়। নিজেকে এই তিল তিল করিয়া হত্যা করা আবও কতকাল চলিবে?

কিন্তু আজ ঘুম হইতে জাগিয়াই নূতন এক সুর যেন তাহার মনে দোলা দিয়া যায়। আজ সে একেবাবে নিবিড় করিয়', একান্ত করিয়া পাইতে চায় স্বামীকে।

বিশ্বজিৎ আজ সাতদিন বাড়ী নাই। জয়া মনে মনে ভাবিয়া রাখে, বিশ্বজিৎ ফিরিয়া আসিলে সে আর তাহাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিবে না। তাহার নারী হৃদয়ের সমস্ত কোমলতা দিয়া সে তাহাকে ঘিরিয়া রাখিবে।

সেইদিনই রাত্রির গাড়ীতে বিশ্বজিৎ বাড়ী ফেরে। জয়া তখনও

জাগিয়া। বিশ্বজিৎ অবাক হইয়া বলে, "এ কি এখনও ঘুমাও নাই ? এত রাত হয়েছে !"

জয়া একটু হাসিয়া বলে, "ভাবছিলাম তুমি হয় তো আসবে।"

বিশ্বজিৎ হাসে একটু তাহার কথা শুনিয়া—বিষণ্ণ, মৌন হাসি। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ও ক্লান্তিতে অবসন্ন দেহ। বিছানায় শুইবামাত্র সে ঘুমাইয়া পড়ে।

জয়া কত কি যে বলিবে ভাবিয়া রাখিয়াছিল কিছুই বলিতে পারিল না। কিসে যেন বাধা দেয় নিজেও বুঝিতে পারে না। কে যেন স্মরণ করাইয়া দেয় নিজের আত্মচেতনাবোধ।

জয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া জানালা দিয়া অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া থাকে। গভীর রাত্রি। প্রহর-জাগা পাখীগুলি ডাকিয়া উঠে সমস্বরে। বিশ্বজিৎ গাঢ় ঘুমে অচেতন।

জয়ার অভিমান হয়—প্রচণ্ড দুঃখ হয়। বিশ্বজিৎ কেন তাহাকেও তাহাব কাজের দায়িত্বের অংশ দেয় না। সে ত শুধু বন্দিনী প্রিয়া হইতে চায় নাই।

পরের দিন ভোরে জয়া চা লইয়া আসে। বিশ্বজিৎ তন্ময় হইয়া কি যেন ভাবিতেছে। জয়া আসিয়া চায়ের পেয়ালা ও খাবার সামনে রাখে, বিশ্বজিৎ তখনও কি চিন্তাই করিতেছে।

জয়া তাকাইয়া দেখে—তাহার চোখের কোণায় একটা ম্লান ছায়া পড়িয়াছে। তাহার অলক্ষ্যে সে একখানি হাত রাখে স্বামীর কাঁধের উপর।

কোমল সহানুভূতি ভরা মৃদু স্পর্শে বিশ্বজিতের চমক ভাঙ্গে।

জয়া!" গভীর আবেগে সে জয়ার হাতটা ধরিয়া বলে, "জয়া, এত দূরে দূরে থাক কেন তুমি ?"

জয়ার চোখে যেন অভিমানের বন্যা নামিয়া আসিতে চায়। প্রাণপণ শক্তিতে সে নিজেকে সংযত করিয়া বলে, "কি এত ভাব দিনরাত ? এ ভাবে ত বেশীদিন আর বাঁচবে না।'

"নারে, সে ভয় নাই তুমি থাকতে।" বিশ্বজিৎ মৃদু হাসিয়া বলে।

জয়া কোন কথা বলিতে পারে না। অবোলা কথা ধরা দেয় প্রেমার্ত চোখে।

বিশ্বজিৎ তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া নিবিড় চুম্বন করে। "অমন চুপ করে থেকো না জয়া—কথা কও।"

ঘরের উপর দিয়া বৌ-কথা-কও পাখীটা আকাশ ফাটাইয়া ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া যায়—"বৌ-কথা-কও—বৌ-কথা-কও।"

সমস্তটা দিন একটা মধুর আবেশে কাটিয়া যায় দুইজনের।

বিকালের ট্রেনে অমলেন্দু ও শান্তা আসে। পরের দিনের ছাত্রসভায় তাদের আমন্ত্রণ করা হইয়াছে।

বিশ্বজিৎ খুশি হইয়া বলে, "আমি ভাবিইনি, তুমিও আসতে পারবে শান্তাদি !"

উল্লাসিত হইয়া সে জয়াকে সংবাদ দেয়, "শান্তাদি এসেছে—চলো তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেই।"

জয়া মৃদুস্বরে বলে, "তুমি বস গিয়ে। আমার একটু কাজ আছে এখন। সেরে নেই আগে।"

উহাদের সান্ধ্যআসর সরগরম হইয়া উঠে পাশের ঘরে।

জয়া শুনে নূতন আসা মেয়েটি বলিতেছে, "বিশ্ব তোমার বৌ দেখাবেনা। শুনলাম খুব নাকি লক্ষ্মী বৌ।"

"বৌ দেখাবেনা !"—জয়া একটু স্তম্ভিত হয় মনে মনে শান্তার কথা

বলার সুরে। কেমন একটা অবজ্ঞা মিশ্রিত কথার সুর।

জয়া মনে মনে অবাক হইয়া ভাবে, 'উহারাই না স্ত্রীপুরুষ সকলের সমান মর্যাদার বিশ্বাসী।' কি ভাবিয়া সে চাকরের হাতেই চায়ের ট্রে, খাবার, মশলা সব নিপুনভাবে সাজাইয়া পাঠাইয়া দেয় পাশের ঘরে।

বিশ্বজিৎ বিস্মিত হয় জয়ার এই নির্লিপ্ত আতিথ্যে। শান্তা আবারও বলে, "কৈ হে—তোমার বৌ ত দেখালে না! খুব পর্দা বুঝি?"

বিশ্বজিৎ গিয়া জয়াকে বলে, "জয়া চল একটু চরে বেড়িয়ে আসি, জোস্নারাত আছে। ওদের সঙ্গে পরিচয়ও হবে।" তাহার মন হইতে সকালের মধুরস্মৃতির রেশটুকু তখনও কাটে নাই। জয়া মনে মনে ব্যঙ্গ করিয়া প্রতিধ্বনি করে স্বামীর কথাটা, 'পরিচয়!'

মুখে গম্ভীর হইয়া শুধু বলে, "না"। তাহার কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতা বিশ্বজিৎ লক্ষ্য করে, তবু আবারও বলে, "না কেন? চল না!"

জয়ার কণ্ঠস্বরে আরও দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠে। কি একটু ভাবিয়া আরও ক্রুর ভঙ্গীতে উত্তর দেয় সে, "নিষ্প্রয়োজন, তাই, না? বন্ধুদের বুঝি দেখান চাই বৌকে তুমি সমান অধিকারই দিয়েছ—ঘরেব মধ্যে বন্দী করে রাখনি।"

বিশ্বজিৎ আহত হয় জয়াব কথা শুনিয়া; তবু সংযতসুরে বলে, "সমান অধিকার কেউ দিতে পারেনা, জয়া—সেটা নিজেকেই করে নিতে হয়।"

—"তারই চেষ্টা করবো আজ হ'তে।"

বিশ্বজিৎ ব্যথিত হইয়া বাহির হইয়া যায়। তাহাব পায়ের শব্দ মিলাইয়া যায়। জয়া চুপ হইয়া ভাবিতে থাকে কেন এমন হয়।

সকালের মধুর স্মৃতি তিক্ত হইয়া উঠে। জয়া সহ্য করিতে পারেনা এদের। তাহার নিজের দাদাও ত বিপ্লবী। সেই সম্পর্কে কত

দেশপ্রেমিক ছেলে গোপনে তাহাদের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়াছে। তাহার কিশোরী মনের সরল বিশ্বাসে সে তাহাদের শ্রদ্ধা করিয়াছে।

বীরের দল! তন্ময় হইয়া সে তাহাদের কথা শুনিত। এক অজানা আশঙ্কায় বুক টিপ টিপ করিত। আর আজ, দিনের পব দিন, সে শুধু নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া চলিয়াছে।

এই বাড়ীব সমস্ত আবহাওয়া বিষাক্ত লাগে তাহার; তবু উহাকেই চরম সত্য বলিয়া স্বীকাব কবিয়া লইতে হইবে।

তাহার বাল্যেব জীবন—সরল ঐশ্বর্যে ভরপুব—মমতায় ভরা স্নিগ্ধ সবুজ মাঠ খানি। কোথায় হারাইয়া গেল সে জীবন। জয়ার চোখ জলে ভরিয়া উঠে। জয়া কাঁদিতে চায়—প্রাণ ভরিয়া সে কাঁদিবে। এ ভাবে নিজের দৈন্যকে হাসিমুখে আর বরণ করিয়া লইতে পাবেনা সে।

জয়া জানে এঘরে এখন আর কেহই ঢুকিবে না। তাহার স্বামী হয়তো এখন নবাগতদের সহিত কোনও বস্তিব মাটিব ঘবে বসিয়া ভবিষ্যতের সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত।

খাটের উপর মুখ গুজিয়া কাঁদে জয়া। কাঁদিয়া নিজেকে হালকা করিতে চায় সে।

হঠাৎ টের পায় মাথাব উপর এক স্নেহাতুব হাতেব স্পর্শ। মাথা তুলিয়া দেখে প্রশান্ত দাঁড়াইয়া। স্মিতহাসিদ্বাবা সম্বর্দ্ধনা করে তাহাকে, কিন্তু আর কিছু বলিতে পারে না।

"কাঁদছিল কেন বলত? এরই মধ্যে মান অভিমান?" প্রশান্ত হাসি ঠাট্টা দিয়া সহজ কবিতে চায় তাহাকে। কিন্তু জয়ার ম্লানদৃষ্টির দিকে ভাল করিয়া তাকাহয়া বুঝিতে পারে—এ শুধু সামান্য বা সাময়িক কোনও কারণে ক্ষণিক চোখের জল নয়।

প্রশান্ত চুপ হইয়া যায়।

অল্পক্ষণের মধ্যেই জয়া নিজেকে সংযত করিয়া বলে, "প্রশান্ত তোমার কি কোন কাজ আছে এখন ? একটু চরে বেড়াতে যাবে ?"

প্রশান্ত অবাক হয় এ অনুরোধে ; কিন্তু অস্বীকার করিতে পারেনা।

"একটু বসো, আমি মাকে বলে আসছি।" জয়া উঠিয়া যায়। প্রশান্ত বসিয়া বসিয়া ভাবিতে থাকে জয়ার কথা।

সে জানে, কি অভিমানী মন জয়ার। তিলে তিলে নিজেকে নিঃশেষ করিবে তবু তাহার অভিযোগ মুখ ফুটিয়া কাহাকেও জানাইবেনা।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই জয়া খাবারের রেকাব ও চা লইয়া উপস্থিত হয়। প্রশান্ত হাসিয়া বলে, "কি বেড়াতে যাবার পারমিস্‌ন বুঝি মিললো না। তাই হাসিমুখের বদলে মিষ্টিমুখ দিয়েই বিদায় ?"

জয়াও হাসিয়া বলে, "না, সে ভয় নেই। ভাগ্য সুপ্রসন্ন। তাড়াতাড়ি শেষ করে নাও—আমি কিন্তু রেডি।"

"কি বললে মাসীমাকে ?"

"বল্‌লাম প্রশান্ত ঠাকুর-পো খুব অনুরোধ করছিলেন চরে বেড়াতে যাবার জন্য।"

প্রশান্ত দুষ্টুমি করিয়া ভয় দেখায়, "exploitation everywhere দাঁড়াও আমি মাসীমাকে সব ফাঁক করে দেব।"

দুজনে নীচে নামিয়া আসে।

যাইবার সময় প্রশান্তকে তাহার মাসীমা বলিয়া দেয়, "দেরি করোনা বেশি—যা দিনকাল—আর ফেরবার সময় যোগীন মাঝিকে ব'লো, হারিকেন দিয়ে যেন পৌঁছে দেয়।"

প্রশান্ত হাসিয়া বলে, "জ্যোস্নারাতেও হারিকেন লাগবে তোমার বৌর ? ভয় নাই মাসীমা বৌকে তোমার অক্ষতই পৌঁছে দিয়ে যাব।"

রাস্তায় আসিয়া জয়া একটু দম লইবার সুযোগ পায়। বিয়ের পর

এই প্রথম সে রাস্তায় স্বাধীনভাবে বাহির হইল। ইহার আগে বাড়ীর অন্যান্য সকলের সঙ্গে জ্যোৎস্নারাতে যমুনার চরে বেড়াইতে একবার মাত্র সে আসিয়াছিল। আগে পিছে বাড়ীর চাকর, তারপর বাবুরা, তাহাদের মধ্যে সাজসজ্জা গয়না ইত্যাদিতে জড়সড় হইয়া ঘোমটা টানিয়া সান্ধ্যভ্রমন করার পেছনেও যে আভিজাত্যের দম্ভ ফুটিযা উঠে, উহাতে জয়ার সমস্ত মন তাহার সাম্যবাদী স্বামীর প্রতি প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপে কশাঘাতই শুধু করিতে থাকে। আর কিছু আনন্দই সে পায় নাই সেই দিন।

তাই উহার পর যতবার বাড়ীর মেয়েরা চরে বেড়াইতে গিয়াছে জয়া শরীর খারাপের ছল করিয়া বাড়ীতেই রহিয়াছে।

শাশুড়ী উহাতে মনে মনে খুশিই হন, জয়া তাহা টের পায়।

তাই আজ প্রশান্তর নাম করিয়া অনুমতি চাহিয়াছিল। জয়া জানিত, প্রশান্তকে তাহার মাসীমা কতখানি স্নেহ করেন। একমাত্র তাহারই আবদার রক্ষা করিতে তিনি নিজের সংস্কার বদ্ধ মর্যাদাকে কিছুটা শিথিল করিতে পারেন।

রেল লাইনের ধার দিয়া ঘাসে ঢাকা পথ। দুইদিকে অনাবৃত মুক্ত তৃণক্ষেত। মুহূর্তের মধ্যে জয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া যায়।

মনে মনে সে বারে বারে উচ্চারণ করিয়া উঠে, 'উঃ কি সুন্দর, কি অপরূপ সুন্দর!'

দ্রুত পায়ে হাটে সে, অনাবিল আনন্দে আত্মহারা বালিকার মত। মাথার ঘোমটা খসিয়া যায়—তাহার খেয়াল থাকেনা। অনতিদূরেই যমুনার চর দেখা যায়।

জয়া আবেশে মৌন হইয়া পড়ে। প্রশান্তও তাহা লক্ষ্য করে। মনে মনে খুশি হয়, জয়াকে একটু আনন্দ দিতে পারিয়াছে ভাবিয়া। তাহার

মত কল্পনাবিলাসী মেয়ের পক্ষে জমিদার বাড়ীর প্রাচীন গণ্ডীর ভিতর দিন কাটানর কষ্ট সে বুঝিতে পারে।

সে দোষ দেয় বিশ্বজিৎকে—তাহার দুর্বলতাকে।

তাহারা চরে আসিয়া পৌছায়। চরের কিছু অংশ জলের তলায়। পায়ের পাতা ভেজা জল—তাহারা হাটিয়াই পার হয়।

সাদা চরটা জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গিয়াছে। এত সৌন্দর্য, এত অপরূপ সৌন্দর্য জয়া প্রাণ ভরিয়া ভোগ করিতে চায়। স্বামীর প্রতি সমস্ত ক্ষুব্ধ অভিযোগ একনিমেষে বিলীন হইয়া যায়।

না—আর সে কৃপণের মত হিসাব নিকাশ করিবেনা। বিশ্বজিৎকে যদি সে এখন এই মুহূর্তে পাইত—নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করিয়া সে বলিত, "প্রিয় তুমি অনুপম।"

হয়তো কিছুই বলিতে পারিত না। তবু তাহার অন্তরাত্মা হইতে কে যেন উচ্চারণ করে বারে বারে, 'প্রিয় তুমি প্রিয় আমার।' চরটার ঠিক মাঝখানে আসিয়া পড়ে তাহারা। হঠাৎ জয়ার চোখে পড়ে দূরে ঠিক জলের কিনারায় বসিয়া দুইটি অস্পষ্ট নরনারীর মূর্তি।

একমুহূর্তে চিনিয়া ফেলে বিশ্বজিৎকে। তাহার কোলের উপর মাথা দিয়া শুইয়া হয়তো শান্তাদি। জয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া চলে, কিন্তু মনের কোন এক স্তরে একটা অবোঝা অস্পষ্ট বেদনার চাপ অনুভব করে। জয়া বুঝিতে পারে না—কি যেন কি তাহাকে ম্লান করিয়া দিয়া গেল।

প্রশান্তও বিশ্বকে দেখিয়া খুশি হইয়া উঠে—কিন্তু কাছে আসিয়া অপরিচিতাকে দেখিয়া একটু আড়ষ্ট হইয়া পড়ে নিজের অলক্ষ্যে।

বিশ্বজিৎ প্রশান্তর আড়ষ্টভাব লক্ষ্য করিয়া বলে, "শান্তাদিকে চিনিস না তুই। কালকের সভার সভানেত্রী।"

জয়া বসিয়া পড়িয়াছে বালুর উপর। প্রশান্তকে একটু ঠেলা দিয়া বলে, "এমন সুন্দর রাতটুকু আর কালকের সভার কর্মতালিকা দিয়ে মাটি করো না—দোহাই প্রশান্ত। তার চাইতে একটা গান শুনাও।"

প্রশান্ত বুঝিল তীরটা কাহাকে লক্ষ্য করিয়া ছোড়া হইল।

শান্তা জয়ার কথা শুনিয়া বিশ্বকে প্রশ্ন করে, "জয়া বুঝি সংসার নিয়েই ব্যস্ত। তা'কেও কাজের ভিতব নামাও না কেন, বিশ্ব?"

বিশ্বজিৎ মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠে। সে জানে, আত্মসচেতন জয়ার অহমিকায় কতখানি আঘাত পড়িতেছে।

হয়তো আবাব কি একটা বলিয়া বসিবে জয়া। তাই বিশ্বজিৎ শান্তাদিব কথাব জবাব না দিয়া একটু জোর দিয়াই অনুরোধ করে প্রশান্তকে, "একটা গানই শুনাও, প্রশান্ত।"

জয়া উৎসুক হইয়াছিল, শান্তাদির প্রশ্নে বিশ্বজিতের উত্তরটা শুনিবার জন্য। কিন্তু সে লক্ষ্য কবিল, বিশ্বজিৎ প্রশ্নটা এড়াইয়া গেল। মনে মনে আহত হয় জয়া।

সেও একটু বিদ্রূপমিশ্রিত সুরেই প্রশান্তকে বলে, "এমন গান শুনিও প্রশান্ত, যে গানে মানসিক বিলাসীতার প্রশ্রয় না পায়।"

প্রশান্ত ঠিক করিয়া আসিয়াছিল, চরে আসিয়া জয়াকে গান শুনাইবে, তাহার প্রিয় গানটি। জয়া যে গান শুনিতে কত ভালবাসে, তাহা তাহার অজানা নয়।

প্রশান্ত বুঝিয়াছে, এই পরিবারে জয়া নিজেকে মানাইয়া নিতে পারে নাই মন হইতে; জয়া সুখী হয় নাই। তাই গান দিয়া ক্ষণিকের জন্য তাহাকে জীবন্ত করিয়া তুলিতে চায় সেও।

কিন্তু অর্ডার দেওয়া গান গাওয়া তাহার স্বভাব নয়। আর সে

স্পৃহাও আর তাহার রহিলনা। তাই সে আপত্তি জানায়, "গান আজ থাক বিশ্বদা।"

শান্তাও হাসিয়া বলিয়া ফেলে, "সেই ভাল, অত কবিত্বে আমার মাথা ধরে যায়। এবার উঠা যাক, বিশ্ব, ওরা সবাই হয়তো আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।" তাহারা উঠিয়া পড়ে।

জয়া প্রশান্তর হাত ধরিয়া টানিয়া বসায়, "তোমারত আর কাজ নেই, তুমি একটু বসইনা বাপু।"

এই প্রথম জয়া এ বাড়ীর প্রচলিত প্রথা অমান্য করিতেছে। এই লইয়া বাড়ীতে আলোচনা হইবে জয়া জানিত। বিশ্বজিতের সবচাইতে বড় দুর্বলতা কোথায়—তাহা ত সে জানে। মায়ের অন্যায় অভিযোগে সে যে কোনদিনই প্রতিবাদ করিতে পারে না, জয়া তাহার স্বামীর এই দুর্বলতাকে মানিয়া লইতে পারে না। তবু কোনদিন পাছে স্বামীকে বিপদে ফেলা হয় এই আশঙ্কায় বাড়ীব অতি পৌরাণিক পদ্ধতিগুলিও সে না মানিয়া পারে না।

কিন্তু আজ ঐ দাম্ভিক মেয়েটির কাছে সে কিছুতেই মাথা নত করিবে না। দুর্বল বিশ্বজিৎকে তাব স্ত্রীর আচরণের জন্য মাব কাছে কথা শুনিতে হইবে ভাবিয়া জয়া আজ এক হিংস্রতার আনন্দ অনুভব করে।

বিশ্বজিৎও অবাক হয়—কিন্তু মুখে কিছুই বলে না।

উহারা চলিয়া গেলে প্রশান্ত জয়াকে বলে, "গেলেই ভাল ছিল নাকি।" জয়াও তাহা বুঝিতে পারে। আস্তে আস্তে সেও বলে, "থাক, আজ আর বসবো না—চলো ফিরি।"

পথে চলিতে চলিতে সে প্রশান্তকে বলে, "আচ্ছা প্রশান্ত তোমার বিশ্বদার আমাকে কি প্রয়োজন ছিল যার জন্য এ বাড়ীব অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে বিয়ে করেছিলেন?"

প্রশান্ত হাসিয়া উত্তর দেয়, "সেটা কি নিজেই বুঝতে পারছো না?"

জয়া যেন নিজের মনেই বলিয়া চলে, "ভালবাসি' শুধু এ কথাটাকেই জপ মন্ত্রে ধ্যান করাটা কি জীবনেব প্রতি পরিহাস মাত্রই নয়? জীবনের গতি থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকলে, এ ভালবাসার সমাধি অতি অল্পদিনেই আসবে, তাবপব চলবে শুধু জের টানা। তখন সে বোঝার ভার না পারবে সে টানতে, না পাববো আমিও নিজেকে ঠেলতে।" একটু থামিয়া জয়া আবাব বলিতে থাকে, "আর কর্মস্রোতই যদি জীবনেব গতি হয়ে থাকে, তবে দু'জনে দু'পথে চলতে থাকলে, আমবা মিলবো এসে কোথায় বলতে পাব?"

"ভয় নাই, পৃথিবী গোলই আছে আজও।" প্রশান্ত হাসি ঠাট্টা দিয়া হালকা কবিতে চান জয়াব মনেব বোঝা। কিন্তু জয়া বলিযাই চলে, "সে পৃথিবী প্রদক্ষিণেব আগেই কি একলা চলাব ক্লান্তিতে এলিযে পড়তে হ'বে না, প্রশান্ত?"

বাড়ীব কুকুবগুলিব সমস্বরে চিৎকাব শুনিয়া জয়া টেব পায, কথায় কথায তাহাবা বাড়ী আসিয়া গিয়াছে।

মাথাব কাপডটা আবও একটু টানিয়া সে উপবে উঠিযা যায। উপরে উঠিতে উঠিতে সে শুনিতে পায শাশুড়ীব গলা, "জয়া, প্রশান্ত যেন এখানেই খেযে যায। আজ জলেব মাছ এসেছে।"

জলেব মাছ অর্থাৎ উহাদেব জলমহলেব মাছ। বিশেষ পর্ব বা অতিথি অভ্যাগত উপস্থিত থাকিলে মাছ দেওযা হয—এইরূপ চুক্তি ইজাবাদাবদেব সঙ্গে।

জয়া অনুমানে বুঝিল আজও সুনির্দিষ্ট সময়ে তাহাবা সংবাদ পাইযাছে —ছয় আনিতে বিশেষ অতিথিব সমাগম। সে নিজে অতিথি পরিচর্যায় অবহেলা কবিলেও, গৃহস্বামীব সে খেয়াল ঠিক আছে। বান্নাব এলাকায়

ঠাকুর চাকর ঝির জটলা হইতেই জয়া অনুমান করে, আয়োজন সবই ঠিক। আর কাহার উদ্দেশে ও কাহার নির্দেশে সব ব্যবস্থা, তাহাও বুঝিতে বিলম্ব হয় না তাহার। অথচ বাহিরে যে কেহই টের পায় নাই—ইহাও সে জানে। উপরে গিয়া শুনে, পাশের ঘরে তখনও কথাবার্তা চলিতেছে—পুরুষ ও নারী কণ্ঠের বাদ প্রতিবাদ। হয়তো কোনও সেল মিটিং বসিয়াছে। সেও কি থাকিতে পারিতনা উহাদের এই গোপন বৈঠকে ?

জয়া তাহার ঘরের দেওয়ালে টাঙান মস্ত আয়নাটার সামনে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবে—এর শেষ কোথায় ?

রাত্রির খাওয়া দাওয়া শেষ হইলে সকলের শোবার ব্যবস্থা করিয়া বিশ্বজিৎ শুইতে যায় নিজের ঘরে। সে আজ বড় ক্লান্ত বোধ করিতেছে নিজেকে। ঘরে আসিয়া দেখে জয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। একফালি জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে তাহার অনাবৃত বাহুর উপর। নিজের সবল বলিষ্ঠ বাহুর পাশে ঘুমন্ত জয়াকে এক অসহায় শিশুর মত লাগে।

বিশ্বজিৎ আনত হইয়া সস্নেহ চুম্বন করে তাহার কপালে।

শুইয়া শুইয়া সে ভাবিতে থাকে—এই সুন্দর কোমল মুখখানি মাঝে মাঝে অমন কঠিন হইরা উঠে কি কারণে।

তাহার দুঃখ, এই পাষাণপুরীর সহিত কি কঠিন বন্ধনে সে বাঁধা, জয়া তাহা বুঝিল না। তাই সে পদে পদে তাহাকে বিদ্রূপ করে। তাহার দুর্বলতাকে, ভীরুতা বলিয়া উপহাস করে। নিরবে সহ্য করে সে জয়ার জ্বালাময়ী বিদ্রূপ। মনে মনে ভাবে একদিন হয়তো জয়ার এ ভুল ভাঙ্গিবে। কিন্তু সে কবে ?

বিনয় বাবু আসিয়া বিশ্বজিৎকে ডাকিয়া লইয়া যায় কাছারি ঘরের বারান্দায়। আস্তে আস্তে কথাবার্তা হয় অনেকক্ষণ। বিশ্বজিৎ একটু উত্তেজিত হইয়া বলে, "অসম্ভব, বাদলকে আমি চিনি খুব ভাল করেই। তা'র দ্বারা স্পাইর কাজ। এ অসম্ভব।"

বিনয় বাবু একটু ক্ষুন্ন হইরা বলেন, "বেশ, আপনি নিজেই চলুন, সত্যি কি না জেনে আসবেন।"

ঠিক হয় পরের দিনই তাহারা যাইবে বাগ্দী বুড়ীর বাড়ী।

পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ে তাহারা বাগ্দী বুড়ির বাড়ী যায়। বুড়ি তাহাদের দেখিয়াই জ্বলিয়া উঠে, "না বাবু, আর আমি এই সবের মধ্যে থাইকবো না। টাকা পয়সা দেয়না, কিসের তরে বেগার খাটতে যাইমু আমি।" "টাকা পয়সা দেয় না!" কথাটা শুনিয়া খটকা লাগে বিশ্বজিতের মনে। কথায় কথায় সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যায়।

বাদল এই বুড়ির মারফৎ দারোগাকে সংবাদ পাঠায়। বুড়ির পারিতোষিকের টাকার কমতি হইতে থাকে ক্রমশই। তাই চটিয়া আছে এইসব স্বদেশী-করা বাবুদের উপর।

বিশ্বজিৎ শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া যায়—বাদল স্পাই! তাহার এত আদরের বাদল, এত বিশ্বাস করিত সে তাহাকে; তাহাদ্বারা এ কাজ? এ যেন স্বপ্নেরও অগোচর। বিশ্বজিৎ বাড়ী আসিয়া পূবের বারান্দায় ইজিচেয়ারটার উপর শুইয়া পড়ে। ক্লান্ত, অবসন্ন মন। চোখে মুখে অব্যক্ত বেদনার ম্লানছায়া।

সন্ধ্যা হইয়া আসে—ধূসর সন্ধ্যা। গোপাল ঘরের আরতি বাজিয়া উঠে। প্রসাদলোভী ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা আসিয়া হাজির হয় গোপাল ঘরের বারান্দায়। জয়া রোজই পূবের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়ায় আরতির সময়। পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাইয়া আরতি করে পুরোহিত—কাল পাথরের দেবতার

মূর্তির সম্মুখে। ধূপ ধুনা শঙ্খ-ঘণ্টা সব মিলিয়া একটা স্বর্গ আবহাওয়ার সৃষ্টি ক্ষণিকের জন্য। স্থির দৃষ্টিতে দেখে জয়া দেবতার আরতি। জয়া উন্মনা হইয়া যায়। হঠাৎ নজর পড়ে বিশ্বজিতের উপর। এই অসময়ে তাহাকে শুইতে দেখিয়া সে চমকাইয়া উঠে। "অসুখ করেছে নাকি?" সে তাহার কপালে হাত দিয়া দেখে। বিশ্বজিৎ জয়ার ঠাণ্ডা হাতটা কপালে আরও চাপিয়া ধরিয়া বলে, "মাথাটা একটু ধরেছে; ও বিশেষ কিছু নয়।"

সন্ধ্যার আবছা আলোতেও জয়া তাহার দেহের অসার ক্লান্ত ভাব লক্ষ্য করিয়া অনুমানেই বোঝে কিছু একটা কারণ নিশ্চয়ই ঘটিয়াছে যার কিছুমাত্র আভাসও জয়া পাইবে না হাজার অনুরোধেও।

তাই সে চুপ করিয়া যায়, ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেলিয়া। জয়া ভাবিতে থাকে, এই লোকটির জীবনে কোনদিন তাহার দুঃখের কথা জানাইতে পারে নাই কাহারও কাছে। তাই সে জীবন ভরিয়াই চির একা। জয়ার প্রচণ্ড অভিমান হয়—তবু সে জিদ করে না জানিবার জন্য।

ক্ষ্যান্ত ধূপ ও বাতি দিয়া যায় ঘরে। বিশ্বজিৎকে এসময়ে ঘরে দেখিয়া সে সুখী হয়। অন্য কিছু লক্ষ্য করিবার মত দৃষ্টি নাই তাহার। খুশি মনেই সে জয়াকে বলে, "ছেলেকে একটু ঘরে বাঁধ দেখি। ঘরে বৌ আছে—তাও দুদণ্ড ঘরে থাকেনা—সারাদিন টৈ টৈ। এতদিন একলা ছিল, যা খুশি করেছে; এখন ত এই মেয়েটার দিকে একটু তাকান দরকার।"

জয়া বৃদ্ধার বলার ভঙ্গীতে হাসিয়া বলে, "আপনিই একটু শাসন করুন ত ক্ষ্যান্তমাসী। আপনাদের ছেলে আমার সঙ্গে কথাই বলেনা, বলুন ত অন্যায় না কি?"

ক্ষ্যান্ত একটু রাগত সুরেই বলে, "অন্যায়ই ত; বিয়ে করেছো,

ছেলেপুলে হবে,—ঘরে নাতি আসবে, কত সোহাগ করবে ঠাকুরমা। তা না, সারাদিন যেন বাড়ীর সঙ্গে ভাসুর সম্পর্ক। মাটা ত সারাজীবন পুড়ে মরলো, এখন বৌটাকেও কাঁদাও। না ওসব আর চলবে না।” বৃদ্ধা সস্নেহ হুকুম জানাইয়া খুশি মনেই উহাদের নিভৃতে একটু একলা থাকিবার সুযোগ দিয়া চলিয়া যায়। মনে মনে বারে বারে বলিতে থাকে, ভগবান—ছেলেটার একটু সুমতি ফিরুক।

ক্ষ্যান্তর কথায় বিশ্বজিতের চিন্তাধারা আবার অন্যদিকে ঘুরিয়া যায়। মনের আরেকটা স্তরে অন্য এক দুঃখবোধ নাড়া দিয়া উঠে।

জয়ার হাতটা ধরিয়া একটু ঝাকুনি দিয়া বলে, “কি, বৌটাও কাঁদবে নাকি সারাজীবন?”

জয়া অভিমানের সুরে বলে, “এরকম দূরে দূরে থাকলে কাঁদবেই ত।”

বিশ্বজিৎ মৃদুশাসনের সুরে বলে, “কে বলে দূরে থাকি—শুধু কাছে না থাকলেই বুঝি দূরে থাকা হয়।”

“আর দুঃখের অংশীদার হ’তে না দেওয়াটা কি দূরে থাকা নয়?”

বিশ্বজিৎ বুঝে জয়ার আহত স্থান কোথায়? একটু মৌন থাকিয়া উত্তর দেয়, “জানই ত জয়া, ওটা আমার নিজস্ব স্বভাবমাত্র—নিজের কথা আমি কোনদিন বলতে শিখিনি।”

জয়া উত্তর দেয়, “সেটাই ত আমার বড় দুঃখ। কোনদিন যা পারনি, আজও তা পারলে না কেন? তুমি তোমার দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে, একলা চলার ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়বে, আর আমি আমার এ ভাণ্ডার নিয়ে শুধু অপেক্ষাই করবো দিনভোর; একেই বলে কাছে থাকা?”

প্রশান্ত ঘরে ঢোকে জয়ার সন্ধানে, “জয়া, আলতা পরনা তোমরা?”

জয়া হাসিয়া ফেলে তাহার প্রশ্ন শুনিয়া, “হঠাৎ আবার টুকটুকে

রাঙ্গা-বৌ দেখার সখ হল নাকি ? কিন্তু এই শ্রীচরণে ত আলতা মানাবে না ভাই।"

প্রশান্ত একটু লজ্জা পাইয়া বলে, "আমি কি তোমকে পরতে বলছি—বোকা মেয়ে কোথাকার। আগে বেরই করনা শিশিটা তারপর দেখো কি হবে।"

জয়া নীচে চলিয়া যায়। নীচে গিয়া শাশুড়ীকে বলে, "মা, একশিশি আলতা আনলে হ'ত—লক্ষীপূর্ণিমাদিন পরতাম একটু।"

বনলতা খুশিই হয় বৌর কথা শুনিয়া। 'একটু ধর্মে মতিগতি হয়।'

জয়া চলিয়া গেলে প্রশান্ত বিশ্বজিৎকে জিজ্ঞাসা করে, "কি খবর জেনে এলে ?"

বিশ্বজিৎ বিষণ্ণভাবে উত্তর দেয়, "খবর ভাল নয়—বিনয়বাবু ঠিকই ধরেছেন।" প্রশান্ত বিশ্বজিতের মুখে সব শুনিয়া স্তম্ভিত হয়, 'বাদল শেষ পর্যন্ত এই কাজ করলো !'

দুইদিন যাবৎ প্রশান্ত একবারও আসেনা। দুপুর বেলা জয়া ঘুম হইতে উঠিয়া শুনে, পাশের ঘরে প্রশান্তদের অস্পষ্ট কথাবার্তা। চুপি চুপি সে ঘরে ঢুকিয়া দেখে, ঘরময় বড় বড় কাগজে আলতায় পাটকাটি ডুবাইয়া বড় বড় অক্ষরে লেখা হইতেছে।

জয়া আসিয়া বলে, "বাপরে, এরই নাম কাজ একবার উঁকি মারারও ফুরসুত নেই ?"

প্রশান্ত উত্তর দেয়, "তুমিত খুব উড়িয়ে দিলে। জান এই

কাজেরই কর্তাদের ধরার জন্য দারোগা পুলিসে হিমসিম; সারারাত তাদের টহল চলে।”

জয়াও একটা কাগজ টানিয়া লইয়া লিখিতে বসে।

কল্যাণ একটু গর্বের সঙ্গে বলে, “কাল রাতে একসঙ্গে সহর, থানা, পোষ্টাফিস, রেলের কামরা, স্টেশন সব লাল হয়ে যাবে।” জয়া হাসিয়া বলে, “আমি ভাবছি দারোগা পুলিসগুলির কি হয়রানি। ছুটোছুটির আর অন্ত নেই বড় রকমেব একটা বকশিশের আশায়।”

প্রশান্ত খুশি হইয়া বলে, “জয়া তুমিও যদি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে! দুঃখ হয় এতবড় একজন কর্মির সহধর্মিনী হয়েও, তুমি আমাদের কোন কাজে আসতে পারলে না।”

প্রশান্ত হঠাৎ চুপ করিয়া যায়। তাহার খেয়াল হয় এ জাতীয় কথায় জয়া কত আহত হয়। সে ত ভালভাবেই জানে, প্রকাশ্যভাবে তার কোনও কাজ করা সম্ভব নয় এ বাড়ীতে।

জয়া ম্লান হইয়া বলে, “থামলে কেন প্রশান্ত। সে দুঃখ কি তোমার একার। আমারও বড় দুঃখ এতবড় একজন কর্মির ভাই ও বন্ধু হয়েও তোমরা আমাকে তোমাদের সাথে নিতে পারলে না।”

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে। আজই রাতেব মধ্যে একশখানা পোস্টার লেখা শেষ করিতে হইবে হবে। জয়া গুনিয়া দেখে, এখনো অনেক বাকী। তাহার আর বসিবার সময় নাই—লক্ষ্মীর ঘরে বাতি দিতে যাইতে হইবে। উঠিতে উঠিতে সে প্রশান্তকে বলিয়া যায়, “এক কাজ কর প্রশান্ত এগুলো আমার শোবার ঘার রেখে এসো। আমি রাতে বসে বসে শেষ করে রাখবো।”

প্রশান্ত খুশি হয়। একটু ঠাট্টা করিয়া বলে, “দেখো শেষ করা

চাই কিন্তু। রাত্রিতে আবার বিশ্বদাকে নিয়ে অতি বেশী ব্যস্ত হয়ে সব ভুলে যেওনা যেন।”

জয়া হাসিয়া উত্তর দেয়, “সে বিষয়ে মাভৈঃ। তোমার বিশ্বদাকে নিয়ে ব্যস্ত হওয়া শিবের তপস্যা করার চাইতেও কঠিন।”

জিলা কমিটী হইতে সার্কুলার আসিয়াছে সমস্ত মহকুমা গুলিতে একই পোস্টার লাগান হইবে একই তারিখে।

কল্যাণ খুব খুশি জয়াদিকে পোষ্টার লেখার সাথী পাইয়া। দুইজনে বিশ্বজিতের শোবার ঘরে বসিয়া বসিয়া পোষ্টার লেখে লাল কাল অক্ষরে। রাত অনেক হইয়া যায়। কুকুরগুলি মাঝে মাঝে ডাকিয়া উঠে।

বিশ্বজিৎ দুইটার গাড়ীতে এই মাত্র বাড়ী ফেরে। “এখনও শোও নাই তোমরা?”

উহাদের উৎসাহ দেখিয়া মনে মনে খুশি হয় সে। কল্যাণ একটু গর্বের সঙ্গে উত্তর দেয়, “জয়াদির সঙ্গে কম্‌পিটিশন চলছে।”

এইকয়দিনই কল্যাণের উপর একটা মায়া জাগিয়া গিয়াছে জয়ার। অনেকটা প্রিয়ব্রতর মত লাগে। আশ্চর্য মুকুল কাকীর স্বভাবের সঙ্গে একটুও সাদৃশ্য নাই ভাইয়ের। আপন ভাই বলিয়া মনেই হয় না।

কল্যাণেরও তাহার দিদির চাইতে বেশী আপন মনে হয় জয়াদিকে।

কল্যাণ তাহাকে তাই জয়াদি বলিয়াই ডাকে। বছর সতের বয়স ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়িতেছে। পূজার ছুটিতে দিদির বাড়ী আসিয়াছে বেড়াইতে। কিন্তু দিদির বাড়ী অপেক্ষা জয়াদির বাড়ীতেই তাহার বেশী সময় কাটে। প্রশান্তদা ও বিশ্বদার সঙ্গে কৃষকদের বাড়ীতে বাড়ীতে ঘোরঘুরি করে অক্লান্ত উৎসাহ লইয়া। মুকুল ভাইয়ের এই উচ্ছৃঙ্খল

স্বদেশীগিরি পছন্দ করে না। কল্যাণও তাহার দিদির অত বড়মানুষী চালচলন পছন্দ করে না।

সময় অসময়ে জামা ছিড়িয়া লইয়া আসে কল্যাণ, "জয়াদি একটু শেলাই ক'রে দিওত। দিদিকে বললেত বলবে, শেলাই করা জামা আবার ভদ্রলোকে পরে।" জয়া তাহার ছোটখাট আবদার গুলি সস্নেহে পালন করিয়া যায়।

কল্যাণ একদিন উৎফুল্ল হইয়া সংবাদ দেয়, "জয়া দি, কৃষকসমিতির নূতন ঘর ঠিক হ'ল আজ। তোমার আঁকা সেই চাষীর ছবিটা চাই কিন্তু। কৃষাণ অফিসটা সাজাবার ভার আমার উপর।"

সে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলিয়া যায়, "আজ এই ছোট্ট ঘরে আমাদের অফিস বসলো; কয়বছর পর দেখবে, দেশ যখন স্যোশালিষ্ট হ'য়ে যাবে, কতবড় প্রকাণ্ড বাড়ী উঠেছে। লক্ষ্মীপুর কৃষাণ অফিস। উঃ সেইদিনটা একটু ভাবত জয়াদি!"

কল্যাণের চোখ ভবিষ্যতের স্বপ্নে জ্বলজ্বল করিয়া উঠে। "দিন আগত ঐ।"

রাত শেষ হয় হয়। একটা মালগাড়ীর পিছন দিয়া বাহির হইয়া পড়ে কল্যাণরা। পোষ্টারের বাণ্ডিল ও আঠা হাতে। চাদর দিয়া ঢাকা শরীর। একটু একটু হিম পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। জ্যোৎস্নার বন্যা আকাশে। হৈমন্তিক পূর্ণিমা।

জয়া ঘুমাইতে পারে না সারা রাত; কখন ফিরিবে উহারা; দুয়ার খুলিয়া দিতে হইবে নিঃশব্দে; শাশুড়ী যেন টের না পান। কিছুক্ষণের

মধ্যেই বিশ্বজিৎ ফিরিয়া আসে। কিছু পরে প্রশান্ত আর বিনয়বাবুও আসে।

ভোর হয় হয়। কিন্তু কল্যাণ আসিয়া পৌঁছায় না। হয় তো ভোরের গাড়ীতেই ফিরিবে। একটু চিন্তিতও হয় সকলে।

জয়া সকাল বেলা চায়ের কেটলিতে জল গরম বসাইয়া রান্নাঘরের পেছনের জানলা দিয়া তাকাইয়া দেখে বারে বারে, কল্যাণ ফিরিল কিনা।

বিশ্বজিৎ উঠিয়া যায়। রেললাইন দিয়া একটু ঘুরিয়া আসে। পথে একটি রেলের কুলীর সঙ্গে দেখা। সে সংবাদ দেয়, কল্যাণবাবুকে কাল দারোগা পুলিসে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

ক্রমে সংবাদটা ছড়াইয়া পড়ে। কানাঘুষার অন্ত নাই। কাল সমস্ত রাত ভরিয়া ভয়ঙ্কর কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। দারোগাপুলিসে নাকি হয়রান স্বদেশী ছেলেদের ধরার জন্য। বড় বড় লাল কাল অক্ষর গুলি মস্ত গুদামঘরটার টিনের বেড়ায় জ্বলজ্বল করিতে থাকে :—"এই যুদ্ধে এক ভাই এক পাইও নয়।"

ছোট্ট একটি ভিড় জমিয়া যায় পোষ্টারটার কাছে। বৃদ্ধদের মনে আতঙ্ক দেখা দেয়—আবার যুদ্ধ! প্রত্যেকের মনেই একই আতঙ্ক—যুদ্ধ যুদ্ধ। অজানা ভয়ঙ্কর দিনের সূচনার কাল ইঙ্গিত। গুমোট আবহাওয়া।

গৌরীশঙ্করও শুনিয়া অবাক হয়, কল্যাণ আবার এসব দলে মিশলো কবে? কালরাতে সে তবে বাড়ী ছিল না! আশ্চর্য!

জয়ার মন শঙ্কিত হইয়া উঠে কল্যাণের জন্য। "অতটুকু ছেলে, হয় তো কত নিদারুণ অত্যাচার সইতে হবে।"

প্রশান্ত মুকুলের কাছে যায়, কল্যাণের জন্য মশারি, জামা কাপড় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে। প্রশান্তকে দেখিয়া একটু বিরক্তির সঙ্গে

জিজ্ঞাসা করে মুকুল, "অতটুকু ছেলেকে পাঠালেই বা কেন এসব কাজে ? ওকি কোনদিন এসব কাজ করেছে যে সেরে আসতে পারবে ?"

প্রশান্ত উত্তর দেয় না। মুকুলকাকীর সঙ্গে এই তার প্রথম কথা বলা।

মুকুল আরও একটু উষ্মা প্রকাশ করিয়া বলে, "বিশ্বভাসুরপোও ত ছিলেন, তিনি নিজে গেলেই পারতেন। নিজেকে বাঁচিয়ে ঐটুকু ছেলেকে জেলে পাঠাবার অর্থ কি ?"

প্রশান্ত মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে কিন্তু প্রতিবাদ করে না। সে জানিত এদের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা; যুক্তির বালাই নাই যাদের। না হইলে বিশ্বদার মত লোকের সম্বন্ধেও এই মনোভাব !

সে তাড়াতাড়ি কল্যাণের কাপড় জামা লইয়া চলিয়া যায়।

জয়া মুকুল কাকীর অভিযোগ শুনিয়া অবাক হয়। মনে মনে ভাবে, 'আশ্চর্য মানুষের বিচার শক্তি। বিশ্বজিতের মত লোকের মধ্যেও এরা জেলখানার ভয় দেখতে পায়।'

দুইদিনের মধ্যেই বিশ্বজিৎ জামিনে খালাস করিয়া আনে কল্যাণকে। সে জয়াকে দেখিয়া লজ্জায় লাল হইয়া উঠে।

জয়া লক্ষ্য করে উহা। সে সস্নেহে কল্যাণের মাথায় হাত দিয়া বলে, "এবার ত মুখোমুখি পরিচয় সাম্রাজ্যবাদী দানবের সঙ্গে। দাদাদের উপযুক্ত ভাই হওয়া চাই কিন্তু !"

কয়দিনের মধ্যেই তাহার বিচার শেষ হইয়া যায়—ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড। জয়ার কানে ঘুরিয়া ফিরিয়া কল্যাণের সেই গানের সুরটা বাজে—"জাগো জাগো অনশন বন্দী...

কয়দিন যাবৎ বিশ্বজিৎ লক্ষ্য করিতেছে—প্রশান্ত বড় কম আসে তাহাদের বাড়ী। জয়া চিরদিনের অভ্যাসমতই তিনজনের চা করে—চা প্রায়ই ঠাণ্ডা হইয়া আসে—তবু প্রশান্ত আসে না।

বিশ্বজিৎ গিয়া ডাকিয়া আনে, "নবাব তো কম্‌না তুই। রোজই কি তোকে ডেকে এনে চা খাওয়াতে হবে?"

চা খাওয়া শেষ হইতে না হইতেই উঠিয়া পড়ে প্রশান্ত, "চলি জয়া।"

জয়া অনুযোগ দেয়, "কাজের লোকদের অকাজের লোকের কাছে থাকতে বলার সাহসই বা কই যে বলবো আরো একটু বসো।"

প্রশান্ত উত্তর দেয় না ম্লান হাসি হাসিয়া চলিয়া যায়। বিশ্বজিতেব মনে কিসের এক অস্পষ্ট অনুমান ছায়াপাত করে। সেও চুপ হইয়া কি যেন ভাবে একটু।

কিছুদিন যাবৎ প্রশান্ত টের পায় তাহার মনে এক নূতন রোগ সৃষ্টি হইয়াছে। শত চেষ্টা করিয়াও সে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে না এ রোগ।

সারাদিন রোদে রোদে ঘুরিয়া কাজ করে সে বিশ্বজিতের সঙ্গে। কিন্তু মনের ভিতরের স্তরে একটা অব্যক্ত বিষণ্ণতা চাপিয়া ধরিয়াছে। সর্বদাই ম্রিয়মাণ হইয়া থাকে সে। এক অকল্যাণী ব্যাধি দেখা দিয়াছে তাহার সুস্থ মনে। অবসাদভরা স্মৃতির বুনানি।

জয়াকে সে ত চিরদিনই স্নেহ করিয়া আসিয়াছে—কিন্তু সে জানিত না এই স্নেহের অন্তরালে এতদিন এক সূক্ষ্ম কীট ঘুমাইয়াছিল। আজ বড় বেশী অসময়ে সেই কীটের দংশন আরম্ভ হইয়াছে; বড় বেশী দেরীতে।

বারে বারে ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে পড়ে জয়ার ছোট্ট মুখখানিতে একটা করুণ বিমর্ষতার ছায়া পড়িয়াছে। কিছুতেই সে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে না মন হইতে সেই করুণ ছবি—কয়েদীর মত জানালার ধারে দাঁড়াইয়া থাকে জয়া।

অন্যমনস্ক হইতে চায় প্রশান্ত। শেলফ্ হইতে একটা বই টানিয়া লয়। একঘণ্টা কাটিয়া যায়, এক পাতাও পড়া শেষ হয় না। আবার একটা পুরাণ মাসিক পত্রিকা খুলিয়া বসে। তাজিকিস্তানের কৃষক কবির ছোট্ট এক কবিতার অনুবাদ। প্রশান্ত চোখ বুলাইয়া যায়ঃ—

"তুমি বলেছিলে, 'রাজমুকুট—পড়বে না খসে।'
পড়েছে খসে রাজমুকুট।
তুমি বলেছিলে, 'সিংহাসন ভাঙ্গবেনা
কখনও।'
ভেঙ্গেছে সিংহাসন।
তুমি বলেছিলে, 'আমাদের মেয়েদের
গুণ্ঠন খুলবে না কেনো।'
খুলেছে তাদের গুণ্ঠন।......" (১)

স্বপ্ন-স্নিগ্ধ-দৃষ্টি। প্রশান্ত ভাবে একটু উন্নত তাজিকিস্তানের কথা। ঘোমটা-খসা তাজিকিস্তানেব কৃষক-বধূরা! এক সৃজন-মধুর-সকাল বেলায় নামিয়া আসিয়াছে তাহারা ফসলধরা সোনার ক্ষেতে।

তাহার তন্দ্রা টুটিয়া যায় দুয়ার খোলার শব্দে। বিশ্বজিৎ ঘরে ঢুকিয়া বিরক্তির সুরে বলে, "তুইত বেশ লোক; এখনও বই নিয়ে বসে আছিস্! আর আমি এতক্ষণ তোব অপেক্ষা ক'রে ক'রে ফিরে এলাম। কাঞ্চনপুর যাওয়ার কথা ভুলেই গেলে? এতটুকু যদি দায়িত্ব-বোধ থাকে তোদের! কৃষকরা আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবে আমাদের জন্য? তাদের কাজকর্ম নেই?"

প্রশান্ত লজ্জিত হয়। বিশ্বজিৎ একটু লক্ষ্য করিয়া দেখে, তাহার

---

(১) অরুণ মিত্রের অনুবাদ।

চোখে মুখে এক পাণ্ডুর অবসন্নতা। সে একটু দরদীর সুরে জিজ্ঞাসা করে, "প্রশান্ত, তোর কি হ'য়েছে রে ?"

প্রশান্ত মনে মনে ভাবে, 'আমার কি হ'য়েছে, তা' যদি তোমায় বলতে পারতাম বিশ্বদা! তুমি জাননা, আজ আমি কত অপরাধী, তোমার স্নেহের কত অনুপযুক্ত।' সে যেন জোর করিয়াই টানিয়া তোলে নিজেকে।

দুইজনে দুইটা সাইকেলে বাহির হইয়া পড়ে। খালের ধার দিয়া নরম মাটির পথ। খালের জলে ডুরে-শাড়ি-পরা মুসলমান মেয়েরা পাট ধুইতেছে! পাটপচা গন্ধে বাতাস ভারী হইয়া উঠে। খালের বাঁক ঘুরিয়া দুইজনে দ্রুত সাইকেল চালায়। দূরে মরার মত নিষ্প্রাণ চরটা যমুনার বুকে মাথা উঁচু করিয়া আছে।

ঘুম হইতে জাগিয়াই প্রথম প্রশান্তর মনে হয় কাল তাহার বিচার শেষ হইবে। আবার কতদিন পরে সে ফিরিবে, কতদিনের জেল হইবে কে জানে ? সারাদিন সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া কাটিয়া যায়। শীতের ছোট দিন দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে। সন্ধ্যার আবছা আলোতে অস্পষ্ট নারী মূর্তি চোখে পড়ে বিশ্বজিতের ঘরের জানালা দিয়া। অনুমানে বোঝে সে—জয়াই হইবে।

একমুহূর্তে মনটা বিষণ্ণ হইয়া যায়।

কি ভাবে, কি করিয়া জয়ার দিন কাটে এ বাড়ীতে, কেহই জানে না; খোঁজও রাখে না। বিশ্বদা তাহার অফুরন্ত কাজের ফাঁকে টের পাইতেছে কি একটি মেয়ে তাহারই স্বহস্তে রচিত কারাগৃহে

নিঃশব্দে তিলে তিলে নিজেকে কি করিয়া হত্যা করিয়া চলিয়াছে !

অথচ এর প্রতিকারও কিছু নাই, তাহাও সে বুঝে। এক করুণ অসহায়তাবোধ তাহাকে নিরব করিয়া দেয়। এক অলস ব্যাথাতুর অনুভূতি আচ্ছন্ন করিয়া দেয় তাহাকে।

একবার প্রবল ইচ্ছা হয় তাহার—আজ বিদায়ের পূর্বে জয়াকে তাহার প্রিয় গানটি শুনাইয়া যায়। আবার মুহূর্তে কি চিন্তা করিয়া সংযত করে নিজেকে।

জয়াকে সে ভালবাসে তাহা সে টের পাইয়াছে। তবু নিজের দুর্বলতার কোনও প্রকাশই ধরা দেয় না সে। নিষ্ঠুর প্রচেষ্টা দ্বারা নিজেকে সে সংযত রাখে উহাদের কল্যাণের কথা ভাবিয়া।

বিশ্বজিৎ তাহার সন্ধানে ঘরে ঢোকে। এই অসময়ে তাহাকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া একটু অবাক হইয়া বলে, "কাল ভোরেই যে শ্রীঘর যাচ্ছিস তার খেয়াল আছে ? আর আজ তুই এভাবে একলা শুয়ে থাকবি ?"

প্রশান্ত বিশ্বজিতের হাতটা তাহার মুঠোর মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলে, "বিশ্বদা, তোমার আশীর্বাদই কামনা করছিলাম ; শেষদিন পর্যন্ত যেন তোমার কাছ থেকে পাওয়া আদর্শকে উঁচু করেই যেতে পারি।"

বিশ্বজিৎ তাহার কথা শুনিয়া চুপ হইয়া যায়। প্রশান্তকে সে কত গভীর স্নেহ করে ; তাহার জীবনের ঐ একমাত্র বন্ধু, ভাই, পরম আত্মীয়। তাহার অকল্যাণ হয়, এমন কোনও কাজ প্রশান্ত করিতেই পারে না।

জয়াকে ভালবাসিয়া সে দুঃখ পাইতেছে—বিশ্বজিৎ তাহা টের পাইয়াছে। তবু প্রসন্ন মুখেই সে দুঃখ সহিবার ক্ষমতাও যে তাহার আছে তাহাও সে জানে।

তাই আজ এ বিদায় মুহূর্তটিতে তাহাকে গ্লানিদ্বারা অবসন্ন হইতে দিতে পারেনা সে। তাহার সম্মুখে কত বিরাট কর্তব্য পড়িয়া আছে ; তাহার কত প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োজন এখন।

বিশ্বজিৎ তাহার মাথায় হাত রাখিয়া বলে, "প্রশান্ত তুই এত ভেঙ্গে পড়লি ! চল তোর জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। একলা থাকতে দিতে আজকে অন্ততঃ পারি না। আবার কবে দেখা হ'বে—তখন কে কোথায় থাকবো ঠিক আছে ?"

পরের দিন খুব ভোরে গাড়ী। বাড়ীর সকলেই জানে প্রশান্ত আজ বিদায় নিতেছে—কতদিনের জন্য কেহই জানে না।

প্রশান্ত গুরুজনদের প্রণাম করিয়া ষ্টেশনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হয়। বিশ্বজিৎ ও সঙ্গে যায়। জয়া উপরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখে, প্রশান্ত চলিয়া যাইতেছে। তাহার বুকের মধ্যে একটা চাপা ক্রন্দন যেন গুমরাইতে থাকে। প্রশান্ত চলিয়া গেলে এই বাড়ীতে কি করিয়া দিন কাটাইবে সে !

একমাস যাবৎ বিশ্বজিৎ কলিকাতায় আসিয়াছে। তাহার ঘরে সেল মিটিং বসিয়াছে। ইসমাইল ঘরে ঢোকে মুখে দুশ্চিন্তার ভাব। সে সংবাদ লইয়া আসিয়াছে, তাহাদের অফিস সার্চ করা হইয়া গিয়াছে ভোর রাতে। আরও দুই এক জায়গায়ও সার্চ করা হইয়াছে, দুইজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। চিন্তিত হয় সকলে। প্রত্যেকের মন একটা নূতন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠে।

প্রত্যেকটি মুহূর্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিত্য নূতন অবস্থার পরিবর্তন। সঙ্গে সঙ্গে

কার্যতালিকাও পরিবর্তিত হইতেছে। সকলেই একমত হইয়া স্থির করে—যে ভাবে গ্রেপ্তার করা আরম্ভ হইতেছে, এখনই কিছু কিছু ইউ-জি-তে সরিয়া পড়িতে হইবে।

সেল সেক্রেটারী জানাইয়াছে, বিশ্বজিৎকে দুই-একদিনের মধ্যেই ইউ-জি-তে যাইতে হইবে।

একদিনের জন্য ছুটি নেয় সে বাড়ীতে যাইবার জন্য। মার চিঠি আসিযাছে, বাড়ী যাইতে লিখিয়াছেন, কিন্তু কোনও খবর জানান নাই। কাহার অসুখ নয়ত—চিঠিখানি আরেকবার খুলিয়া পড়ে। বাড়ীব সবাই ভাল আছে লিখিয়াছেন। তবু যাওয়াই ঠিক করে। জয়াকেও জানাইয়া আসা দরকার। না হইলে তাহাব সংবাদ না পাইয়া উতলা হইয়া উঠিবে সে।

দশটাব গাড়ীতে বাড়ী পৌছায় বিশ্বজিৎ। মাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করে, "কি ব্যাপার! হঠাৎ বাড়ী আসতে লিখলে যে!" বনলতা উত্তর দেয়, "কেন বাড়ী আসতে লেখায় আবার কারণ চাই নাকি? বাড়ীর ছেলেকে বাড়ী আসতে লিখবো না? যা উপরে গিয়ে একটু বিশ্রাম কর, আমি সরবৎ পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

জয়া হাসি মুখে সম্বর্দ্ধনা জানায়, "ভাল আছ?" বিশ্ব হাসিয়া ফেলে তাহার এই জোর করিয়া formal হওয়ার চেষ্টা দেখিয়া। মনে মনে ভাবে, 'কি আত্মাভিমানী মেয়ে বাপরে!' বিশ্বজিৎ হাসিয়া উত্তর দেয়, "ভালই আছি; তবু যাক একটু খোঁজ নিলে। একছত্র চিঠি দিলে তোমার দয়ার ভাণ্ডারে কমতি পড়তো না নিশ্চয়।" জয়া নির্লিপ্ত সুরে উত্তর দেয়, "জানতাম নিষ্প্রয়োজন। অবাঙনৈতিক মেয়ের চিঠির জন্য তোমার ত আর ঘুম আসতো না কি না!"

বিশ্বজিৎ কপট শাসনের সুরে বলে, "অত রাগও ভাল নয়। পরে কিন্তু পুড়তে হবে।"

জয়ার দিকে ভাল করিয়া তাকাইয়া সে মনে মনে ভাবে, 'জয়া যেন আরও সুন্দর হ'য়েছে।' দুষ্টামি করিয়া বলে, "আমি ছিলাম না কি না, তাই বুঝি অত সুন্দর হয়েছ দেখতে।" জয়া আরক্তিম হইয়া উঠে। সামনে টাঙান মস্ত আয়নাটাতে তাহার দেহের লাবণ্য চাঁপা-ফুলের রংয়ের শাড়ির ভিতর হইতে ফুটিয়া উঠে।

নিচে রাধির গলা শুনা যায়। সে জোরে জোরে বলিতেছে, "কই দাদাবাবু কই! দাদাবাবু আইছে শুইন্তে, ছুইটে এইলাম। দাদাবাবুর খোকা হইব—তার খাওয়ান আদায় করন লাগবো ঠাকুরমার থেইকে।"

বিশ্বজিৎ রাধির কথা শুনিয়া আরেকবার ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখে জয়াকে। নিজেও একটু আরক্তিম হইয়া উঠে। জয়ার মুখের দিকে তাকাইয়া বলে, "ও এই জন্যই। তোমার সংবাদ ত জানা হ'ল; এবার আমার সংবাদ ও শুনিয়ে দেই। আমাকে কালই চলে যেতে হ'বে। আর কবে যে আসবো, বা কোথায় থাকবো কিছু ঠিক নেই। তবে চিন্তা কোরনা—ভালই থাকবো তোমার ভাবী সন্তানের কল্যাণে।"

জয়া এতক্ষণে কথা বলে, "আর তোমার না?" বিশ্বজিৎ একটু হাসে। তাহার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে থাকে। যাদু জানে মেয়েরা—জয়াই জিতলো। বিশ্বজিৎ উপলব্ধি করে, কত বড় কঠিন দায়িত্ব আসিতেছে সামনে। তাহার প্রতিজ্ঞাবদ্ধমন চিন্তান্বিত হইয়া উঠে—দায়িত্ব, চতুর্দিকে দৃঢ় দায়িত্ব!

বিশ্বজিতের কথায় জয়াও চিন্তিত হইয়া উঠে। ভাল করিয়া সে বুঝিয়া উঠে না। একটা অজানা পরিস্থিতির কল্পনায় সে শঙ্কিত হয়। আবার দেখা হইবে ত বিশ্বজিতের সঙ্গে।

নিচে আসিয়া বিশ্বজিৎ মাকে জানায়, "আমি কিন্তু কাল ভোরের গাড়ীতেই চ'লে যাব।" বনলতা অবাক হয় ছেলের কথা শুনিয়া। একটু রাগত সুরেই বলে, "তবে আসার দরকার ছিল কি ?"

বিশ্বজিৎ উত্তর দেয়, "তুমি যে লিখলে।"

"আমি কি আর একদিনের জন্য আসতে লিখেছিলাম ! আর পাঁচজনে কি সুন্দর ছেলেপুলে নিয়ে ঘর সংসার করছে, চেয়ে দেখতো। আর তোর মতি যে কবে ফিরবে ভগবান জানেন। এখন বাড়ীতে বসে সংসারটা একটু ধরত ভাল ক'রে।" বিশ্বজিৎ হাসিয়া বলে, "কেন তুমিই ত আছ।"

বনলতা চটিয়া যায়, "হ্যাঁ—আমার ত আর ধর্ম কর্ম নাই ; চিরদিন তোমাদের সংসার ধরেই বসে থাকি।"

বিশ্বজিৎ ভালভাবেই জানে—তাহাব মার সংসারের প্রতি কত প্রবল আসক্তি। তাই মাকে খুশি করিবার জন্যই বলে, "এই বয়সেই ত মানুষ ভাল করে সংসার করে। তুমি কি এরই মধ্যে বুড়ি হয়ে গিয়েছে যে সংসার ছেড়ে কাশীবাস করতে বাবে ?"

বনলতা হাসিয়া ফেলে ছেলের কথা শুনিয়'। কিছুতেই আর একদিনও ছেলেকে বাড়ী থাকিতে রাজী করাইতে পারে না। বৃথাই সে গজ গজ করিতে থাকে, "চিরকালই ত ওর ঐ এক গোঁ—যা বলবে তার একটুকুও এদিক ওদিক হওয়ার উপায় নেই।"

দুপুরবেলা খাওয়ার পর জয়া আসিয়া বিশ্বজিৎকে জিজ্ঞাসা করে, "কাল ভোরের গাড়ীতেই যাবে নাকি ?" বিশ্বজিৎ একটু বিদ্রূপ করিয়া বলে, "আবার তুমিও মার ওকালতি করতে এলে নাকি ?"

জয়ার স্পর্শাতুর মনের কোন এক সূক্ষ্ম তারে আঘাত লাগে। এই

জাতীয় কথাই সে সহ্য করিতে পারে না। কেন? সে কি কোনদিন স্বামীকে বাধা দিয়াছে তাহার কর্তব্যে?

জয়া নিজেও কি এ কাজের দায়িত্ব উপলব্ধি করে না? সুব্রতর বোন সে। কতবড় বৈপ্লবিক আবহাওয়া বড় হইয়াছে সে। আর সে-ই যাইবে স্বামীকে আদর্শভ্রষ্ট হইতে প্ররোচিত করিতে! তাহাকে ব্রত দুর্ব্বল ভাবে কেন বিশ্বজিৎ?

জয়া উত্তর দেয় না বিশ্বজিতের কথায়। আস্তে আস্তে সরিয়া আসিয়া বিশ্বজিতের সুটকেসটা গুছাইতে থাকে। বিশ্বজিতের বাকা কথায় তাহার মন কঠিন হইয়া উঠে; সেও সমস্তদিন স্বামীকে এড়াইয়া চলে। বিশ্বজিৎ মনে মনে ব্যথিত হয় জয়ার ব্যবহারে। তাহার বাড়ী আসার প্রয়োজন ছিল কি? কত আশা করিয়া আসিয়াছিল সে, জয়া খুশি হইয়া উঠিবে।

সন্ধ্যার আগে বিশ্বজিৎ জয়াকে বলে, "মাকে ব'লে চল একটু চরে বেড়িয়ে আসি।"

জয়া ধীর কণ্ঠেই উত্তর দেয়, "আমি অত উঠতে বসতে কারও পারমিশনের জন্য পায়ে ধরতে জানিনা।" তাহার কথায় বিদ্রূপ ঝরে।

জয়া জানিত বিশ্বজিতের দুর্বলতা কোথায়। বিশ্বজিৎ আহত হয়। তবুও সংযত সুরেই আবার বলে, "আচ্ছা পায়ে ধরার কাজটা না হয় আমিই করছি। তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও।"

জয়া উত্তপ্ত গলায় বাঁধা দিয়া বলে, "কোনও দরকার নেই। আমার জন্য কারও ওকালতি করতে হ'বেনা। আমি এমনিই বেশ আছি।"

বিশ্বজিতের মনও কঠিন হইয়া যায়। জানিয়া শুনিয়াও কেন জয়া এত অবুঝ হয়। মাকে সে নিজে কোনদিন সুখী করতে পারে নাই—

কিন্তু মারই বা দোষ কি? নিঃসন্তান—বাল্যবিধবা। নিষ্ঠুর সমাজের হৃদয়হীনতার জন্য ত তাহাকে দায়ী করা যায় না?

সে নিজে কোনদিন মার আশা পূর্ণ করিতে পারে নাই। জয়াও যদি তাহা না করে—তবে মা কি ব্যথিত হইবে না যে পেটের ছেলে নয় বলিয়াই আজ তাহার এ পরাজয়

বিশ্বজিৎ জামাটা গায় দিয়া বাহির হইয়া যায়।

জয়া গা ধুইয়া ঘরে আসিয়া দেখে—বিশ্বজিৎ কখন বাহির হইয়া গিয়াছে—চাও খাইয়া গেল না।

বনলতা বসিয়া বসিয়া মালপোয়া ভাজিতেছে। ক্ষ্যান্তকে ডাকিয়া বলে, "বিশ্বকে পাঠিয়ে দেও গরম গরম খাক ক'খানা।"

ক্ষ্যান্ত আসিয়া সংবাদ দেয়, "সে ত বাড়ী নেই।"

বনলতা শুনিয়া চটিয়া যায়, "আমাকে ত একটু জানালেই হত। আমি ত আর পাড়ায় বেড়াতে বের হইনি। চা না খেয়েই বেরিয়ে গেল সে—আমি একটু জানলামও না।"

রাগে রাগে বাকী মালপোয়াগুলি তাড়াতাড়ি শেষ করিতে গিয়া গরম ঝাঝরা হাতাটা পায়ে পড়িয়া যায়। একখোলা মালপোয়াও পুড়িয়া যায়। বনলতার মাথা আরও গরম হইয়া উঠে। যত রাগ হয় জয়ার উপর। কেন সে কি বাড়ীর কেউ নয়। ছেলে কখন বাড়ী আসে—কখন যায়—কোন কিছুই যে সে জানিতে পায় না।

জয়া মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া ভাবে, 'যেন আমাকেই সব বলে।' তবু মুখে নম্রভাব বজায় রাখিয়াই সে উত্তর দেয়, "আমাকে ত কিছু বলেনি।"

মনে মনে হাজার বিরূপ হইলেও জয়া কোনদিন নম্রতা হারায়না শাশুড়ীর সঙ্গে কথা বলিতে। তাহার শিক্ষাকে সে পঙ্কিল করিয়া তুলিবে না—এই সব সংসারের ঘোলা আবর্তে পড়িয়া।

জয়ার কথা শুনিয়া বনলতা মনে মনে একটু খুশি হয়। গলার স্বরও পরিবর্তিত হইয়া উঠে কেন জানি। সহজভাবেই বলে, "যাও তবে, তার জিনিষপত্র গুছিয়ে রাখ আজই। কি মর্জি যে হ'বে কখন কে জানে!"

উপরে আসিয়া ইজিচেয়ারটার উপর শুইয়া শুইয়া ভাবে জয়া, 'তাহাকে এত হীন মনে করে কেন শাশুড়ী। সে তার স্বামীকে একমাত্র তাহারই প্রিয় করিয়া রাখিবে—আত্মীয়, বন্ধুদের, দূরে সরাইয়া—' এই ধরণের ইঙ্গিতে জয়ার আত্মমর্যাদায় ঘা লাগে।

রাত্রিবেলা বিশ্বজিত বাড়ী ফিরিলে জয়া শান্তস্বরে তাহাকে বলে, "যাবার সময় মাকে একটু বলে গেলেই পারতে।"

বিশ্বজিৎ নির্লিপ্তস্বরে উত্তর দেয়, "সে অভ্যেস ত আমার কোনদিনই ছিলনা।"

জয়া তাহার এই নির্লিপ্ত জবাবে অসহিষ্ণু হইয়া উঠে মনে মনে।

মুখে বলে, "তাহ'লে সে অভ্যেস যে নেই—সে কথাটাই না হয় তাঁকে ভাল করে বুঝিয়ে দিও। মিছিমিছি আমার ঘাড়ে দুর্নাম দিয়ে লাভ কি তোমাদের?"

বিশ্বজিৎ উত্তর দেয়, "দরকার বোঝ ত তুমিই বুঝিয়ে দিও যাতে তোমার প্রশংসা অটুট থাকে।"

জয়া কোনও উত্তর দেয় না।

বিশ্বজিৎ বসিয়া বসিয়া কতকগুলি কাগজপত্র পুড়িতে আরম্ভ করে দিয়েশলাই দিয়া। জলন্ত আগুনের আভায় তাহার কঠিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মুখে তেজদীপ্ত পৌরুষশ্রী ফুটিয়া উঠে।

জয়া মুগ্ধ হইয়া তাকাইয়া থাকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রেডিওতে সংবাদ দিতে থাকে। বিশ্বজিৎ তাড়াতাড়ি উঠিয়া যায়, সংবাদ শুনিতে। রেডিওতে সংবাদ দেয়:—

অল ইণ্ডিয়া রেডিও—বাংলা খবর বলা হচ্ছে—আজ সকালে নয়া-দিল্লীর খবরে প্রকাশ যে মহামান্য বড়লাট বাহাদুর নিজ ক্ষমতাবলে এই মর্মে অর্ডিনান্স ঘোষণা করেছেন যে যুদ্ধের ব্যাঘাত সৃষ্টি করার অপরাধে তিনমাস কারাদণ্ড হতে প্রাণদণ্ড পর্যন্ত দণ্ডনীয় হতে পারে।... শেফিল্ডের উপর আজ প্রত্যুষে আবার পাঁচশত শত্রু বিমান হানা দিয়েছে; হতাহতের সংখ্যা প্রায় পনের শতর উপরে। রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা খবর পাঠিয়েছেন যে ফ্রান্সে দালাদিয়ে গভর্নমেণ্ট ব্যাপকভাবে সাম্যবাদীদের গ্রেপ্তারের আদেশ দিয়েছেন। এ পর্যন্ত ছয় শত মিউনিসিপালিটির সাম্যবাদী সভ্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিরিশজনকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হ'য়েছে...সংবাদদাতা আরও বলেছেন যে কম্যুনিস্টনেতা মরিস থোরেজ্‌কে গ্রেপ্তার করার জন্য ৫০০০ ডলার ঘোষণা কর্য় হ'য়েছে। কিন্তু তার খোঁজ পাওয়া যায় নাই।......

বিশ্বজিৎ একটু চিন্তান্বিত হইয়া উঠে। জগৎব্যাপী এক ধ্বংসলীলার সমারোহ। একদিকে পরাক্রান্ত নাৎসী জার্মানীর তাণ্ডবলীলা। একের পর এক দেশ লুটাইয়া পড়িতেছে বিজয়ী গর্বিত নাৎসী-সেনার পায়ে। নরওয়ে হইতে ফ্রান্স, বেলজিয়ম হইতে গ্রীস যেন ঘুনে ধরা কাঠের ঘর—ঝড়ের দাপটে ভাঙ্গিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িতেছে। অন্যদিকে বিশ্বাসঘাতকতার অপূর্ব প্রতিযোগীতা। যারা ছিল শাসক—তারা আজ তিলকধারী বিভীষণ। দিন গুণিতেছিল—কখন আসিবে হিটলারের ঝটিকাবাহিনী।

কিন্তু তাহাদেরও এর মূল্য দিতে হইবে। সমস্ত জাতিকেই এর মূল্য দিতে হইবে। কোথায় গেল ফরাসীজাতীর সেই গৌরবান্বিত ঐতিহ্য। দালাদিয়ে, লাভাল, চেম্বারলীন—সবাই একই মুখসপরা, বাছিয়া লওয়া মুস্কিল।

ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের আজ ফ্রান্সে বাস করিবার অধিকার নাই। সব দেশেই সেই একই ছবি। ইংলণ্ডেও তাই—ভারতেও তাই,— চমৎকার মিল।...

চমক ভাঙ্গে বিশ্বজিতের, ঘড়িতে দশটা বাজে।

অনেকরাত্রিতে বিশ্বজিত শুইতে আসিয়া দেখে জয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ঘুমভরা আয়ত দৃষ্টিতে সে চুপ করিয়া দেখে ঘুমন্ত জয়াকে।

মনে মনে ভাবে—এই শান্তস্নিগ্ধ বনশ্রীর মধ্য হইতে বাড়ববহ্নি জ্বলিয়া উঠে কি করিয়া ?

বুঝিতে পারেনা সে।

জাগিয়া উঠিলেই হয়তো আবার কি আরম্ভ হইয়া যাইবে।

বিশ্বজিত শুইয়া শুইয়া ভাবে সেই অফুরন্ত হাসির ঝরণা আজ একি বিদ্বেষবহ্নিতে পরিণত হইল ?

আবার কতদিন পরে আসিবে সে, এর মধ্যে কত কি হইয়া যাইতে পারে। একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় মনটা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে। সে শুনিয়াছে— সন্তান প্রসব করিতে অনেক সময় প্রসূতির প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়ে। জয়া বাঁচিয়া থাকিবে ত ?

মনে মনে ঠিক করে, সে আর জয়াকে আঘাত দিবেনা।

জয়ার জন্য চিন্তিত হইয়া ওঠে মন। সে ত ভালভাবেই জানে— এই বাড়ীকে জয়া মন হইতে গ্রহণ করিতে পারে নাই। তার পক্ষে সে ছাড়া এ বাড়ীতে থাকা যে কি ভীষণ কষ্টকর তাহা সে জানে। এ বাড়ীর আভিজাত্যকে জয়া ঘৃণা করে।

বিশ্বজিৎ ঠিক করে প্রশান্তকে বুঝাইয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিবে। মার সাধ্য নয়—জয়ার মন বুঝিয়া চলা। কর্ত্রীত্বর আনন্দই তাঁর একমাত্র

আনন্দ। আর জয়া কাহারও উপর কর্ত্রীত্ব করিতেও ভালবাসেনা—উহা সহ্য করিতেও ভালবাসেনা।

কলিকাতায় আসিয়া বিশ্বজিৎ প্রশান্তকে বাড়ী পাঠাইয়া দেয়।

জেল হইতে বাহির হইয়া প্রশান্ত আর বাড়ী যায় নাই। প্রথমে সে কিছুতেই রাজী হয় না, "বিশ্বদা শুধু এই অনুরোধটি ক'রোনা।"

বিশ্বজিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলে, "তুই কি বুঝতে পারছিস না—ওর মত মেয়ের পক্ষে ঐ বাড়ীতে থাকা ঠিক কয়েদীর মতই নয়কি? যা জেদী মেয়ে—অন্যের উপর রাগ ক'রে হয়তো নিজেকেই শেষ করবে। মার সাধ্য নয় ওর রুচি বুঝে চলেন। যত্নের ত্রুটি করবেন না ঠিকই—কিন্তু সে যত্ন ওর কাছে বিষ হ'য়ে উঠবে—দুজনের মনের গঠনে এত পার্থক্য। তুইত জানিস সবই। চারিদিকের নিস্পেষণ আমি আর কত সহ্য করবো বলতো?"

প্রশান্ত বিশ্বদার মনের অবস্থা বুঝিয়া একটু লজ্জিত হয়। সে রাজী হয় বিশ্বজিতের কথায়।

যাইবার আগে প্রশান্তকে বিশ্বজিৎ বলিয়া দেয়, "মাকে খুশি রাখতে জয়া যেন তেলপড়া, নুনপড়াগুলি একটু সহ্য করে। তবে তুই মধু ডাক্তারকে ডাকিস। তুই মাকে বুঝিয়ে বললে—আপত্তি করবেন না।" একটু হাসিয়া বলে, "অর্থাৎ ওঝার ভরসায়ই থাকিসনা শুধু।"

প্রশান্ত মনে মনে অবাক হইয়া ভাবে, 'বিশ্বদার কি খেয়াল চতুর্দিকে। সকলের উপরই তার সহানুভূতিভরা দৃষ্টি। কাউকেই আঘাত দিতে চায়না সে।'

শহরতলির ছোট এক বস্তি। সামনেই চওড়া খাল। খালের ঘোলা জলের উপর দিয়া পাট-বোঝাই মস্ত নৌকাগুলি ভাসিয়া যায় গঙ্গার দিকে।

বস্তির গায়ে টালির একটা একতলা বাড়ী। দুখানা মাত্র ঘর। একটা ঘরে থাকে শান্তা আর নমিতা। রাজনৈতিক কারণে নমিতার চাকরি গিয়াছে, সে এখন অমলেন্দুর নিকটেই থাকে।

আরেক ঘরে ছেলেরা সবাই শোয় রাত্রে।

নমিতা রান্না করে। বিশ্বজিৎ আসিয়া মাঝে মাঝে সাহায্য করে। উনান ধরাতে আর পারেনা নমিতা—ধোঁয়ায় চোখমুখ লাল হইয়া উঠে। বিশ্বজিৎ হাসিয়া বলে, "সরুন আপনি, আমি ধরিয়ে দিচ্ছি। অন্তরীণ থাকার সময় উনান ধরান এক্স্‌পার্ট হ'য়েছিলাম।"

নমিতা লজ্জিত হয় তাহার অনভিজ্ঞতায়।

খাইতে বসিয়া অমলেন্দুই প্রথম প্রশংসা আরম্ভ করে রান্নার, "বেশ রান্না করেছ নমিতা, কিন্তু নুনটা দিতেই ভুলে গিয়েছিলে বোধ হয় তরকারিতে।"

তাহার কথায় সবাই হাসিয়া উঠে।

লজ্জিত হয় নমিতা। চিরদিনই সে মৌনভাষী। কথায় কথায় লাল হইয়া উঠে—লাজুক মেয়ে। বিশ্বজিতের বেশ লাগে উহাদের এই জীবন—বেশ আছে ওরা।

অমলেন্দু ও বিশ্বজিৎ বই লেখে—নমিতা প্রুফ দেখে। আরেক ঘরে সমস্ত রাত জাগিয়া রহমান আর শান্তা লিফলেট তৈয়ার করে। ভোরের আগেই শেষ করিতে হইবে।...

বেলা অনেক হইয়া যায় তবু কুরিয়ার এখনও ফেরেনা। সমস্তটা দিন দুশ্চিন্তায় কাটে সকলের। ব্যাপার কি! এদিকে খাওয়া বন্ধ

সাবাদিন। খাবার আনিতে বাহিরে যাইবাব লোক নাই। তাড়াহুড়া করিয়া সকলে কাগজপত্র বই গুছাইয়া লয়—যে কোনও মুহূর্তে সরিয়া পড়িতে হইতে পারে।

সন্ধ্যা হয় হয়। অমলেন্দু আব নমিতা বসিয়া কতকগুলি কাগজ পুড়াইতে থাকে উনানের মধ্যে। অমলেন্দু এখনই চলিয়া যাইবে। আবার কবে নমিতার সঙ্গে দেখা হইবে ঠিক নাই। দীর্ঘ অনিশ্চয়তা সম্মুখে। নমিতার মনে যেন ঝড় বহিয়া চলিয়াছে—তবু মুখে কিছুই বলিতে পাবেনা সে।

অমলেন্দু অনুমানে বুঝে তাহার মনেব অবস্থাটা। নমিতার কাঁধে মৃদু চাপ দিয়া বলে, "সব কিছু সহ্য করা চাই কিন্তু।"

এবই মধ্যে সোহনসিং আসিয়া পড়ে। এই মুহূর্তে সরিয়া পড়িতে হইবে—দারুণ সার্চ আরম্ভ হইযাছে চতুর্দিকে।

বাহিরে জ্যোৎস্না ফুট্ ফুট্ করিতেছে। ভিতবের একটা সরু গলি দিয়া বাহির হইয়া যায় বহমান আব অমলেন্দু। নমিতার চোখ দুইটি আতঙ্কে স্থিব হইয়া যায। সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটিয়া যাইবে হয়তো। বিশ্বজিৎ একটু সান্ত্বনাব সুবে বলে, "কিছু ভয় নাই—ওরা ঠিক পৌঁছে যাবে।"

বাতেব মধ্যেই সকলে জিনিষপত্র লইযা বাড়ী ছাড়িয়া যায়। অদ্ভুত লাগে নমিতাব।

যাযাবর জীবন।

হাড়িকড়াই বাসনপত্র বাক্স তোবঙ্গ ঐ খানেই পড়িয়া থাকে। সময় নাই, ভ্রূক্ষেপও নাই, গুছাইয়া লইবার আসক্তিও নাই।

আবার নূতন বাড়ীতে নূতন করিয়া সংসাব পাতে উহাবা। হয়তো বা একপক্ষকালও থাকা হইবে না—তাহাতে কিছুই আসে যায়না উহাদের।

শঙ্কা, আতঙ্ক, আর ক্ষিপ্রতা। মুহূর্তের গতির চাইতেও যেন দ্রুত। উহাদের কাজের গতি ছুটিয়া চলে অবিরাম অবিশ্রান্ত। কাল অক্ষরে অগ্নিবীজভরা ইস্তাহার ছাপা হইয়া চলিয়াছে রাতের পর রাত। ঘরের মধ্যে একনিশ্বাসে যেন কাজ শেষ করিয়া যায় তাহারা।

প্রস্তরীভূত আবহাওয়া। একে অন্যের নিশ্বাসগুলি শুনিতে পায় যেন।

দিনের বেলা রাজপথ চঞ্চল হইয়া উঠে কোথা হইতে যেন চলায়মান পথযাত্রীর হাতে আসিয়া পড়ে—ছোট্ট ছোট্ট কাগজের টুকরাগুলি, ভয়াবহ ভবিষ্যতের ইঙ্গিতভরা।

দেওয়ালে দেওয়ালে লাল হইয়া উঠে বড় বড় অক্ষরগুলি। চোখের সামনে জ্বল জ্বল করতে থাকে।

হাই তোলে রাস্তার মোড়ের পুলিসটা। তাহারই ঠিক মাথার উপর চিঠির বাক্সটার উপর লেপটাইয়া আছে ভয়ঙ্কর কথাগুলি। বুক কাঁপিয়া উঠে। কে এসব লাগাইয়া গেল, কিছুই টের পায় নাই সে।

ভৌতিক ব্যাপার। পুলিসটা বিমূঢ়ের মত তাকায় পোষ্টারটার দিকে। কিছু একটা না হইয়া যায় না বুঝি। সাংঘাতিক একটা দিন জোট পাকাইয়া উঠিয়াছে নিশ্চয়।

যতই দিন যায় জয়া যেন অনুতাপে পুড়িয়া মরে। বিশ্বজিৎ একদিনের জন্য বাড়ী আসিল তাও সে তাহার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে নাই। আর কবে দেখা হইবে কে জানে। একদিনের জন্য যদি দেখা হইত! তাহার ম্লান মুখখানা বারেবারে মনে পড়ে। রাধিকে দিয়া জয়া প্রশান্তকে ডাকিয়া পাঠায়। প্রশান্ত ব্যস্ত হইয়া জয়ার ঘরে আসে, "খবর কি?"

জয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করে, "তোমার দাদার কি শীগ্‌গীর বাড়ী আশা সম্ভব নয়। অবশ্য যদি কোনও ক্ষতি না হয়।"

প্রশান্ত একটু ম্লান হইয়া উত্তর দেয়, "ঐ অবশ্যটুকুই যে সত্যি এখন। তার ঠিকানার জন্য এখানকার দারোগা উঠে পড়ে লেগেছে। চিন্তা কবোনা সে ভালই আছে, খবর পেয়েছি।" এইটুকু প্রশান্ত বানাইয়া বলে। সে নিজেও একটু চিন্তিত মনে মনে একমাস যাবৎ বিশ্বজিতের কোন খবব না পাইয়া।

হঠাৎ প্রশান্তর নজর পড়ে—জয়ার গলায় একটা লালসূতায় বাঁধা মাদুলী।

সে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে, "ওটা আবার কি?" জয়া অভিযোগের সুবে একটু খোঁচা দিয়া বলে "কি আবাব। কম্যুনিস্টদের বৌদি কিনা, তাই ফিউডাল অটোক্রাসী সহ্য কবতেই হ'বে। ঝাড়া আব ফুঁয়ের চোটে অস্থির হয়ে উঠলাম। ফিউডাল যুগের ভূত ঝাড়ছি আমি ঘরে বসে—আর তোমরা বাস্তায় রাস্তায় লালঝাণ্ডা হাতে ক্যাপিটাল যুগের ভূত ঝাড়ছো। একশো বছবের পার্থক্য ঘরে আর বাইবে।"

প্রশান্ত ঠাট্টা করিয়া বলে, "কিন্তু বেশ মানিয়েছে।" জয়াও হাসিয়া বলে, "তা ঠিক। আমাকে এ সবেই মানায় ভাল।"

নীচে নামিতে নামিতে প্রশান্ত লক্ষ্য করে—বনলতা বাগ্দীদের দিয়া বাড়ীর একটা বহুদিনের পরিত্যক্ত ছোট্ট দালান ঝাড়াপোঁছা করাইতেছে। এত বছরের মধ্যে সে কোনদিন উহার দুয়াব খুলিতে দেখে নাই।

"ওখানে কি হবে মাসীমা?"

"দু'দিন পরেই দেখতে পাবে।" বনলতা হাসিয়া উত্তর দেয়।

প্রশান্ত অনুমানে বুঝিয়া লয়। মনে মনে ভাবে, 'সর্বনাশ! এই জন্যইত জয়াকে প্রায়ই সে বলিতে শোনে, "উপরে আধুনিকতার

চুণকাম করা, ভিতরে সংস্কারের ঘুনে খাওয়া দেওয়াল এদের। তোমার বিশ্বদার কিন্তু তাহার বাড়ীর ভিতরটাকে সংস্কার করা উচিত ছিল বহু আগেই।"

কি একটু চিন্তা করিয়া প্রশান্ত একটু আপত্তির সুরে বলে, "নাতির মুখ দেখতে গিয়ে বৌ-কেই যে হারাবে মাসীমা। ও ঘরে একদিনের জন্যও মানুষ থাকতে পারে?"

বনলতা উত্তর দেয়, "খুব পারে। তোমার আর এদিকে দৃষ্টি না দিলেও চলবে।"

প্রশান্ত মনে মনে প্রমাদ গণে। 'এইত সূচনা। এর পরত পড়িয়াই আছে। বিশ্বদা ভাললোকের উপরই দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছে।'

এ বাড়ীর চিবচলিত প্রথার বিরুদ্ধে তাহার বলিবার কি আছে।

মনে মনে রাগ হয় তাহার বিশ্বদার উপর। সে ঘরে আসিয়া ইজিচেয়ারটার উপর শুইয়া পড়ে। জয়াকেও সে বহুদিন তর্ক করিতে শুনিয়াছে বিশ্বদার সঙ্গে। বাড়ীর চিরচলিত যুক্তিহীন প্রথার বিরুদ্ধে জয়া কোন দিন অভিযোগ করিত; বিশ্বদা উত্তর দিত, "পুরাতন পন্থীদের সঙ্গে সামান্য একটু সামঞ্জস্য করে চলার অর্থ এই নয় যে তাকে মেনে নেওয়া হল। এ হচ্ছে শেষ বোঝাপড়া মাত্র।"

জয়া উত্তর দিত, "এই শেষ নয়, সবে সুরু মাত্র। প্রতিক্রিয়াশীল মনের একটা আবদার মেনে নেওয়ার অর্থ, তাকে প্রশ্রয় পাবার পথ দেখিয়ে দেওয়া মাত্র।"

প্রশান্তও জয়ার কথাই স্বীকার করে। বিশ্বদা যদি গোড়া থেকেই এদের প্রশ্রয় না দিত। সেও কতদিন বিশ্বদার সঙ্গে তর্ক করিয়াছে আচ্ছা বিশ্বদা, জয়াকে এরকম ঘোমাটা পরা বৌ করে না রাখলে কি কোন ক্ষতি হ'ত তোমার কাজের। তাকেও কি আর পাঁচটি কমরেড

মেয়ের মত তোমার কাজের সঙ্গিনী ক'রে নিতে পার না। এদের মেনে নেওয়ার স্বার্থকতা কোথায়।"

বিশ্বজিৎ প্রশান্তর কথায় ক্ষুণ্ণ হইয়া উত্তর দিত, "জয়া যখন আমাকে ভালবেসেছে—আমার দুঃখের বোঝাও তাকেই মাথাপেতে নিতে হ'বে। সন্তান না থাকাটাত মার দোষ নয়, দোষ সমাজের, শাস্তি দিতে হয় সমাজকে দেবো।"

প্রশান্তও হাসিয়া উত্তর দিত, "পোষ্যপুত্র হওয়াটাত আর তোমার দোষ নয়; দোষ সমাজের। শাস্তি দিতে হয় সমাজকে দিও। নিজেকে এভাবে ক্ষত বিক্ষত করছো কেন তবে? জয়ার মাথায় দুঃখের বোঝা চাপিয়ে দেবার অধিকার একমাত্র তোমারই আছে, যেহেতু তুমি তাকে ভালবেসেছ। কিন্তু সে জন্য নিজের বুকখানাওত কম ক্ষত বিক্ষত হ'চ্ছে না।" বিশ্বজিৎ ম্লান হাসিয়া বলে, "উপায় নেইরে—মার কাছে এ পরাজয় আমাকে মানতেই হ'বে।"

খুব ভোরে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় জয়ার। পেটের মধ্যে একটা বেদনা অনুভব করে সে। বেদনাটা ক্রমেই যেন বাড়িতে থাকে, মনে হয় যেন, থাকিয়া থাকিয়া ভারী একটা জাঁতা পিষিতেছে পেটের মধ্যে।

একটা নূতন কিছুর আশঙ্কায় তাহার বুক দুর দুর করিয়া উঠে।

বিশ্বজিৎ কোথায় আছে? যদি আর দেখা না হয়—জয়া ভীত হইয়া উঠে।

ক্ষ্যান্তর মুখে সংবাদ শুনিয়া বনলতা তাড়াতাড়ি ধাত্রীর বাড়ী লোক পাঠায়।

প্রশান্ত একটা বই নিতে আসে বিশ্বজিতের আলমারি হইতে। ঘরে ঢুকতেই একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার গোঙানি কমান যায়।

প্রশান্তকে দেখিয়া জয়া দাঁত চাপিয়া চুপ হইয়া থাকে।

সেও তাকাইয়া দেখে জয়ার মুখটা ফ্যাকাশে হইয়া উঠিয়াছে। বুঝিতে দেরি হয় না—সে একটা অসহ্য যন্ত্রণা চাপিতে চেষ্টা করিতেছে।

জয়া ক্লান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, "প্রশান্ত খবর কিছু পেলে ?"

জয়াকে দেখিয়া কষ্ট হয় প্রশান্তর। 'বেচারকে আরও কত যে সহ্য ক'রতে হ'বে—' মনে মনে ভাবে।

জয়া তাহার উত্তরের প্রতীক্ষায় তাকাইয়া আছে লক্ষ্য করিয়া তাড়াতাড়ি মিথ্যা বানাইয়া বলে, "দুই তিন দিনের মধ্যেই সে আসবে।"

এরই মধ্যে ধাত্রী আসিয়া পড়ে। প্রশান্ত বাহির হইয়া যায়।

সে তাহার ঘরের জানালা দিয়াই দেখে, জয়কে লইয়া উহারা আঁতুড় ঘরে ঢোকায়।

"অসহ্য !" মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে সে, "বৃথাই ডাক্তারি শেখা এ অন্ধদেশে। মেয়েটা মরিয়া গেলেও কোনও প্রতিকার করার উপায় নাই তাহার।"

সে তাড়াতাড়ি সাইকেল লইয়া বাহির হইয়া পড়ে। মধু ডাক্তারকে একটা খবর দিয়া রাখে, ডাক পড়িলেই যেন তিনি সেই মুহূর্তেই চলিয়া আসেন।

তিনদিন কাটিয়া যায়—তবু জয়ার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় না। প্রশান্ত মাসীমাকে আসিয়া বলে, "সময় থাকতে মধু ডাক্তারকে ডেকে আনি। শেষ সময়ে এসেত কোনও লাভ নেই।"

বুড়ি-ধাই চটিয়া যায়, "আমার এইহাতে হাজার ছাওয়ালের ফুল কাটা হইছে। এর চাইতে কত সাংঘাতিক হয়। ছাওয়ালের মুখ দেখা অত সোজা না ; একটুত কষ্ট পাইতেই হইবে।"

বনলতারও অভিজ্ঞতা নাই এবিষয়ে, ভাবে, 'ধাইয়ের কথাই ঠিক, পুরুষ মানুষ, ও এসবের কি বোঝে।'

চারুবালা আসিয়া অবস্থা দেখিয়া বলে, "দিদি আমারও মনে হয় ডাক্তার ডাকাই ভাল।"

ডাক্তার আসিয়া নাড়ী দেখিয়া ভয় পাইয়া যায়—বাঁচান যায় কি না সন্দেহ। বনলতা যেন অন্ধকার দেখে। বারে বারে গোপাল ঠাকুরের নাম লয়—সোনার তুলসী মানত করে।

প্রশান্ত চলিয়া যায় সাইকেলে—বিশ্বজিতের নিকট একটা জরুরী খবর পাঠাইয়া দেয়। মন দুশ্চিন্তায় ভরিয়া উঠে—বিশ্বজিৎকে কি বলিবে সে ?

বহুকষ্টে ডাক্তার ধাত্রীতে হয়রাণ হইয়া, জয়াকে অজ্ঞান করাইয়া সন্তান ভূমিষ্ঠ করা হয়। সুন্দর নিখুঁত ছেলে—শিশুটি নড়িয়া কাঁদিয়া উঠে প্রথম আলোর স্পর্শে।

ডাক্তার নিশ্বাস ফেলে, "যাক এখনকার মত 'ক্রাইসিস' কেটে গিয়েছে। তবে খুব সাবধান। ওকে আর এ ঘরে রাখা চলবেনা। ঘর বদলাতে হ'বে।" কড়া আদেশ দিয়া বাহির হইয়া যায় মধু ডাক্তার।

প্রশান্তর মন কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠে ডাক্তারের প্রতি।

কনকনেঠাণ্ডা হাওয়া। ঝড়ো হাওয়া আরম্ভ হইয়াছে। নারকেল গাছের মাথাগুলি ছুঁইয়া ছুটাছুটি করে পাগলা হাওয়া। দরজা জানালাগুলি কাঁপিয়া উঠে, মাঝে মাঝে ঘন মেঘে ঢাকা আকাশ। ঘরের মধ্যে জ্বরে বেহুস অমলেন্দু। বাতাসের শব্দে চমকিয়া উঠে বারে বারে।

রহমান অধীর হইয়া প্রতীক্ষা করে—এখনও নমিতা আসিয়া পৌছায় না কেন।

ডাক্তার সেন ঘড়ি দেখিয়া ওষুধ খাওয়ায় রোগীকে, মাথায় জলপটি বদলাইয়া দেয়।

নদীতে ঝড় আরম্ভ হইয়াছে। নমিতা আর বিশ্বজিৎ থমকিয়া দাঁড়ায়।

কাল হইয়া আসিতেছে ওপারে। এই দুর্যোগে কোন মাঝিই নৌকা ছাড়িতে রাজী হয় না।

নমিতা ব্যাকুল হইয়া হাতের চুড়ি খুলিয়া দেয় একটা বুড়া মাঝির হাতে, "একটু দয়া ক'রে ওপারে পৌঁছে দাও মাঝি ভাই।"

বৃদ্ধ মাঝির দয়া হয় তাহার এই ব্যাকুল অবস্থা দেখিয়া।

মনে মনে ভাবে—এই হাতে কত বড় বড় ঝড়ে সে নদী পাড়ি দিয়াছে, এ আর এমন কি দুর্যোগ! আল্লার নাম লইয়া সে নৌকা ছাড়িয়া দেয়।

রাত হইয়া গিয়াছে। নমিতা অমলেন্দুর ঘরে ঢোকে নিঃশব্দে।

ডাক্তার সেন ও রহমানের মুখের ভাব দেখিয়া হতাশায় ভাঙ্গিয়া পড়ে সে, "ডাক্তারবাবু, বাচবে ত?"

জ্ঞান নাই অমলেন্দুর। মাঝে মাঝে প্রলাপ বকিতেছে।

নমিতা তাহার বুকের উপর নিঃশব্দ কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়ে।

মাঝরাতেই সব শেষ হইয়া যায়। শক্ত করিয়া ধরে নমিতা অমলেন্দুর হাতটা। এই দুর্নিবার স্রোতের বুকে তাহার একমাত্র আশ্রয়। মূক নমিতা। পাথরের মত স্থির হইয়া গিয়াছে তাহার ভিতরটা। সমস্ত জগৎ যেন ঘুরিতে থাকে, অন্ধকার হইয়া আসে চোখের সামনে—মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে নমিতা।

নিশ্চল মুহূর্তগুলি। বিশ্বজিতের ভিতরটাও স্থির হইয়া যায়। এই প্রথম সে উপলব্ধি করে—মৃত্যুর মত এত করুণ, এত নিষ্ঠুর পৃথিবীতে

কিছু নাই। নিঃস্ব নমিতা—কি লইয়া বাঁচিবে সে। বিশ্বজিৎ ভাবিতেও পারে না।

সাতদিন পর—তাহার সঙ্গে নমিতার দেখা হয়। নমিতার জীবনে কতযুগ কাটিয়া গিয়াছে এই সাতদিনে।

রহমানের নিকট আসিয়াছে সে। তাহার গহনাগুলি সব দিতে আসিয়াছে, "দাদু এগুলি ভাল কাজে লাগাবে।"

শান্ত ধীর কণ্ঠস্বর।

বৃদ্ধ রহমান তাহার দিকে তাকাইতে পারে না। বহুদিন পর আবার তাহার চোখ জলে ভরিয়া উঠে। বহুদিনের ভুলিয়া যাওয়া জীবনের প্রথম অধ্যায়ের একটি করুণ সুর আবার জাগিয়া উঠে মনের কোনে।

ঠিক এই নমিতার মতই একটি মাত্র মেয়ে তাহার আমিনা। সেও এমনি ভাবেই তাহার বুকটা পুড়াইয়া রাখিয়া গিয়াছিল।

নমিতা রহমানের নিকট কাজ চায়—অফুরন্ত কাজ। অমলেন্দুর অসমাপ্ত কাজের ভার লইতে আসিযাছে সে।

একমাস হইয়া গিয়াছে জয়ার ছেলে হইয়াছে, এব মধ্যে বিশ্বর আর কোনও খবর পায় নাই সে। জয়ার শরীর এখন দুর্বল—নামা উঠা করা নিষেধ—উপরেই থাকে সে।

চিন্তাকুল মনে জয়া প্রতীক্ষা করিতে থাকে—বিশ্বর সংবাদের জন্য। তাহার প্রথম সন্তান, অথচ যার সন্তান সেই দেখিল না। কোথায় আছে, কেমন আছে সে, কে জানে! জয়ার মন উতলা হইয়া উঠে। বারে বারে প্রশান্তকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে, "কিছু জানলে?"

প্রশান্ত সান্ত্বনা দেয় শাসনের সুরে, "অত অস্থির হচ্ছ কেন তুমি! এখন তার খুবই সাবধানে থাকা দরকার। আজকের পত্রিকাটা দেখেছ ত—কি রকম ধর পাকড় আরম্ভ হ'য়েছে।"

জয়া চুপ হইয়া যায়।

স্বামীর কাজের দায়িত্ব সেও উপলব্ধি করে। তাহার অত দুর্বল হইলে চলিবে না—মনকে প্রবোধ দেয় জয়া।

মাঝ-রাত্রিতে ইন্দুরগুলি নড়াচড়া করে অনবরত। জয়া বারে বারে চমকাইয়া উঠে! কান পাতিয়া শোনে, যেন কাহার নিশ্বাসের মত লাগে। মৃদু পদশব্দ!

বারান্দায় গিয়া দাঁড়ায় সে নিঃশব্দে। ঘন অন্ধকারের ভিতর সন্ধানী দৃষ্টিতে কি যেন তল্লাশ করে। নীচে দুয়ারে কুকুরটা ডাকিয়া উঠে একটু। তারপরই চুপ হইয়া যায় কুকুরটা।

অন্ধকারের মধ্যেও জয়া যেন অনুভব করে কে যেন মৃদু হাতে কুকুরটাকে হাত বুলায়।

বারান্দার রেলিংয়ের উপর ঝুঁকিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে জয়া। চোখের তারা দুইটা টন টন করিতে থাকে। শরীরের মধ্যে একটা কাঁপুনি খেলিয়া যায়।

বিশ্ব, বিশ্বজিৎ তাহার স্বামীর মতই অস্পষ্ট ছায়া মূর্তি। পাঁচমিনিট দশ মিনিট আধঘণ্টা কাটিয়া যায়। কই সিঁড়িতে কোন পায়ের শব্দ শোনা যায় না। নিস্তব্ধ রাত্রি। কোনও সাড়া নাই কোথায়ও। একটা দমকা ঘূর্ণি হাওয়া লিচু গাছটাকে ছুঁইয়া শব্দতরঙ্গে মিলাইয়া যায়।

জয়া উঠিয়া আসে। নরমবিছানাটার উপর হতাশায় ভাঙ্গিয়া পড়ে। অবুঝ কান্না বুকের ভিতর গুমরাইতে থাকে। শঙ্কায় মন ভরিয়া উঠে, কাল কাল অশুভ চিন্তার কুণ্ডলী।...

চাবুকের কালশিরা সর্বাঙ্গে। কিন্তু ও কার মুখ? চেনা চেনা লাগে অনেকদূরে সারি সারি বধ্য আসামী। ওরা কারা?

চাবুকের ছিলাটা উঠে নামে ঘন ঘন।

"উঃ"—একটা ক্ষীণ আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে জয়ার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়।

বড় বড় বিস্ফারিত চোখে ভাল করিয়া অনুভব করে সে দিনের আলো তখনও ঘনঘন নিশ্বাস পড়ে বুকের ভিতর।

উঃ কি ভয়ানক স্বপ্ন! জয়া যেন রক্ষা পায়, আশ্বস্ত হয়, ভোরের আলো দেখিয়া।

স্বপ্নে দেখা চেহারাটা মনে করিতে চেষ্টা করে। আবছা মূর্তিগুলি।

সকালবেলা প্রশান্ত একটুকরা কাগজ দেয় জয়াব হাতে। বিশ্বজিৎ লিখিয়াছে, "জয়া রাতে দেখা হবে।"

সে যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছেনা। বারেবারে কাগজটুকু পড়ে। বিশ্বই লিখিয়াছে—তাহারই হাতের লেখা।

সে আসিবে, আজই আসিবে। জয়াব রুগ্ন পাণ্ডুর মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠে। প্রশান্তব চোখে স্নেহ ঝরে—সে জয়ার মনের অবস্থাটা অনুমানে বুঝিয়া লয়। প্রশান্ত আস্তে আস্তে বলে, "শুধু মাসীমাকে জানিও। আবেকটা কথা শুধু রাত্রিটা থাকবে সে, বুঝলেত!" জয়া বোঝে সব। বিদায়েব জন্য আগে হইতেই মন প্রস্তুত করিয়া রাখার ইঙ্গিত।

সারাটা দিন আব কাটে না। দুপুরে বারে বারে ঘড়ি দেখে জয়া। বিশ্বর চিঠিটুকু বারে বারে পড়িয়া দেখে—প্রিয় হস্তাক্ষর। বিশ্বর বইগুলি এলোমেলো হইয়া আছে অনেকদিন যাবৎ। গুছাইবে গুছাইবে করিয়াও গুছান আর হয় নাই।

জয়া বসিয়া বসিয়া আলমারির তাকে তাকে বইগুলি সযত্নে গুছাইয়া রাখে সুন্দর করিয়া। তবু সময় কাটে না। তিনটাই বাজে নাই।

বনলতা চুলের ফিতাকাটা লইয়া আসে উপরে, সযত্নে চুল বাঁধিয়া দিয়া সিঁদুর পরাইয়া দেয় সিঁথিতে। নীচে যাইবার আগে বলিয়া যায়, "আজ ত ধোপার বাড়ী কাপড় যাবে, তুমি ও শাড়িটা বদলে নাও। আমি ক্ষ্যান্তকে দিয়ে শাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

জয়া মনে মনে হাসে শাশুড়ীর খেয়াল দেখিয়া। বনলতা ভাবে, 'বৌটার সাজসজ্জার দিকে কোনদিন যদি একটু খেয়াল হবে। দশআনির বৌদের সাজসজ্জার কত সরঞ্জাম!'

সে নীচে গিয়া জয়ার বাক্স খুলিয়া একখানা কাঁঠালীরংয়ের শাড়ি ক্ষ্যান্তর হাতে দিয়া বলে, "বৌকে দিয়ে আয়। কত লোকজন আসে ছেলে দেখতে আর ছেলের মা এক পেত্নী সেজে বসে থাকেন।"

বনলতার আজ কি খেয়াল হয়। ময়দা বাহির করিয়া খাবার করিতে বসে।

বাড়ীর সবাই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। গভীর রাত্রি। ঘড়িতে বারোটা বাজিতেছে জয়া শুনিতে থাকে এক দুই তিন.........অধীর প্রতীক্ষায় তাহার বুকটা ঢিপ ঢিপ করিতে থাকে।

কান পাতিয়া আছে সে জানালার ধারে দাঁড়াইয়া। শুধু নিজের বুকের স্পন্দনের উঠানামার শব্দই কানে আসে। গাছের পাতাগুলি পর্যন্ত যেন স্থির হইয়া আছে কাহার প্রতীক্ষায়। হঠাৎ এক অতি পরিচিত স্পর্শে জয়ার শরীরে একটা পুলকিত শিহরণ খেলিয়া যায় বৈদ্যুতিক ঝঙ্কারের মত—বিশ্বজিৎ জয়াকে বুকের মধ্যে টানিয়া লয় নিবির বন্ধনে। শেড্ দেওয়া টেবিল ল্যাম্পের মৃদু আলো আসিয়া পড়ে তাহার চোখেমুখে—জয়ার মুখ

এক স্নিগ্ধ লাবণ্যে ভরিয়া উঠে। মনের মধ্যে সহস্র প্রশ্ন ভিড় করে, কিন্তু কিছুই বলিতে পারে না সে।

কতদিনের জন্য বিদায় লইতে আসিয়াছে? এতদিন কেমন ছিল? কত কিছু যে জানিবার আছে। এই একটু সময়ের মধ্যেই সব জানিতে হইবে। অভিভূত হইয়া পড়ে সে।

জয়া নিজেকে সামলাইয়া লয়, "যাই মাকে সংবাদ দিয়ে আসি।"

বিশ্বজিৎ দুষ্ট হাসি দিয়া বলে, "মা' আপনার আগেই জানেন। প্রশান্তও নীচেই আছে। তারপর খবব কি? মা হ'য়েত বসে আছ। খুব কষ্ট পেয়েছিলে ত, বেঁচে যে আছ তা'তেই ধন্যবাদ।"

জয়া অবাক হয় বিশ্বজিৎ এতসব সংবাদ পাইল কি করিয়া?

বনলতা খাবার লইয়া আসে, "চারটি খেয়ে নে। আবার কতদিনে যে কি জুটবে কপালে!" বিশ্বজিৎ খাইতে বসিয়া দেখে, তাহার অতিপ্রিয় থোরের ঘণ্ট।

মার দিকে তাকাইয়া বলে, "এর মধ্যে এতসব করে রেখেছ?"

তাহার মনে হইতে থাকে সে যেন অমৃত গিলিতেছে। বনলতা অনুযোগের সুরে বলে, "আমার দিকেত তাকালিই না, কিন্তু এই মেয়েটার দিকেত এখন তাকান উচিত। ছেলে হল এবাবত তোমার মোড় ফেরা উচিত।" মাব কথা শুনিয়া বিশ্বজিৎ সলজ্জ হাসি হাসে একটু, মনে মনে ভাবে, "আরও জোর দিয়ে শুরু করা উচিত।"

ছেলের খাওয়া হইলে বনলতা উঠিয়া পড়ে, "একটু বিশ্রাম করে নে। রাতেই চলেই যাবি?" বিশ্বজিৎ মৃদু হাসিয়া উত্তর দেয়, "আবার শীগ্‌গীরই আসবো। আমি বেশ ভালই আছি কোনও চিন্তার কারণ নেই।"

বনলতা নীচে নামিয়া আসে।

পাশের খাটের উপর ছোট্ট শিশুটি নড়িয়া চড়িয়া কাঁদিয়া উঠে। জয়া উঠিয়া ছেলেকে কোলে লয়।

বিশ্বজিৎ অদ্ভুত বিস্ময়ে তাকাইয়া থাকে। এরই মধ্যে কি অদ্ভুত পরিবর্তন জয়ার। বিশ্বজিৎ মুগ্ধ দৃষ্টিতে জয়ার এই নূতন মূর্তির দিকে তাকাইয়া দেখে। কি অপরূপ, কোমল ছোট্ট মানুষটি। জয়া একটু আবক্তিম হইযা ছেলেকে শোওয়াইয়া দিয়া বলে, "ও কার মত দেখতে হয়েছে বলত ?" বিশ্বজিৎ জয়ার হাতে মৃদু চাপ দিয়া বলে, "ঠিক তোমার মত।"

তাহার চোখে প্রেম ঝরে।

মনের মধ্যে সহস্র প্রশ্ন উঁকি মারে, 'ঐ ছোট্ট শিশুটি তাহারই সন্তান, তাহাদের ভবিষ্যৎ সুস্থ সমাজের উজ্জ্বল স্বপ্ন!'

বিশ্বজিৎ লক্ষ্য করে, জয়ার মুখে একটা ম্লান ছায়া পড়িয়াছে। মনে মনে ভাবে সে, এত কষ্ট পাইয়াছে ছেলে হইতে—তাই শরীর এখনও সারে নাই।

জয়া তাহার পায়ের উপর মুখ গুজিয়া চুপ হইয়া থাকে।

বিশ্বজিৎ তাহার মুখ তুলিয়া দেখে চোখে জলভরা। "ওকি জয়া তুমি কাঁদছো? তোমার কাছে এ আশা করিনি।"

জয়া যেন কি বলিতে চায়,—অবরুদ্ধ অশ্রুতে সে কথা বলিতে পারে না। বিশ্বজিৎ তাহার চুলগুলিতে হাত বুলাইয়া দিয়া সস্নেহে বলে, "জয়া তুমিও যদি ভেঙ্গে পড় তাহ'লে আমি দাঁড়াই কোথায়—"

জয়া তাহাকে বাধা দিয়া ব্যস্ত হইয়া বলে,"তুমি ভুল বুঝোনা আমাকে। তুমি বুঝতে পারছোনা। আমি সবই সহ্য করতে পারি—যদি জানি তুমি আমায় ক্ষমা করেছ। তোমার সঙ্গে আর দেখা হ'বে কিনা জানি না—"

বিশ্বজিৎ বাধা দিয়া বলে, "দেখোত কি পাগল—আর দেখা হ'বে না ভাবছো কেন? শীগ্‌গীরইত আমি আসবো।"

জয়ার চোখের জল তবু বাধা মানে না। সে ধীরে ধীরে বলিয়া যায়, "আমার কেন যে মনে হ'চ্ছে—আমি আর বেশীদিন বাঁচবো না! যদি আর দেখা না হয়, আমার এইটুকু শেষ অনুরোধ, আমার কাছ থেকে পাওয়া আঘাত সব তুমি ভুলে যেও। যাবার আগে তুমি আজ আমাকে কথা দিয়ে যাও।"

বিশ্বজিৎ স্তব্ধ হইয়া যায়।

একটু চিন্তিত হইয়া ভাবে, 'এ ধরণের চিন্তা করছে কেন ও!'

ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখে—জয়ার চোখের কোনায় স্পষ্ট কাল রেখা পড়িয়াছে।

এ শুধু শারীরিক অসুস্থতার জন্যই নয়—দীর্ঘ দিনের ভাঙ্গিয়া পড়া মনের স্থায়ী নৈরাশ্যের ছাপ চোখের কোনায়। সে জয়ার হাতটা ধরিয়া বলে, "জয়া, তুমি এত খারাপ দিকটাই ভাব কেন? মা হ'য়েছ-এখন তোমার দায়িত্ব কত!"

জয়া ধীর কণ্ঠে বলে, "তোমাকে যে আমি কত আঘাত করেছি, সে দুঃখ যে আমি ভুলতে পারি না।"

"কিন্তু দিয়েছওত অনেক, সেটাও ত আমি ভুলতে পারি না।" বিশ্বজিৎ জয়াকে কাছে টানিয়া লয়। রাত শেষ হয় হয়। বিশ্বজিৎ যাইবার জন্য প্রস্তুত হয়।

জয়ার হাতে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়া বলে, "বাজে চিন্তা ক'রো না, বীর ছেলের মা হ'তে হবে—মনে যেন থাকে।"

ঘুমন্ত শিশুটির মাথায় মৃদুস্পর্শ করিয়া তাহার কল্যাণ কামনা করে। নীচে গিয়া মাকে প্রণাম করিয়া রওয়ানা হইয়া যায়।

কাঞ্চনপুরের মাঠের শেষে প্রশান্ত সাইকেল লইয়া দাঁড়াইয়া। বিশ্ব তাহার হাতে সস্নেহ ঝাঁকুনি দিয়া সাইকেলে উঠিয়া পড়ে। যাবার আগে বলিয়া যায়, "জয়া একটু ভেঙ্গে পড়েছে। একজন ভাল ডাক্তার দিয়ে ওকে দেখাস একটু। তোর উপরই ওর সম্পূর্ণ দায়িত্ব রইল।"

মুহূর্তের মধ্যে সাইকেলটা দূরে মিলাইয়া যায়। প্রশান্ত খালের ধার দিয়া ফিরিয়ে চলে। খালের ওপারে মুসলমান বাড়ীগুলি হইতে মাঝে মাঝে মুরগীর ডাক শোনা যায়।

প্রশান্ত উন্মনস্ক হইয়া কি যেন ভাবিতে ভাবিতে চলে। মনটা কেমন যেন এক বিদায় ব্যথায় ভারি হইয়া থাকে।

সাতদিন না যাইতেই বিশ্বজিৎ ধরা পড়ে।

প্রশান্ত আসিয়া সংবাদ দেয় জয়াকে। জয়া চুপ করিয়া শোনে। এ সংবাদ তাহার নিকট আকস্মিক নয়—সে মন প্রস্তুত করিয়াই রাখিয়াছিল এ সংবাদের জন্য।

জয়ার চলাফেরা করা এখনও নিষেধ। সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে বেশির ভাগ সময়। মাঝে মাঝে ঘুমন্ত শিশুটির দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে—ঠিক যেন বিশ্বজিতেরই শিশুমূর্তি।

প্রশান্ত যখনই ঘরে ঢোকে, সে লক্ষ্য করে—জয়া উন্মনা হইয়া কি যেন ভাবিতেছে। তাহার কানে বাজে, বিশ্বজিতের সেই যাবার দিনের শেষ কথা, 'জয়া একটু ভেঙ্গে পড়েছে ওকে দেখিস।' জয়াকে প্রফুল্ল রাখিবার জন্য যে প্রাণপণ চেষ্টা করে—তাহাদের ছোটবেলার গল্প করে, কি করিয়া বিশ্বদার সঙ্গে তাহার ঘনিষ্টতা হইল।

বহুদিন পর জয়া প্রশান্তকে অনুরোধ করে, "একটা গান শোনাবে প্রশান্ত; কতদিন তোমার গান শুনিনি!" প্রশান্ত গান করে—গানের সুর বাতাসে কাঁপিয়া কাঁপিয়া দূরে মিলাইয়া যায়। জয়া তন্ময় হইয়া শোনে। চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে তাহাদের সেই চরে বেড়ানর কথা। শান্তাদির কথা মনে পড়ে। এখন আর তাঁহার মনে শান্তাদির প্রতি কোনও বিদ্বেষভাব নাই।

প্রশান্তকে জিজ্ঞাসা করে, "শান্তাদি কোথায় এখন জান?"

"এখন সে মেথর বস্তিতে কাজ করছে—মেয়ে শ্রমিকের মধ্যে।"

জয়া মনে মনে দূরদেশের একটি মেয়ের কল্যাণ কামনা করে।

তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে—তালতলার বস্তির ছবিগুলি।

মানুষের প্রতি মানুষের কি অবিচার!

জয়া প্রশান্তকে বলে, "আমাদের এখানেও ত কুলী মেয়েদের বস্তির মধ্যে কাজ করতে পারি আমি। তোমার মাসীমাকে বুঝিয়ে বলে দেখবে কি?"

প্রশান্ত খুশি হইয়া বলে, "তা'হলেত খুব ভাল হয়। আগে শরীরটা সারিয়ে তোল শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর।" হঠাৎ সে লক্ষ্য করে—তাকের উপর ওষুধের শিশিটা ঠিক একভাবেই পড়িয়া আছে—একদাগও ওষুধ খাওয়া হয় নাই।

প্রশান্ত অনুযোগ দিয়া বলে, "এ ভাবে চললে ত চলবে না। বিশ্বদা তোমার জন্য এত ভাবে—আর তুমি এতখানি দায়িত্বহীন হ'লে কি ক'রে চলবে! তোমার এখন তাড়াতাড়ি সুস্থ হবার কত প্রয়োজন। ভাল হ'য়ে তুমি যদি এখানকার মেয়েদের মধ্যে কাজ করতে পার, বিশ্বদাও কত খুশি হবে ভাবত। আর আমার মনে হয় মাসীমাও হয়তো আর আপত্তি করবে না।"

ভবিষ্যতের কর্মময় জীবনের কল্পনায় জয়া আবার মুখর হইয়া উঠে।

ক্ষ্যান্ত আসিয়া ছেলেকে দিয়া যায়, "একটু ধরত। আমি স্নানটা সেরে আসি। আর চেহারার ছিড়ি ফেরাওত—দু'দিন পর ছেলের ভাত হবে—কত লোকজন আসবে—তাড়াতাড়ি এখন গায়ে পায়ে জোর কর।'

ক্ষ্যান্ত বলিতে বলিতে চলিয়া যায়।

জয়া প্রশান্তের দিকে তাকাইয়া বলে, "ক্ষ্যান্ত মাসীর ঐ শুধু এক কথা।"

প্রশান্তও হাসিয়া বলে, "আমাদেরও ঐ এক কথা। ঠিকইত ছেলের অন্নপ্রাশন হ'বে, এখন শরীর সারাও শীগ্‌গীর।

জয়া নির্নিমেষ নেত্রে দেখে শিশুটিকে।

প্রশান্তও প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলে, "নিজে পেত্নী হ'তে চল্‌লে কি হ'বে—ছেলেত সুন্দর হ'চ্ছে দিন দিন। 'ও ঠিক বিশ্বদার মতই বলিষ্ঠ হ'বে কালে।"

দেখিতে দেখিতে মাসগুলি কাটিয়া যায়। বিশ্বজিৎ টেলিগ্রাম করিয়াছে সে খালাস হইয়াছে—আজই বাড়ী আসিতেছি।

প্রশান্ত খুশি হইয়া জয়ার ঘরে ঢোকে টেলিটা লইয়া। জয়া নিঃশব্দে পড়িয়া দেখে টেলিটা।

তাহার চোখ দুটিতে একটু আশার দীপ্তি খেলিয়া যায়। কিন্তু কোন কথা বলে না। প্রশান্ত বোঝে তাহার মনের অবস্থাটা। তাকাইয়া দেখে একটু জয়ার মুখের ম্লানদীপ্তি। সেও ম্লান হইয়া যায় জয়ার কথা ভাবিয়া।

ডাক্তারের রিপোর্ট আসিয়াছে কয়দিন আগে, জয়ার যক্ষ্মা হইয়াছে, বাঁচার আশা কম। জয়া চুপ হইয়া ভাবে বিশ্বজিৎ আসিয়াছে ; সে কি তাহাকে ভাল করিতে পারিবে না ? তার যে কত কাজ বাকী। সেও যে বিশ্বজিতের কাজের সঙ্গে নিজেকে বিলাইয়া দিবে ভাবিয়া রাখিয়াছিল। সে আশা কি পূর্ণ হইবে না ?

তাহার চোখের দৃষ্টি স্থির হইয়া যায়—অশ্রুভেজা সুখস্বপ্ন।

বিশ্বজিৎ সকাল বেলায়ই আসিয়া পৌছায়। প্রশান্ত স্টেশনে যায়।

বিশ্বজিৎ প্রশান্তর হাত চাপিয়ে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করে, "ভাল খবর ত?"

প্রশান্ত চুপ হইয়া যায়।

বিশ্বজিৎ শঙ্কিত হইয়া প্রশ্ন করে, "জয়ার অসুখ খুব বেশি নাকি ?"

প্রশান্ত ম্লানস্বরে উত্তর দেয়, "থাইসিস।" আর কিছু বলিতে পারে না সে।

বিশ্বজিৎ স্থির কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করে, "এরোগ কতদিন হ'ল ধরা পড়েছে ?" যেন সে এই সংবাদের জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছে।

"মাত্র সাতদিন হ'ল রিপোর্ট এসেছে।" প্রশান্ত নত মুখে উত্তর দেয়।

বনলতা নাতি লইয়া গোয়াল বাড়ীর পেছনে দাঁড়াইয়া আছে ছেলের অপেক্ষায়।

বিশ্বজিৎ মাকে প্রণাম করে।

বনলতা একটু স্মিত হাসি দিয়া বলে, "ছেলেকে চিনলিত ? এমন বাপের ছেলে ইনি—যে বাপকেও ছেলে চিনিয়ে দিতে হয়।"

শিশুটি ঠাকুরমার আঁচল ধরিয়া এক দৃষ্টিতে দেখে নূতন লোকটিকে।

বিশ্বজিৎ একটু সলজ্জ চোখে তাকাইয়া দেখে ছেলেকে।

ক্ষ্যান্তও স্নেহের শাসনভরা সুরে ঝাঁঝিয়া উঠে, "তা' ছেলেই বা বাপকে চিনবে কি করে, বাপ যদি জেলে জেলেই থাকে ?"

বিশ্বজিতের মনের মধ্যে এক অভুতপূর্ব অনুভূতিতে মৃদুপীড়ন করিতে করিতে থাকে। মায়ামাখান কোমল অনুভূতি। কি নরম শিশু মুখ! তাহারই সন্তান—তাহার জয়ার প্রথম সন্তান।

উপরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া জয়া আবেগভরা দৃষ্টিতে দেখে পিতাপুত্রের প্রথম মিলন।

বিশ্বজিতের চোখ পড়ে জয়াব উপর, মনটা ব্যথিত হইয়া উঠে।

বনলতা ঘরে আসিয়া বলে, "জয়া উপরে আছে। প্রশান্তর মুখে শুনেছিস্ ত সব।"

বিশ্বজিৎ উপরে আসিয়া জয়ার হাতটা শক্ত কবিয়া চাপিয়া ধরে। কাছে টানিয়া লইয়া আকুলস্বরে বলিয়া উঠে সে, "জয়া কেন এমন করলে ? এত লিখলাম শবীরের দিকে তাকাতে, তবু একটু দয়া হ'লনা তোমার ?"

জয়ার চোখ জলে ভরিয়া উঠে।

নত হইয়া সে স্বামীর পায়ে প্রণাম করে। মনে মনে বলে, 'তোমার আশীর্বাদে আবার ভাল হ'য়ে উঠবো।'

বিশ্বজিৎ বাধা দেয়না তাহাকে। শুধু তাকাইয়া দেখে তাহার শরীবেব অবস্থা। মনের মধ্যে তোলপাড় করিতে থাকে তাহার, "জয়া আমাব একি সর্বনাশ করলে তুমি!"

জয়া বলিতে থাকে, "গৌতমকে আর আমার ধরার অধিকার নেই।" তাহার কণ্ঠস্বর ভারি হইয়া উঠে। "তুমি কিন্তু ওকে দেখো। আমি ত তোমার কোনও সাহায্য করতে পারলাম না, ও করবে আমার সে কাজ।" তাহার চোখে ক্ষীণ আশা ফুটিয়া উঠে।

বিশ্বজিৎ জয়ার মনের অবস্থা দেখিয়া কিছুই আর ভাবিতে পারে না। অমঙ্গল আশঙ্কায় হতাশ হইয়া বসিয়া পড়ে।

প্রশান্ত লক্ষ্য করে বিশ্বজিৎ এবার বাড়ী আসিয়া কাহারও সঙ্গে দেখা করে না। চুপ হইয়া কি যেন ভাবে সর্বদা।

প্রশান্ত বিশ্বজিতের কাঁধে হাত রাখিয়া ডাকে, ''বিশ্বদা, তোমার কথা রাখতে পারি নি। অযোগ্যের উপর জয়ার ভার দিয়েছিলে তুমি। তবু আশা ছেড়ে দিচ্ছ কেন? ভাল জায়গায় নিয়ে গেলে ভালওত হ'তে পারে।"

বিশ্বজিৎ স্থির কণ্ঠেই উত্তর দেয়, "তোর দোষ কি প্রশান্ত। তুই আর কিইবা করতে পারতিস। আমিই এর জন্য দায়ী। এখন আর সময় নেই। আমি শুধু ভাবি এই পরিণতির জন্য কেন যে ওকে টেনে আনলাম আমার এ শেকল লাগান বাড়ীতে। এ সমাজ ভেঙ্গে চুরে যতদিনে নূতন করে গড়ে না উঠবে ততদিন এ দেশের ঘরে ঘরে এ পরিণতি থেকে বাঁচার পথ নেই। মন যাদের এগিয়ে গিয়েছে বহু আগে তাদের এই সমাজের আবহাওয়ায় বেঁচে থাকার উপায় নেই। তাই একদল যারা প্রতিবাদ করতে শেখেনি তারা নিঃশেষে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরবে। আরেক দল হাতুড়ি নিয়ে শুরু করবে এ সমাজকে ভেঙ্গেচুরে নূতন সমাজ গড়ে তুলতে। আইডিয়ালিজমকে যাদের বাস্তবে রূপান্তরিত করার শক্তি না থাকে তারা তাদের সেই আইডিয়ালিষ্ট মনকে ধীরে ধীরে নিয়ে যাবে স্বর্গের অপমৃত্যুর দিকে। জয়াও সেই জাতের মেয়ে। আজকের পৃথিবীকে সহ্য করার পক্ষে বড় দুর্বল। তাই ও বাঁচতে পারল না। বড় বেশী ভাবপ্রবণ মন ওর। কল্পনার স্বর্গ হ'তে বিদায়ের দুঃখ সইবার মত শক্তি ওর ছিলনা।"

বিশ্বজিৎ জয়াকে লইয়া চেঞ্জে যাইবে ঠিক হইয়াছে। গৌতম তাহার ঠাকুরমার কাছে থাকিবে।

জয়া ঘরে ঢোকে। স্নান করিয়া আসিয়াছে এইমাত্র। লালপাড় খদ্দরের একটা শাড়ি পরিয়াছে। বিশ্বজিতের বুকের মধ্যে যেন হুহু করিয়া উঠে—বহুদিনের পুরান স্মৃতির দমকা হাওয়া একটা।

স্নেহ প্রেম আশা নিরাশার নিপীড়ণ।

প্রথম যেদিন জয়ার সঙ্গে তাহার দেখা হয় সুব্রতর বাড়ীতে, এই শাড়িটাই পরা ছিল তার সেইদিন। শাড়িখানা সযত্নে তুলিয়া রাখিয়াছিল জয়া। সেইদিন ও আজকের দিনের ভিতরে কত ঝড় যে বহিয়া গিয়াছে বিশ্বজিতের এই জীবনপ্রারম্ভেই ; বাহিরের আত্মিয়, বন্ধু তাহার কতটুকু খোঁজ রাখে। বিশ্বজিৎ জয়ার হাতদুটি টানিয়া লয় নিজের হাতের মধ্যে, "জয়া, তুমি শীগ্‌গীর ভাল হ'যে ওঠ। আমি আর তোমাকে দূরে সরিয়ে রাখবো না। আমাদের কত কাজ যে বাকি! এবার দু'জনে একসঙ্গে নেমে পড়বো আমরা—এই জীর্ণ সমাজ ভেঙ্গেচুরে নূতন সমাজ গড়ার কাজে।"

বিশ্বজিৎ হঠাৎ পেছনে ছোট্ট নরম হাতের স্পর্শে চমকিয়া উঠে, "গৌতম এখানে উঠে এল কি ক'রে?"

জয়া ব্যস্ত হইয়া উঠে, "ওকে নীচে নিয়ে যাও শীগ্‌গীর।"

বিশ্বজিৎ ছেলেকে কোলে তুলিয়া লয়। জয়া মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকাইয়া বলে, "ওকে তুমি আমার হ'য়ে আদর ক'রো। আমি যদি মরে যাই। তুমিই ওকে মানুষ করে তুলো—তোমার মহান আদর্শে।"

বিশ্বজিৎ স্নেহের সুরে বলে, "তুমি এত খারাপ দিকটাই ভাব কেন জয়া? তুমিইত ভাল হ'য়ে নিজের হাতে ওকে গড়ে তুলবে।"

বিশ্বজিৎ ছেলেকে মার কাছে দিয়ে যায়। গৌতম তাহার বাবার গলা জড়াইয়া সমানে চেঁচাইতে থাকে—"মা-মা।"

বিশ্বজিৎ জয়াকে লইয়া কলিকাতায় আসে।

প্রিয়ব্রত আসিয়া দিদির সঙ্গে দেখা করে। দিদির বিয়ের পর একবার মাত্র সে দিদির বাড়ী গিয়াছিল। তারপর আর দেখা হয় নাই। জয়াও বিয়ের পর একবারও দেশের বাড়ীতে যাইতে পারে নাই। একটা না একটা বাধা লাগিয়াই ছিল।

সুব্রত এখন দেশে। সে এখন ডাক্তারী করিতেছে, আয়ও সচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে।

প্রিয়ব্রত দিদির অবস্থা দেখিয়া চমকিয়া উঠে। চিন্তিত হইয়া ভাবে, 'বাবা খুবই ভেঙ্গে পড়বেন।' জয়া অনেকদিন পর ভাইকে দেখিয়া খুশি হয় খুব। আবার চোখও জলে ভরিয়া উঠে, "প্রিয়ব্রত, আমকে তোরা ভাল করে দিবি?" প্রিয়ব্রত আশ্বাস দেয়, "ভালত হবেই। আজকাল কত ভাল ভাল ওষুধ বেরিয়েছে। স্যানাটোরিয়ামে কয়মাস থাকলেই ভাল হয়ে যাবে।"

বিশ্বজিৎ জয়াকে লইয়া রওয়ানা হইয়া যায়। প্রিয়ব্রত স্টেশনে যায়।

জয়া গাড়ীর জানালা দিয়া যতক্ষণ দেখা যায় ভাইয়ের দিকে তাকাইয়া থাকে। হয়ত এই শেষ দেখা। বাবার সঙ্গে দাদার সঙ্গে দেখা আর হইবে ত জীবনে? চোখের জলে ঝাপসা হইয়া যায় সে। প্রিয়ব্রত অতিকষ্টে চোখের জল সংবরণ করে। বিশ্বজিৎ আসিয়া পাশে বসে। জয়া তাহার হাতটা শক্ত করিয়া ধরে নিজের হাতের মধ্যে, মনে হয়, যেন ঐ খানেই তাহার সমস্ত শক্তি লুকাইয়া আছে।

হাসপাতালে আছে জয়া। জয়াই বিশেষ জিদ ধরে সে হাসপাতালেই থাকিবে। ডাক্তার আত্মীয় বন্ধু সকলেই ঐ একই উপদেশ দেয়। বিশ্বজিৎ অগত্যা তাহাই ঠিক করে। নিজে ছোট্ট একটি বাসা ভাড়া নেয় হাসপাতালের খুব নিকটে।

রোজ বিকালে জয়ার সঙ্গে দেখা করিতে যায় বিশ্বজিৎ। ছোট্ট একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর জয়ার। লোহার খাটে নীল চাদর দিয়া ঢাকা বিছানা। কাচের জানলা দিয়া দূরের পাহাড় দেখা যায়।

জয়া শুইয়া শুইয়া ছেলের কথা ভাবে, বড় হইয়া সে কি রকম হইবে।

জয়ার মন ছুটিয়া চলে বহু আগে। দীর্ঘ বছর পর গৌতম বড় হইয়া উঠিবে—বলিষ্ঠ মন এক সুন্দর কিশোর। লালপতাকার তলায় সে বক্তৃতা দিয়া চলিয়াছে তাহার কিশোর বন্ধুদের কাছে।

বিশ্বজিৎও শুনিতেছে ঘাসের উপর বসিয়া। ছেলের প্রতিটি কথা, প্রতিটি ধ্বনি তাহার মনে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। সভাভঙ্গের পর বিশ্বজিৎ আর গৌতম ঘরে ফেরে। দীর্ঘপথ—পাশাপাশি দুইটি সাইকেলে চলে দুইজনে, উচুনিচু পথ ভাঙ্গিয়া।

জয়া সন্ধ্যাপ্রদীপ ধরাইবার আগেই বাপছেলে উঠানে পা দেয়।

গৌতম হাসিয়া বলে, "মা বাবাকে সাইকেল দৌড়এ হারিয়ে দিয়েছি।"

ছেলের কথায় দুইজনের প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হয়।

সন্ধ্যার পর আবছা আলোতে বারান্দায় বসে তিনজনে, মাঝখানে বসে গৌতম—তাহাদের পবিত্র প্রেমের গ্রন্থী।

জয়া মনে মনে সেই অনাগত পৃথিবীকে প্রণাম জানায়—"আমার প্রণাম লও—ভবিষ্যতের মুক্ত পৃথিবী।"

হঠাৎ দুরন্ত কাশির চোটে চিন্তাসূত্র ছিড়িয়া যায়। কাশিতে কাশিতে মুখ লাল হইয়া উঠে। নীচে গামলার উপর উপুর হইয়া কাশিতে কাশিতে

হঠাৎ চমকিয়া উঠে জয়া। একঝলক টাটকা রক্ত বাহির হইয়া আসে মুখ দিয়া।

"উঃ, মাগো!" বলিয়া জয়া বালিশটার উপর মুখ বুজিয়া শুইয়া পড়ে।

কান্নায় বুকটা যেন ভাঙ্গিয়া যাইতে চায়। মুখ গুজিয়া কাঁদে জয়া।

ডাক্তারবাবু ঘরে ঢোকেন। বৃদ্ধ ডাক্তার, সাদাশ্মশ্রু মুখে প্রশান্ত ভাব, চোখে অভিজ্ঞতার তীক্ষ্ণতা। ডাক্তার চৌধুরী রক্তটা লক্ষ্য করিয়া জয়ার মাথায় হাত বুলান।

"ভাল হয়ে যাবে ; এ সামান্যতে ভয় পাচ্ছ কেন মা।"

নার্স আসিয়া মুখে রুমাল বাঁধিয়া রক্তের গামলাটা সবাইয়া লইয়া যায়।

জয়া ডাক্তার চৌধুরীর হাত দুইটি শক্ত করিয়া ধরে। কান্নায় চুরমার করা করুণ সুরে মিনতি জানায়, "ডাক্তার বাবু, আমায় সারিয়ে দিন শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর।"

"ভালই'ত আছিস পাগলী"—বৃদ্ধের মন করুণ হইয়া উঠে।

ডাক্তারের জীবন। এইত তার পেশা। কত রোগী আসে যায়, কেউ বাঁচে, কেউ বাঁচে না।

জীবনের যন্ত্রণা ঘরে ঘরে। বাঁচতে চায় মানুষ শেষ পর্যন্ত। বাঁচার আকুল আকাঙ্খা, তবু তারা বাঁচে না।

রাতের শেষের দিক হইতে ঘরে ঘরে রোগীদের কাশির শব্দ আরম্ভ হয়। কাশির শব্দে বাড়ীটা যেন ফাটিয়া চৌচির হইয়া যাইতে চায়। দেয়ালের গায়ে প্রতিধ্বনিত হয় যেন কোন অশুভ ধ্বনি। অমঙ্গলের ক্ষুব্ধ আর্তনাদ চতুর্দিকে। জয়ার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। ভয়াবহ আতঙ্কভরা ছোট্ট ঘরটাতে আছড়াইয়া পড়ে যক্ষ্মারোগীর কাশির শব্দগুলি।

একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় জয়া ভীত হইয়া উঠে। মনে হয় যেন এক

ভৌতিক জগতে আসিয়া পড়িয়াছে সে। জয়া কাতর হইয়া তাকাইয়া থাকে কতক্ষণে ভোর হইবে। মার অস্পষ্ট মূর্তি যেন আনাগোনা করে তাহার খাটের পাশে। জয়ার বুকটা যেন ঠাণ্ডা হইযা আসে। অসহ্য যন্ত্রণা বুকের পাঁজরে সেও কাশিতে আরম্ভ করে।

ভোর না হইতেই নার্স'বা সব মুখে সাদা কাপড় বাঁধিয়া গামলাগুলি সরাইয়া লইয়া যায়। সাদা পোশাক পরা গম্ভীর মূর্তিগুলি। জয়া ভীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে।

বৃদ্ধ ডাক্তার কর্তব্য করিয়া যান। মৃতের জন্য শোক করাব সময নাই। গভীর রাত্রি পর্যন্ত বইয়ের মধ্যে ঝুকিযা পড়িয়া থাকেন। বাঁচাইবাব মন্ত্র খোঁজেন যেন ডাক্তারি বই পাতায় পাতায়।

মাঝে মাঝে রোগীদের যন্ত্রনাব গোঙ্গানি কানে আসে।

ডাক্তারের মন দৃঢ়প্রতিজ্ঞবদ্ধ—ওষুধ চাই ওদের বাঁচাইবার ওষুধ খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে।

ডাক্তারের মেয়ে মারা গিয়াছে এই বোগেই। দীর্ঘ বছর পর আবাব তাহাকে মনে পড়ে জয়াকে দেখিয়া।

ঠিক এরই মত করুণ মিনতি, আজও সেই কণ্ঠস্বর ভুলিতে পাবে না বৃদ্ধ ডাক্তার। "বাবা তোমারত কত ভাল ভাল ওষুধ আছে; আমাকে সারিয়ে দাও।"

ছয়মাস চলিয়া যায়। ডাক্তার চৌধুরী অবসর পাইলেই জয়ার কাছে আসিয়া বসেন; বহুক্ষণ ধরিয়া গল্প করেন। জয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া তাহার পুরান দিনের গল্প আরম্ভ করে।

কিশোরী জয়ার প্রথম পরিচয় পৃথিবীর সঙ্গে। সুব্রত, প্রিয়ব্রত,

কলেজের বান্ধবীরা, প্রতিটি দিনের তুচ্ছ ঘটনাও যেন খোদাই করিয়া বহিয়াছে তাহার মনে।

তারপর উঠে বিশ্বজিতের কথা—জয়ার চোখ দুইটি স্তিমিত হইয়া যায়।

"ডাক্তারবাবু লক্ষ কোটি বছর পরও কোন দিন আমাব ওর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হ'বে এ আমি ভাবতে পারি না। মৃত্যু বড় নিষ্ঠুর ডাক্তাব বাবু।" অভিজ্ঞ ডাক্তাব কথার মোড় ঘুবাইয়া দেন।

"তোমার সেই শলকভের উপন্যাসখানা পড়েছি আমি—সত্যি সুন্দর বইখানা।"

জয়া আবাব উজ্জ্বল হইয়া উঠে কাব্যচর্চায়। "সত্যি ছোট খাট ঘটনাব কি নিখুঁত ছবি ফুটে উঠেছে বইখানিতে। তুচ্ছ বলে আমরা যেসব উড়িয়ে দেই—সত্যি কি সে সব ঘটনাই মানুষের জীবনে উড়িয়ে দেবার যোগ্য ?"

বিশ্বজিৎ একদিনেব জন্য কলিকাতায় আসে, কয়েকটা দরকারী জিনিস কিনিতে।

একবাব পার্টি অফিসেও যায়। ইসমাইলের সঙ্গে দেখা হয়। উৎফুল্ল হইয়া জড়াইয়া ধরে সে, "আবে বিশ্বজিৎ বাবু যে, খবর কি? শুনলাম আপনি নাকি রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছেন। সেদিন শান্তাদি বলছিলেন 'বিশ্ব এবাব ডুব মেরেছে।'" ইসমাইল জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকায়।

বিশ্বজিতের চোখের তারায় অসহায় বিষণ্ণতা ফুটিয়া উঠে। করুণ হাসি হাসে একটু। জবাব দেয় না।

"চলুন বসা যাক—অনেক কথা আছে।" ইসমাইল তাহাকে টানিয়া লইয়া যায়। দুইজনে আলাপ হয় অনেকক্ষণ।

"আপনার দেশের খবর জানেনত। সেখানকার জিলা কমিটির রিপোর্ট কিন্তু ভাল নয় আপনার সম্বন্ধে।"

বিশ্বজিৎ দুঃখে অভিমানে বিমূঢ়ের মত হইয়া যায়।

সে ভাবিতেও পারে না—শান্তাদি তাহার সম্বন্ধে এ ধারণা করিল কি করিয়া। প্রাণ থাকিতে রাজনীতি ছাড়া সম্ভব নয় তাহার, উহা কি শান্তাদিও বুঝিল না !

তাহার মনে আজ যে কতবড় নিষ্ঠুর কালবৈশাখের ঝড় আরম্ভ হইয়াছে—তাহা বুঝিবার মত কেহই কি নাই তাহার ?

নিরুপায় সে। জয়াকে এ অবস্থায় কাহারও ভরসায় রাখা চলিবে না। যে কয়দিন সে বাঁচিয়া আছে, তাহাকে রাজনীতি হইতে দূরেই থাকিতে হইবে। এই দুর্দিনে দেশের লোকের কাছ হইতে দূরে সরিয়া থাকার ব্যথা কি তাহার চলার পথের সঙ্গীরা ও বুঝিবে না? নির্বাক বিশ্বজিৎ। তাহার অন্তর যেন স্থির হইয়া গিয়াছে।

বিশ্বজিৎ রাস্তায় নামিয়া আসে। রাজপথে পত্রিকা বিক্রী হইতেছে। পত্রিকার প্রথম সংবাদ—মস্কোর পতন আসন্ন।

কুয়াসাচ্ছন্ন চতুর্দিক—শিথিল পা যেন আর চলিতে চায় না।

শক্তি—শক্তি চাই তাহার—অপরিসীম দুর্বার শক্তি।

কলেজ স্কোয়ারের মোড়ে প্রিয়ব্রতর সঙ্গে দেখা। দুইজনে একসঙ্গে বাসে উঠে।

দিদির অবস্থা ভাবিয়া চুপ হইয়া যায় সে। সুব্রতর কথা উঠে।

"দাদার খবর জানেন ত। দাদাও যে এরকম হ'য়ে যেতে পারে ভাবিইনি কোনদিন। দাদার কড়া হুকুম—কোনরকম পলিটিক্স করা চলবেনা তার বাড়ীতে।"

প্রিয়ব্রতর উহা মানিয়া চলা সম্ভব নয়, তাই সে মেসে থাকে,

টিউসনি করিয়া পড়া চালায়। রাজনীতি না করিয়া থাকা তাহারও সম্ভব নয়। প্রিয়ব্রত বলিয়া যায়, "বাবার জন্যই কষ্ট হয়। তাঁর আদর্শবাদের সঙ্গে মেলেনা দাদার রূঢ় বাস্তবতা। কথায় কথায় চোখের জল ফেলেন; বুড়োবয়সে মানুষ বড় বেশী সেন্টিমেন্টাল হয়, তাই না বিশ্বদা ?"

অদ্ভুতভাবে হাসে প্রিয়ব্রত। কান্নার রূপান্তর সে হাসি।

বিশ্বজিৎ চুপ হইয়া যায়। প্রিয়ব্রতর মনের অবস্থাটা সেও বুঝিতে পারে। তাহারও এ কম আঘাত নয়। তাহার সেই কৈশোরের বীর, সুব্রতদার এ পরিণতি স্বপ্নেরও অগোচর।

সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে অনভিজ্ঞ নাবালক প্রিয়ব্রত মনে এ আঘাত উপেক্ষণীয় নয়। এই করিয়াই ত মানুষ বাঁচে—মানুষ গড়ে। আমরা যাহাকে শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি, তাহাদের প্রভাব জীবনে কম নয়।

প্রিয়ব্রতর কথা ফুরায় না, "দিদির ভাল হওয়ার আশায় বাবার মন ধুকধুক্ করছে—যদি সে ভাল না হয়। আরেকটা মস্ত আঘাত পাবেন।"

তাহার চোখ ছল ছল করিয়া উঠে। "এ নিয়ে দাদারও রাগ কম নয় আপনার উপর। বলেন—রাজনীতিই যদি করবে তবে বিয়ে করার দরকার ছিল কি ? দু'নৌকায় পা দেওয়া চলে না।"

ম্লান হাসি হাসে প্রিয়ব্রত।

বিশ্বজিতের মন বহুদূরে চলিয়া যায়—সুব্রতদা আর সে সাইকেলে ছুটিয়া চলিয়াছে ঝড়ের বেগে। পাহাড়ী টিলার গা ঘেষিয়া সরু পথ। জামার তলায় ভারি জিনিষের রোমাঞ্চকর অনুভূতি।

তারপর যুগ কাটিয়া গিয়াছে।

থামার বাড়ীতে কামলারা একদিন আসে ত আরেক দিন আসে না।

বাগ্দীরাও বাসন মাজিতে আসিতে চায় না। ছেলেপুলে দিয়া খবর পাঠায়, জ্বর হইয়াছে।

নায়েব বাবু চটিয়া আগুন হন, "জ্বর না, হাতি। ঘাটে মিলিটারীর কাজ করার সময় ত জ্বর আসে না। দেব সব ভিটেমাটি উজার ক'রে।" আবার ভয়ও আছে—মিলিটারীর কাজ। বাধা দিতেও সাহস হয় না—আবার কোন আইনের প্যাঁচে পড়িয়া যাইতে হয়। বৃথা গর্জন শুধু।

নিস্ফল আক্রোশে গুম হইয়া পূজার বাসন মাজিতে বসে চারুবালা, মুকুল চায়ের বাসন ধোয় আর গজ গজ করে, "ভদ্রলোকে আবার বাসন ধোয় নাকি ?"

নূতন একটা মিলিটারী ঘাট বানান হইতেছে। বাগ্দীরা দলে দলে মেয়েপুরুষে ঘাটে কাজ লইতে থাকে। দিনে টাকা টাকা মজুরি।

ক্ষেতের জোগান খাটিলে মাত্র ছয় আনা মজুরি। এক সন্ধ্যারও খোরাকী হয় না।

ষ্টীমার ঘাটে মেয়ে পুরুষে মাটি টানে। মিলিটারী কুলীগুলির অশ্লীল উক্তিতে সরগরম হইয়া উঠে ঘাটটা। লালসার নগ্ন হাসি ঝরিয়া পড়ে মেয়েগুলির গায়ে। পশুত্বের বর্বর রিপুগুলি একদিনে ছাড়া পাইয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে যেন। অসভ্য সম্বোধনে ফাটিয়া-পড়া ঘৃণ্য আবহাওয়া।...

ধানের দাম ১৩৲ উঠিয়াছে।

গৃহস্থের মুখ শুকাইয়া যায়, হাট হইতে খালি হাতে ফেরে, একবেলা ভাত খায়; একবেলা লাল আলু সিদ্ধ করিয়া খায়।

ছেলেপুলেগুলি বোঝে না; কাঁদিতে আরম্ভ করে, "শুধু আলু? ভাত নাই?"

দুশ্চিন্তায় মুখ শুকাইয়া যায় সকলের। ধানের দাম কমিবে ত?

শিবশঙ্করের গোলাবাড়ী বন্ধ এইবার। এখনও ধান বিক্রী আরম্ভ করিবে না। আরও দাম বাড়িলে ধান ছাড়িবে।

দলে দলে লোক আসিয়া ফিরিয়া যায়। গোলাবাড়ীটার দিকে অসন্তোষভরা লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকায় বারে বারে।

শিবশঙ্কর দুইজন হিন্দুস্থানী দরোয়ান নিযুক্ত করে পাহারায়। কি জানি ব্যাটারা ক্ষেপিয়া গিয়া লুঠতরাজ আরম্ভ করে যদি। রাত্রে ভাল ঘুম হয় না।

অনেক রাতে দূর হইতে মুসলমানদের হল্লা শোনা যায়, "আল্লা হো আকবর।"

কুকুরগুলি চেঁচাইতে থাকে।

দরোয়ান সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসে। ঈদের শোভাযাত্রা চলিয়াছে।

"যাক ভয়ের কিছু নয়।" নিশ্চিন্ত মনে গড়গড়া টানে শিবশঙ্কর।

মুকুল ড্রেসিং টেবিলটার ধারে প্রসাধনে ব্যস্ত। হাতাকাটা ব্রোকেটের ব্লাউজের ভিতর দিয়া দেহলাবণ্য উপছাইয়া পড়ে। সবুজ পান্নার মালা গলায়। শরীরের গোলাপী আভা প্রতিবিম্বিত হয় মস্ত ড্রেসিং মিরারের ভিতর। নিজের রূপে নিজেই মুগ্ধ হয়।

চাঁপার কলির মত আঙ্গুল দিয়া স্নো গালে বুলায়।

কোন্ শাড়িটা পরিবে এখনও ঠিক করিতে পারে না, গৌরীশঙ্কর আসুক আগে।

চরিভাতিতে যাইবে আজ তাহারা নদীর বাঁকে। আগের দিন বিকাল হইতেই পানসি নৌকায় আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে।

ভোরবেলা নৌকা ছাড়ে। নৌকার ভিতর তাস খেলে ছেলেরা। মুকুল গ্রামোফনে গানের পর গান দিয়া যায়।

সুরমন্থর গুলি আছড়াইয়া পড়ে কচি কচি ঢেউগুলির উপর।

সুন্দর একটা ছোট্ট বালুর চরে নৌকা লাগান হয় দুপুর বেলা। আরেক নৌকায় রান্নার আয়োজন। নদীতে নামিয়া সকলে স্নান করে। মুকুল বালুর মধ্যে পা ডুবাইয়া বসে ভিজা কাপড়ে। হাটুর উপর দিয়া নদীর জল বহিয়া যায় সিড়সিড় করিয়া।

চমৎকার লাগে মুকুলের এই গ্রাম্য মেয়েদের মত নদীর জলে স্নান করিতে।

নিকটবর্তী গ্রাম হইতে মুসলমান মেয়েরা কলসী লইয়া জল লইতে আসে নদীতে; তাহারা অবাক হইয়া দেখে সসম্ভ্রম নেত্রে বড়লোকের মেয়ের সাজসজ্জার সৌখীন সহুরে ভঙ্গী। অবাক লাগে।

শাড়ির মধ্যে আবার কত কি বাহারে ছবি আঁকা—নীলমেঘের গায়ে সাদা সাদা উড়ন্ত বকগুলি! গায়ের রংই বা কি—যেন দুধে আলতা রং চোখ আর ফিরাইতে চাহে না তাহারা।

বালুর মধ্যে নৌকার পাল টানাইয়া আড়াল করিয়া দেয় মাঝিরা। মেয়েরা কাপড় ছাড়ে সেখানে। চাষীর মেয়ের বিস্ময়ের সীমা থাকে না, তাজ্জব ব্যাপার সবই বাবুদের—কাপড় ছাড়িবে, তাও কত নষ্টখটী।

সন্ধ্যার আগেই নৌকা ফেরে। মুকুল পাটাতনে বসিয়া চা তৈয়ার করে। চারুবালা লুচি ভাজে।

গঞ্জীর হাট দিয়া নৌকা চলে, উজান ঠেলিয়া। হাট ভাঙ্গিয়াছে সবেমাত্র। দু'একটি হাটুরে ফেরে নদীর ধার দিয়া। মাঝিরা ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে, :"ও মিঞা, ধান পাইলা নি? কত কইরা ধানের মন?"

"আর ধান! এইবার না খাইয়া মরতে হইবে দেখ্‌তেছি।"

হাটিয়া চলিয়া যায় হাটুরে খালি ধামা হাতে। লুচিভাজার ঘিয়ের গন্ধে মো মো করে নদীর পারটা; চারুবালা সযত্নে রেকাব সাজায়।

সিন্দুরবর্ণ সন্ধ্যার পশ্চিম আকাশ। অপূর্ব সুন্দর। সূর্যের রশ্মির লাল আভা আসিয়া পড়ে কর্মরত মুকুলের গোলাপী গালে। দেহের রং যেন ফাটিয়া পড়িতে চায় সূর্যের শেষ আলোর স্পর্শে।

গৌরীশঙ্কর মুগ্ধ হইয়া দেখে।

সৌন্দর্য:পিপাসু আর্টিষ্ট মন চঞ্চল হইয়া উঠে, প্রেমবিগলিত দৃষ্টি ঝরে চোখে। সুখী তাহারা।

বিশ্বজিতের ঘর হইতে দেখা যায় জয়ার ঘরটা। জানালার নীল পর্দাটা বাতাসে দুলিতে থাকে। বিশ্বজিৎ অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে। মনের মধ্যে সহস্র চিন্তার কুণ্ডলী তোলপাড় করিয়া যায়। দারুণ দিন সম্মুখে।

ওদিকে জয়ার অবস্থারও ভাল হইবার কোন আশা নাই। ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে উঁকি মারে কয়বছর আগেকার দিনগুলি। জয়ার লেখা কবিতার টুকরাগুলি আজ আবার দীর্ঘদিন বাদে নাড়া দিয়া যায় অবস মনে। জয়ার লেখা :—তোমার আমার মাঝে ছাড়াছাড়ি, সেযে

নিদারুণ, কিন্তু সেই ছাড়াছাড়ির দিন হয়তো আর বেশী দূরে নয়। আশু অমঙ্গলের প্রতীক্ষায় বিশ্বজিৎ মৌন হইয়া পড়ে। এত হৃদয় দিয়া কোনদিন এর আগে সে জয়াকে বুঝিতে পারে নাই।

বিশ্বজিৎকে ছাড়িতে চায় না জয়া। শক্ত করিয়া হাত ধরিয়া থাকে, "বোস আর একটু। আর ত সেই কাল বিকেলে আসবে—সারাটা দিন আমার কাটে কি করে?" ভারি হইয়া উঠে তাহার কথা।

বিশ্বজিতের হাতটা টানিয়া আনে কাছে। আস্তে আস্তে অস্ফুটস্বরে বলে, "প্রিয় বিশ্ব, প্রিয় আমার; আমাকে আবার আগের মত ভাল করে দাও।" জয়ার তপ্ত নিশ্বাস গায়ে লাগে। সে কিছুতেই ছাড়িতে চায় না তাহাকে।

বিশ্বজিৎ অবাক হইয়া ভাবে, 'সেই অভিমানী জয়ার আজ কি পরিবর্তন! কি আবেগভরা আকর্ষণ! কোনওদিন যে মেয়ে মুখ ফুটিয়া মনের এতটুকু দুর্বলতা প্রকাশ করে নাই। সে আজ এত আবেগময়ী হইয়া উঠিল কি করিয়া?'

চিন্তিত হয় সে। 'রোগেরই লক্ষণ এ আবেগভরা উত্তেজনা।'

বিশ্বজিৎ ঠিক করে, যা হয় হইবে বাঁচিবেত নাই; যে কটা দিন বাঁচে, দেশেই লইয়া যাইবে জয়াকে। তবুও সারাটা দিন কাছে কাছে থাকিয়া ওর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিবে। গৌতমকেও একটু চোখের দেখা দেখিতে পারিবে। আর এভাবে ওকে কষ্ট দিয়া লাভ কি?

সে ঠিক করে—আজই সে ডাক্তার চৌধুরীকে জানাইবে; জয়াকে সে বাড়ী লইয়া যাইতে চায়।

চারটা যেন আর বাজে না।

বিশ্বজিৎ শুইয়া শুইয়া কল্পনা করে জয়া এ সংবাদ শুনিয়া কত খুশি

হইয়া উঠিবে। দূরে একটা গীর্জায় ঘণ্টা বাজে। বিশ্বজিৎ জামা গায়ে দিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

হাসপাতালের দুয়ার খুলিয়া গিয়াছে। বিশ্বজিৎ উপরে উঠিয়া যায়।

জয়ার ঘরের সামনে গিয়াই চমকিয়া উঠে, ডাক্তার চৌধুরী নতমুখে বসিয়া আছেন। অদূরেই সাদা কাপড় দিয়া ঢাকা—স্ট্রেচারের উপর কে এ?

ঘরের মধ্যে তাকাইয়া দেখে, জয়ার খাটটা শূন্য। বিশ্বজিতের ভিতরটা আর্তনাদে ছিড়িয়া টুকরা টুকরা হইয়া যাইতে চায়।

অবরুদ্ধ কান্নার তুফান হু হু করিয়া উঠে বুকের মধ্যে।

"জয়া, জয়া আর নাই?"

মৃতদেহের উপর স্নেহ প্রীতি ভালবাসার শেষ স্পর্শ বুলাইয়া দেয় নিঃশব্দে। তাহার নীরব চোখের জলে জয়ার চুল ভিজিয়া উঠে।

মূক হইয়া গিয়াছে সে। আকাশ বাতাস ভারী হইয়া উঠে নীরব আর্তনাদে—'প্রাণ দাও—প্রাণ দাও।' অপলক দৃষ্টিতে দেখিয়া লয় সে জন্মের মত শেষ দেখা। বৃদ্ধ ডাক্তার বিশ্বজিতের মাথায় হাত রাখেন। সহানুভূতিভরা করুণ আবেদন হাতের স্পর্শে। "young man, be strong—হার্টফেল করলো, খবর দেওয়া গেল না সময়মত।"

রাত্রির নিস্তব্ধতায় ঢাকিয়া গিয়াছে ছোট্ট পাহাড়ী সহরটুকু। গভীর রাত্রি। বিশ্বজিৎ তখনও বসিয়া আছে ঘরের প্রাঙ্গণে। গত কয়টি বছরের বিভিন্ন ও বিচিত্র ঘটনাগুলি, একটির পর একটি করিয়া মনে ভাসিয়া যায়।

আশ্চর্য মানুষের মন। কর্মজগতের ক্ষিপ্র চাকার তলায় গুঁড়াইয়া

যায় নাই কিছুই। সবই যে এত নিখুঁত ভাবে আঁকা রহিয়াছে মনের গভীর তলদেশে, বিশ্বজিৎ নিজেও জানিত না।

জয়ার সঙ্গে তাহার প্রথম পরিচয়—তাহার কারণে, অকারণে খুশিতে উপছাইয়া উঠা সকৌতুক চাউনি, যমুনার বুকে বধূ বেশী জয়ার সলজ্জ দৃষ্টি—মনে হয়, এইত সেইদিনের কথা। তারপর চঞ্চল মেয়ে মৌন হইতে মৌনতর হইয়া পড়ে। প্রকাশ করিতে না পারার ব্যথায় ম্লান হইয়া যায় সে। সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে তাহার প্রেমাকুল মন আর্তনাদে ছিড়িয়া খান খান হইয়া গেল। বিশ্বজিৎ আজ অনুতাপে পুড়িয়া মরে।

স্তব্ধ দৃষ্টিতে সে তাকাইয়া দেখে, বহুউর্দ্ধে ঐ বিরাট আকাশের বুকে উজ্জল নক্ষত্র গুলি জ্বল্ জ্বল্ করিয়া কি যেন ইঙ্গিত করিতেছে। বিশ্বজিৎ তন্ময় হইয়া চিন্তা করে শ্মশানের ঐ ছাইয়ের সঙ্গে সঙ্গেই কি জয়ার সব শেষ হইয়া গেল? তাহার স্নেহ, প্রেম, প্রীতি সবই কি শেষ? তাহার এত আদরের গৌতমকেও ভুলিয়া থাকিবে জয়া?

আকাশভরা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কগুলি যেন ইশারায় জানাইয়া দিতেছে, না, না, আত্মার ক্ষয় নাই। অনাদি, অনন্ত যুগ ধরিয়া আত্মার রথ-চক্র ছুটিয়া চলিয়াছে উর্দ্ধে, উর্দ্ধে—বহুউর্দ্ধে।

বিশ্বজিতের অবিশ্বাসী মনও আজ আত্মার অবিনশ্বরত্ব ভাবিতে চায়। তাহার জয়াও যেন বহুউর্দ্ধে ঐ দ্যুতিমান জ্যোতিষ্কদের মত তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিবে যুগ যুগ ধরিয়া। তাহার অন্তরাত্মা হইতে কে যেন চেঁচাইয়া বলে, না, না, জয়া মরে নাই। তাহার এ প্রেমের সমাধি হইতে পারেনা।

বিশ্বজিৎ সন্ধানী দৃষ্টিতে কি যেন তল্লাশ করে। শুধু তমসাচ্ছন্ন রাত্রির অন্ধকার দিগন্তব্যাপী। আর কিছুই দেখিতে পায় না সে। তাহার ভিতরটা হাহাকার করিয়া উঠে। বৃথা আশা। জয়াকে আর ত দেখিবে

না সে। জয়া যে তাহার বহুমুখী আবেগ, আকাঙ্খা, সবই অপূর্ণ রাখিয়া চলিয়া গেল, এ দুঃখ ত সে ভুলিতে পারে না।

বিশ্বজিৎকে কে বুঝিবে আজ? বাহিরের লোকত শুধু তাহার স্থূল অভাবটাই দেখিবে। জয়া নাই এই শুধু জানিবে।

ধীরে, অতি ধীরে আকাশ ফরসা হইয়া আসে। দূরের অস্পষ্ট পর্বত শ্রেনী ক্রমে স্পষ্টতর হইয়া উঠে। পর্বতের আড়াল হইতে রক্তিম সূর্য-রশ্মি ভোরের ইঙ্গিত করে। বিশ্বজিৎ জলভরা চোখে সূর্যের দিকে তাকাইয়া সুদূর পুরাণ-যুগের কাল্পনিক দেবতার আশীর্বাদ খোঁজে। তাহার হৃদপিণ্ডের নাড়ীটা যেন শিথিল হইয়া গিয়াছে। প্রচণ্ড আঘাতে থেৎলাইয়া গিয়াছে স্নায়ুগুলি। চলিবার মত শক্তি চাই। কিন্তু কে দিবে শক্তি: কে দিবে শান্তি তাহাকে?

ভোর হইয়া যায়। ডাক্তার চৌধুরী জানালার পর্দা ঠেলিয়া দেন ভোরের রোদটুকুর অপেক্ষায়। জানালা দিয়া চোখ পড়ে বিশ্বজিতের উপর।

তিনি নীচে নামিয়া আসেন বিশ্বজিতের কাছে। কিছু যেন বলিতে চান তিনি, কিন্তু বলিতে পারেন না। বিশ্বজিতের দীপ্ত দৃষ্টির কাছে সব কথাগুলি হারাইয়া ফেলেন বিহ্বল বৃদ্ধ।

বিশ্বজিৎই কথা তোলে, "এ যন্ত্রণা পাওয়ার চাইতে, এই ভাল হ'য়েছে, কাকাবাবু, জয়ার সব দুঃখের অবসান হ'য়েছে।" বৃদ্ধ ডাক্তারের অবস্থা দেখিয়া, তাহার আবেকটা ব্যথার নাড়ীতে টান পড়ে। জয়ার বৃদ্ধ পিতা। তাঁহাকেও ত সহিতে হইবে এ-অপার দুঃখ, এ অব্যক্ত শোক-যন্ত্রণা। জীবনের শেষ সিঁড়িতে পা দিয়া এ কি করুণ পরিহাস। পর পর সকলের কথাই মনের স্তরে, স্তরে নাড়া দিয়া যায়, এক অবস, বেদনাতুর স্মৃতির গাঁথা?

সুব্রত, প্রিয়ব্রত, প্রশান্ত, তারপর গৌতম। সেত জানিলও না, সে যে কতখানে বঞ্চিত আজ। মা-হারা অবুঝ শিশু।

জয়ার হতাশায় ভেজা করুণ কথাগুলি এখনও কানে বাজে, "গৌতম, আমার গৌতম তোকে কি আর একটুও দেখতে পাব না?"

বিশ্বজিৎ আর দেরি করিতে চায়না, ছেলের জন্য মন উতলা হইয়া ছোটে। ডাক্তার চৌধুরীর নিকট বিদায় লইয়া সে কলিকাতায় রওয়ানা হয়।

ট্রেন চলে আস্তে আস্তে। গাড়ী হইতে দেখা যায় ডাঃ চৌধুরীর বাড়ী, লাল কাঁকর বিছান রাস্তা, হাসপাতাল, জয়ার শেষ ছোওয়া-লাগা-ছোট্ট ঘরখানা, পাহাড়ী শিলাস্তূপের তলায় জয়ার সমাধি বেদী। চোখের জলে ঝাপসা হইয়া যায় সহরের বুকে ছড়ানো বাড়ীগুলি।

গাড়ী ছুটিয়া চলে দূরে। যেন ঘুমন্ত জয়াকে একা ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছে দূরে—বহুদূরে।

কলিকাতায় আসিয়া বিশ্বজিৎ তাহার পুরান আস্তানায় উঠে। ইসমাইল বিষণ্ণ দৃষ্টি দিয়া তাহাকে অভিবাদন করে। বিপিন কাঁদিয়া আকুল হয়, "ভাল মানুষের প্রাণ অমনি অকালেই চলে যায়।" বিশ্বজিৎ অবাক হইয়া ভাবে, "এই বিদেশী অনাত্মীয় ভৃত্যটির ও তাহার জয়া দিদির জন্য এ চোখের জল জমা ছিল!' মানুষের জানা, অজানার আড়ালে, কাহার জন্য কোথায় বেদনায় স্থান লুকাইয়া আছে, কে জানে?

ইসমাইলের ঘরে পরিচিত, অপরিচিত বহুলোকের সমাবেশ হইতে থাকে—একটা জরুরী মিটিং ডাকা হইয়াছে। বিশ্বজিতের যেন আজ সব

কিছুই ছাড়া-ছাড়া লাগে। উহাদের কাছ হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে চায় সে। রাস্তায় নামিয়া আসে বিশ্বজিৎ। জনপ্রবাহের মাঝে ভুলিতে চায়, ভুলাইতে চায় নিজেকে। উদাস মনে সে হাটিয়া চলে একা একা।

এস্প্লানেড, ওয়েলিংটনস্কোয়ার, মেডিকেল কলেজ, রাস্তাব পর বাস্তা, গলির পর গলি পাব হয় সে। পথচারী ছুটিয়া চলিয়াছে। ত্রাসে ও ভয়ে উদ্বিগ্ন নগরবাসী। বিশ্বজিতেব কানে যায় খণ্ড, খণ্ড টুকরা টুকবা কথাগুলি।

জাপানী বোমা .....ইম্ফলে... ..মণিপুর রোডে আবাব জন-কোলাহলে মিলাইয়া যায়, চলাযমান পথিকের কানাকানি। বিশ্বজিতেব মস্তিষ্কেব মধ্যে কিলবিল করিতে থাকে চিন্তাব সরীসৃপগুলি। জাপানী বোমাক···ভস্মীভূত ধানের গোলা...ক্ষেতখামার গরুবাছুর ভরা গৃহস্থের বাথান, আবও কত কি!

মাথাব মধ্যে একটা অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করে সে। তবু হাটিয়া চলে। সিনেট হাউসেব কাছে কলেজগামী ছাত্রদের তর্ক-বিতর্ক কানে আসে।

গোলদীঘিব ধারে বেকার যুবকের চাপা গুঞ্জন, "জাপানীরা একবাব এসে পড়লেই হয়।"

আরও কিছুদূরে বাজার ফেবতা ভদ্রবাবুদের চিন্তব্যাকুল জিজ্ঞাসা, "পালাতেই হ'বে নাকি শেষ পর্যন্ত!"

ব্যাফেল ওয়ালের আড়ালে খঞ্জ ভিখারীটা উর্দ্ধে তাকায় পথচারীর মুখের দিকে। বিড় বিড করিয়া বলে, "এরা সবাই পালাবে নাকি? কোথায়? কতদূরে?" অবস সরু পায়ের দিকে একবার চোখটা বুলাইয়া লয় অসহায় ভাবে।

বিশ্বজিতের কানে আসে সবই। তবু যেন বুঝিতে পারে না সব-

কিছু। জাপানী বোমা...ভস্মীভূত কৃষকের আশার ফসল...ব্যাফেল-ওয়াল...সর্বনাশা সাম্রাজ্য পিপাসা।...খণ্ড, খণ্ড অসংযত চিন্তার কুণ্ডলী। ছুটিয়াই চলিয়াছে সে। হ্যারিসন রোড্ দিয়া মালপত্র বিছানা তোরঙ্গ বোঝাই গাড়ীর পর গাড়ী চলিয়াছে হাওড়ার দিকে। হিন্দুস্থানী যাত্রী বোঝাই দশ নম্বরের বাস গুলি।

ঘোড়ার গাড়ীর ভিতর সন্তানধারী মায়েরা কোলের শিশুটিকে আকড়াইয়া ধরিয়া আছে। ভয়ে মুখ শুকাইয়া যায়—বুঝি ঐ কোলের শিশুটিকে ছিনাইয়া লইতে আসিতেছে কোন এক ভীষণমূর্তি দানব।

শান্তিপ্রিয় নগব বাসী ঘর ছাড়িতে চায়না, তবু ঘব ছাড়িয়া পালায়; নূতন. নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে।

বিশ্বজিৎ উপলব্ধি করে, বিরাট এক পৃথিবী জোড়া দৈত্য লণ্ডভণ্ড করিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিতে ধাইযা আসিতেছে চতুর্দিক হইতে। মাথাটা যেন তাহার ছিড়িয়া যাইতেছে. মনে হয়। হেদোতে আসিয়া একটা বেঞ্চির উপর বসে সে। শান্তি, শান্তি খোঁজে সে অনন্ত শান্তি। ব্যঙ্গ করে প্রতিধ্বনি—বিশ্বজিৎ উর্দ্ধে তাকায়। মাথার উপর দিয়া এক ঝাক বোমারু চলিয়াছে সমুদ্রের দিকে। হয়তো কোনও দোলনায় ঘুমন্ত শিশুর বুকে জলন্ত বারুদ-কণা-গুলি ঢালিয়া দিয়া আসিবে উহারা পৈশাচিক আনন্দে।

বেঞ্চির অপর পার্শ্বে উপবিষ্ট, রেঙ্গুন ফেরতা প্রৌঢ়-ভদ্রলোকটি ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে তাকায় উর্দ্ধে। আপন মনেই বিড় বিড় করেন যেন, "আর বেশীদিন নয় বাছাধনরা, তারা এল ব'লে।"

বর্মাদেশের করুণ অভিজ্ঞতা ভুলিতে পারেন না ভদ্রলোকটি।

সাহেব বোঝাই জাহাজগুলি জাহাজঘাট হইতে দূরে নীল সমুদ্রে মিলাইয়া যায়। বিদ্বেষভরা চোখে কাল চামড়ার দল তাকাইয়া থাকে

অসহায়ভাবে। তারপর চাপা আক্রোশে গুঁমড়াইতে গুঁমড়াইতে হাটিয়া চলে কাতারে, কাতারে, দলে, দলে; দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। বন জঙ্গল নদী, খাল বিল খেওয়াইয়া হাটে তাহারা—পৌছাইতেই হইবে—যেমন করিয়াই হউক এর প্রতিশোধ লইতে হইবে স্বদেশে গিয়া।

কিন্তু তাহার আগেই অগণিত প্রিয় পরিজনের অবশ পা গুলি থামিয়া যায়—ক্ষুধায়, পিপাসায় উন্মাদ অস্থির হইয়া উঠে দেহ—তারপর ধীরে ধীরে হিমশীতল হইয়া যায় রাস্তার বুকে।

ভদ্রলোকটির একমাত্র ছেলে, সেও ত রহিয়া গিয়াছে মণিপুরের রাস্তায়। চিরনিদ্রায় ঘুমাইয়া আছে আজও বনজঙ্গল ঘেরা পথের মাঝে। ভদ্রলোকটির গলার স্বর ভারি হইয়া উঠে।

বিশ্বজিৎ মনে মনে লজ্জিত হয়। দেশবাসীর এই অন্তর-ছেড়া আর্তনাদ-ভরা মুহূর্তে সে পালাইতে চায় তাহাদের কাছ হইতে? আবার চলিতে থাকে বিশ্বজিৎ। সিটি বুকিংএ গিয়া টিকিট কাটিয়া আসে।

বিশ্বজিৎ বাড়ী ফিরিয়া আসে। সংবাদ দিয়া আসে নাই; একাই স্টেশন হইতে হাটিয়া রওনা হয়। অবশ পা দুইটা; একটা অসহায় শূন্যতা বুকের মধ্যে গুমড়াইতে থাকে।

বিশ্বজিৎ ঘরে ঢোকে নিঃশব্দে; বনলতা চোখের জল ফেলে। উপরে শূন্য ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে সে। হাহাকার ভরা শূন্যতা। শোকার্ত নিস্তব্ধতা ঘরে বাহিরে। জয়া নিঃস্ব করিয়া গিয়াছে তাহাকে। শূন্য মন, অবসাদভরা দেহ।

প্রশান্ত সারাদিন একলা ঘুরিয়া ফেরে। বুকের মধ্যে একটা মস্ত পাথর চাপা। জয়ার রোগ পাণ্ডুর বিশীর্ণ মুখখানা ভুলিতে পারে না সে। ঘুরিয়া ফিরিয়া একটি প্রশ্ন নাড়া দেয় বারে বারে, 'এ পরিণতির জন্য দায়ী কে?'

কয়েকদিনেই গৌতম বাবার ভক্ত হইয়া উঠে। সব সময়ই কাছে কাছে আছে। অবোধ শিশু। বোঝে না কিছুই। কারণে অকারণে খুশি হইয়া ছুটাছুটি করে। সময়ে অসময়ে কচি নরম হাত দুইটি দিয়া পিতাকে জড়াইয়া ধরে। বিশ্বজিতের ক্ষতবিক্ষত বুকটাতে যেন মধুর প্রলেপ বুলাইয়া দেয় শিশুটি। স্বর্গীয় কোমল স্পর্শ! মাঝে, মাঝে, মা-মা করিয়া উঠে গৌতম। বিশ্বজিতে বুকের মধ্যে হু হু করিয়া উঠে সে কান্নায়।

লক্ষ্মীপুরের কর্মীদের মধ্যে শুধু প্রশান্ত আর বিনয় বাবু। শচীন যুদ্ধে গিয়াছে। একা আর পারিয়া উঠে না তাহারা। বিশ্বজিতের সাহায্য প্রার্থী হয়। কিন্তু বিশ্বজিৎ মন স্থির করিয়া উঠিতে পারে না। মাঝে মাঝে কৃষান অফিসটায় ঘুরিয়া আসে একটু, কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই একা একা থাকিতে চায় সে।

প্রশান্ত বোঝে সব, এ শোক তাহারও কম নয়। জয়াকে ভুলিতে পারে না সেও। তবু কাজ লইয়া ভুলিয়া থাকে সে। বিশ্বজিৎকেও ডাকে সে কাজের মধ্যে—এ ছাড়া আর কোন পথ নাই। কিন্তু বিশ্বজিৎ আর যেন কিছুতেই সাড়া পায় না মন হইতে। নিজেকে কাজের মধ্যে মিশাইয়া ফেলিতে পারিতেছে না। আবার এই সঙ্কট মুহূর্তে চাষী ভাইদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাকায়ও মন সায় দেয় না। কাজের দায়িত্ব,

কাজের প্রয়োজন উপলব্ধি করে। সবসময়ই মনের মধ্যে খচ খচ করে। কি যে করিবে সে কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারে না। বড় অসহায়, বড় শ্রান্ত বোধ করে সে নিজেকে। ইচ্ছা হয় সব ছাড়িয়া দূরে কোথাও চলিয়া যায় সে ছেলের হাত ধরিয়া।

বিশ্বজিৎ ছেলেকে লইয়া বাহির বাড়ীর পুষ্করিণীর ধারে একটা আম গাছের ছায়ায় বসে।

দুইটা রাজ হাঁস মাটি হইতে কি যেন খুঁটিয়া খুঁটিয়া খায়। গৌতম অবাক হইয়া দেখে হাঁসগুলির নড়াচড়া। সেও ধরতে চায় তাহার ছোট্ট ছোট্ট হাত দুটি দিয়া। হাঁসগুলি পুকুরের আরেক প্রান্তে চলিয়া যায়। গৌতম কান্না শুরু করিয়া দেয়। বিশ্বজিৎ ছেলেকে উড়ন্ত পাখী দেখাইয়া ঠাণ্ডা করে কোলের উপর শোওয়াইয়া। স্নেহাতুর পিতার কোমল স্পর্শে শান্ত হয় শিশুটি।

উত্তপ্ত মধ্যাহ্ন। বর্ষাকাল, তবু বৃষ্টি নাই। তাহাদের বাড়ীর টিউব-ওয়েল হইতে দলে দলে জল লইতে আসে যায় মুসলমান মেয়েরা। একটি মেয়ে জল পাম্প করিতেছে। চেনা চেনা লাগে।

"আশমানি না?"

মাথার কাপড়টা টানিয়া আশমানী ফিরিয়া তাকায়। তাহাদের মনিববাবু। কতকাল পড়ে দেখিল—এখন ত শরমই লাগে দেখিলে।

জলের কলসীটা কাঁখে লইয়া আসে, সলজ্জপ্রশ্ন করে, "কবে আইলেন বিদেশ থেইকা?"

"এই ত কিছুদিন হবে। তুই কবে এসেছিস শ্বশুরবাড়ী থেকে?"

"পরশু আইছি। শ্বশুর বাড়ী থেইকা আইতেই দেয় না। বাজান তো কয় কিস্তি গিয়া ফিরা আইল। তা বৌরে সঙ্গে আনেন নাই? বৌ দেখতে যামু একদিন।"

"বৌকে'ত আর সঙ্গে আনতে পারলাম নারে, আশমানি।"

কেমন ধারা যেন কথাগুলি। আশমানি একটু অবাক হইয়া তাকায়।

"কেমন বাড়ী ঘর দোর তোর। শ্বশুর বাড়ীতে কে কে আছে? কেমন লাগে শ্বশুর বাড়ী?"

আশমানী মুখ ফিরাইয়া উত্তর দেয় লজ্জিত সুরে,

"শ্বশুরবাড়ী আবার কারও ভাল লাগে নাকি?"

বিশ্বজিৎ মনে মনে আওড়ায়, 'তা' ঠিক শ্বশুরবাড়ী আবার কারও ভাল নাকি।' আশ্চর্য, সব মেয়েদেরই একই মনের গঠন।

আশমানী যাইতে উদ্যত হয়। "আসুমথন ঐ বেলা বৌ দেখতে।"

"কাকে দেখতে আসবি? বৌত মরে গিয়েছে।" বিশ্বজিৎ যেন জোর করিয়া বলে কথাগুলি।

আশমানী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, "এব মধ্যেই মারা গেল? এত্তটুক ছেলেরে রাইখা?" অদ্ভুত লাগে। কিছু বলিতে পারে না সে। কলসী নামাইয়া রাখিয়া গৌতমকে কোলে লয় একটু, "আইস খোকা বাবু।" গৌতম ঝাপাইয়া পড়ে তাহার কোলে। এক দৃষ্টিতে কি যেন দেখে সে আশমানীর মুখের দিকে তাকাইয়া। তারপর তাহাব গলার হাঁসুলিটা ধরিয়া টানিতে থাকে। বিশ্বজিৎ অবাক হয়, ওর মার মুখ মনে পড়িতেছে নাকি? শিশুদের মনের গড়ন কি বকম কে জানে।

কলিকাতায় রাস্তায়, রাস্তায়, মোড়ে মোড়ে, টেলীগ্রাম বিক্রী হইতেছে—"গান্ধীজি গ্রেপ্তার।"

স্তম্ভিত দেশবাসী—সাম্রাজ্যবাদের কি নির্লজ্জ স্পর্দ্ধা! বিক্ষুব্ধ মানুষ চাপা অসন্তোষে দাঁতে দাঁত চাপে। সজাগ হইয়া উঠে স্বাধীন আত্মা। পুঞ্জিভূত বিদ্বেষ গলিতে গলিতে। আসমুদ্র হিমাচল যেন এক বিরাট ঝড়ের পূর্বাভাষের মত প্রতিজ্ঞায় কাল জমাট বাঁধিয়া উঠে। প্রতিহিংসাকাতর মন পশুত্বের বিরুদ্ধে নাড়া দিয়া উঠে। দিশাহারা জনতা ঝাঁপাইয়া পড়িতে চায়, সহিবেনা আর তাহারা সহিবেনা।

সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে এ দারুণ সংবাদ ছড়াইয়া পড়ে। বিশ্বজিৎও শুনিয়া আসে রেডিওতে। শঙ্কিত হইয়া উঠে সে। ঘোর দুর্দিনের কালছায়া তাহাদের সম্মুখে।

প্রশান্ত আর বিনয়বাবু প্রত্যেক হাটে চাষীদের জড়ো করিয়া বোঝায়, "ধান ছেড়ো না, মহাজনদের প্রলোভনে ভুলোনা।"

রৌদ্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে প্রশান্ত। উহাদের বুঝান কি কষ্ট! নির্বোধের দল। নিজেদের হিতাহিত ও বুঝিতে পারেনা উহারা।

চরের মাতব্বর জাবেদালীর বাপ। তাহার বাড়ীতে বৈঠক বসে। বিনয়বাবু বলিতে থাকেন, "ভাইসব, আপনাদের সামনে ভয়ানক আকাল উপস্থিত। এই আকাল খোদার দেওয়া আকাল নয়। এক শয়তানী ষড়যন্ত্র পিছন থেকে কল টিপছে। তাই এই আকাল। এই শয়তানের দল কারা জানেন? এই শয়তানের দল হ'চ্ছে—মজুতদারী; চোরা-কারবারী মহাজনরা। তারা মানুষের জীবনের মূল্য—"

রহিম বাধা দেয়, "বাইরে কে যেন ডাকে?"

বিনয়বাবুকে থামিতে হয়। "কে ডাকে? কি চাই ?

"আমি রতন দফাদার—প্রেসিডন মশায় পাঠাইলেন খোঁজ করতে—"

রতন দফাদার বুক ফুলাইয়া নাম লিখিয়া লইতে থাকে।

সরল চাষীর দল একটু ঘাবড়াইয়া যায়। "কিছু অ্যাবার হইবে না ত ?"

জাবেদালী সাট্ মারিয়া উঠে, "ভারি আমার দফেদার আইছেন। চুরিও করি নাই, ডাকাতিও করি নাই। বিনয়বাবু আমাদের আপনার জন, লেখাপড়া জানেন বইলাইত দুইটা ভাল কথা শুনাইতে লইছে। এতে আবার তোমার কোট্নামির কি হইল শুনি ? ব্যাটাব আজকাল আর মাটিতে পা পড়ে না।" বিনয় বাবু থামাইয়া দেন জাবেদালীকে। কি হইবে শুধু ওকে দোষ দিয়া।

বিনয় বাবু আবার বলিতে থাকেন—ভবিষ্যৎ আকালের কথা, মহাজনেব কথা—সরকার ও মহাজনের কলুষিত যোগাযোগ,—সরকারী কর্মচারীর দৌরাত্ম্য, সব কথা একটার পর একটা করিয়া আসিয়া পড়ে।

বুঝাইতে বুঝাইতে বিনয় বাবুব মুখ কঠিন হইয়া উঠে—হাত দৃঢ়মুঠিবদ্ধ হইয়া যায়।

অনেক রাতে বৈঠক ভাঙ্গে।

পরের দিনই বিকালে জাবেদালীর বাপকে ডাকাইয়া নেয় মারোয়ারী কুঠির ম্যানেজার। তাহাদের চরের চাষীদের সব ধান সে কিনিতে চায়। মনপিছু দুইটাকা দস্তুরি।

বৃদ্ধ চাষী কি যেন ভাবে। ওদিকে নগদ টাকাগুলিও চকচক করিয়া উঠে চোখের সামনে।

জাবেদালীর বাপ শেষ পর্যন্ত রাজী হইয়া যায়। বুকের মধ্যে কি যেন ধক্ ধক্ করিতে থাকে। ম্যানেজার কুটীল হাসি হাসে গোঁফের আড়ালে।

ধান বিক্রী হইয়া যায়। প্রশান্তর সাধ্য নাই এ গতিকে ঠেকাইয়া রাখে। ক্লান্ত হইয়া পড়ে সে—বিশৃঙ্খলা সর্বত্র। প্রকাণ্ড গুদাম বাড়ীটা রাক্ষসের মত ধান গিলিতে চলিয়াছে। গ্রাম নিশ্চিহ্ন করিয়া তবে সে ক্ষান্ত হইবে।

বড় বড় ধানের নৌকাগুলি রাতারাতি উধাও হইয়া যায়—বস্তায় বস্তায় ধান বোঝাই বিবাট নৌকাগুলি।

কাগজের কড়কড়া নোট গুনিয়া ট্যাকে গোঁজে ঘর্মাক্ত চাষী। ধান বেচিয়া ফেরাব পথে বাজাবটা ঘুরিয়া যায়; বড় ইলিশমাছ কেনে একটা—যমুনার সাদা ইলিশ।

সন্ধ্যার পর কেরোসিনের কুপির মিট্ মিট্ আলোতে বসিয়া—মাটির সানকিতে গরম ভাতের ধোঁয়ার সঙ্গে ইলিশমাছের গন্ধে জিভে জল আসে ছেলেগুলিব।

ক্ষণিকের জন্য খুশিতে চকচক করিয়া উঠে বৃদ্ধ চাষীর চোখদুইটি।

নদীর ধারে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে বিশ্বজিৎ। বড় শ্রান্ত বোধ করে সে। নদীর বিশালতায় গভীর হইয়া উঠে জয়ার অভাব বোধ। মূক হইয়া যায় সে। নিজের মধ্যে, অন্তরের গভীরতম তলদেশে উপলব্ধি করিতে চায় সে জয়াকে।

দূরে মাঝ নদী দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে বড় বড় ধানের নৌকাগুলি। আবার অন্যদিকে চিন্তার মোড় ঘুরিয়া যায়। প্রলুব্ধ চাষী জানে না, বোঝেনা, কি ভয়ঙ্কর নারকীয় অন্ধকারের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে তাহারা!

সজাগ হইয়া উঠে তাহার কর্তব্য চেতনা। জোর করিয়া ঝাড়িয়া

ফেলিতে চায় তাহার দেহ-মনের এ অবসন্নতা। এ সর্বনাশা শোষণ হইতে উহাদের বাঁচাইতেই হইবে। আর দেরি করা চলে না। নিজেকে টানিয়া তোলে বিশ্বজিৎ।

নদীর ধার দিয়া হাটিয়া চলে সে ষ্টীমার-ঘাটের দিকে। চাঁটগা মেল আসিতেছে। রেলগাড়ীর সার্চলাইটে স্পষ্ট হইয়া উঠে ষ্টীমার ঘাটের ছোট ছোট চায়ের দোকানগুলি। এ কয়মাসেই একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে ঘাটের চেহারা। নূতন রূপ ধরিয়াছে দোকানগুলি। ছোট ছোট টিনের 'বাচারি' ঘরে সাজান টেবিল-চেয়ার, কাটা-চামচ, মদের বোতল। উনানের পাশে শুরু হইয়াছে উড়িয়্যানিবাসী 'কালা-ঠাকুরের' সাহেবী খানা প্রস্তুত করার অপচেষ্টা। বিড়ি-ধরা ছোট ছোট 'বয়গুলি' সাহেবদের খোসামদ করার জন্য চটুল হইয়া উঠে। থুতুতে ভেজা আধা-পোড়া সিগারেটের টুকরাটা ধরিবার জন্য লুফালুফি লাগিয়া যায়। প্রভুসুলভ হাসি হাসে উলকি পরা সাহেবগুলি নোংরা দাঁতের ফাঁক দিয়া। ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া উঠে বিশ্বজিতের মন। দাসসুলভ পরিস্থিতি সর্বত্র। সাহেবদের খুশি করার জন্য মদের গ্লাস হাতে ছুটাছুটি করে ভদ্র গৃহস্থ সন্তান—এইত সুযোগ; কিছু টাকা করিয়া লইবার এইত সময়!

একটা চায়েব দোকানে গিয়া বসে বিশ্বজিৎ। সে আজ স্পষ্ট করিয়াই দেখিবে দাসত্বের এ নগ্ন কলুশিত দৃশ্য। মেল আসিয়া পৌছায়। আহত সৈনিক বোঝাই দীর্ঘ এক গাড়ি। সুশ্রী, কুশ্রী দেশী-বিদেশী সৈন্যে ভরিয়া যায় ষ্টেশনটুকু। ক্ষুধার্তের ভীড় চায়ের দোকানে দোকানে। কড়কড়া এক দশ টাকার নোট দিয়াই এক ডজন ডিমসিদ্ধ কিনিয়া লয় এক আমেরিকান সাহেব। কৃতার্থ হইয়া উঠে ব্যাপারী।

বিশ্বজিতের পাশে আসিয়া বসে সুশ্রী এক ইংরাজ যুবক, হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। চা ও বিস্কুট চায় সে দোকানীর নিকট। চা পান

করিতে করিতে বিশ্বজিতের সঙ্গে আলাপ শুরু করে। জানিতে চায় সে এদেশের মানুষকে, জানাইতে চায় সে নিজেদের। এ যুদ্ধ চায় না তাহারা। শান্তিভরা গার্হস্থ্য জীবনই তাহাদের কাম্য।

ছেলেটি ছাত্র ছিল স্কটল্যাণ্ডে। ঘরে বৃদ্ধা মা ও বোনকে রাখিয়া আসিয়াছে। তাহারা জীবিত কি মৃত জানেনা সে; খবর পায় না বহুদিন।

যুদ্ধক্ষেত্রের বীভৎস অভিজ্ঞতা মাখান ছেলেটির সর্বাঙ্গে। বিশ্বজিৎ ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখে।

আহত সৈনিক বর্ণনা করে ফ্যাসিষ্ট অত্যাচারের নিষ্ঠুর সুদীর্ঘ কাহিনী। একদিকে বিংশ শতাব্দীর নৃশংস মারণাস্ত্রের রণগর্জন; আরেকদিকে মৃত্যু যন্ত্রণার উন্মাদ আর্ত চিৎকার। বন্দীদের উপর অকথ্য, নির্দয় লাঞ্ছনা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে সে। বলিতে বলিতে শিহরিয়া উঠে ছেলেটি।

কাহাকে দেখিয়া হঠাৎ চুপ হইয়া যায় সে। মিলিটারী পুলিশ! ফিস ফিস করিয়া বলে—উহাদের জ্বালায় দুর্বিসহ হইয়া উঠিয়াছে জীবন।

মৃদু হাসি দিয়া বিদায় লইয়া যায় সে। অচেনা, বিদেশী ছেলেটির জন্য মনটা একটু ব্যথিত হইয়া উঠে। বয়স কুড়ির ঘরেও পৌঁছায় নাই। কি কচি চেহারা! সাত সমুদ্র খেওয়াইয়া আসিয়াছে—এ মরণ যুদ্ধের ডাকে।

ঘরে বৃদ্ধা মা, হয়তো দিনের পর দিন যীশুখৃষ্টের ছবির নিকট নতজানু হইয়া কত করুণ নিবেদন জানাইতেছে!

বিশ্বজিৎ উঠিয়া ফেরার পথ ধরে। মন তাহার পীড়িত হইয়া উঠে। যেন কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না সে। মনে হয় যেন এক

প্রলয়ঙ্করী দানবীর উন্মত্ত খেলা শুরু হইয়াছে। তার দাপটে পৃথিবীটা বুঝি খান খান হইয়া গেল। জাপানী দস্যুর রক্তাক্ত অভিযান সোনার ভারতকে গ্রাস করিতে আসে। মণিপুর রোড আর আরাকান রোড তৈয়ার হয় প্রতিদিনের শত নরনারীর রক্ত-নিংড়ানো মুহূর্তগুলির মাঝে।

ভারতের পূণ্য সভ্যতা নামিয়া আসে অপমৃত্যুর রাজপথে। ইন্‌ফ্লেশনের মরীচিকার পিছনে ছুটিতে থাকে লক্ষ লক্ষ নরনারী। কন্‌ট্রাকটার, ঠিকাদার, কুলী, সাদা কাল ফৌজ আর 'ওয়াকের' চটুলতা। রাতারাতি গ্রাম হয় সহর—মটর-ট্রাক...পেট্রোল...ট্যাঙ্ক আর কামান। কন্‌ট্রাকটারের লরি আর অফিসারের মটর-সাইকেল। সাম্রাজ্যবাদী অভিযানের বিচিত্র শোভাযাত্রা!

এখানে স্থান নাই কেবল মানুষের, তার অতীতের, তার ভবিষ্যতের, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু সত্য, যা কিছু ন্যায় সবই যেন এই যুদ্ধের দাবানলে পুড়িয়া ছাই হইয়া অবলুপ্তির পথে। তবুও অসহায় মানুষ পঙ্গপালের মত ছুটিয়া চলিয়াছে কোন এক অজানা অন্ধকার গহ্বরে, এক বিরাট অনিশ্চিতের পথে।

ভাবিতেও পারে না বিশ্বজিৎ ইয়োরোপের কথা। দুদ্ধর্ষ ফাসীবাদের রক্ত অভিযানের পথে সমস্ত ইয়োরোপের অসহায় মানুষগুলি যেন অবিশ্রান্ত ছুটিয়া চলিয়াছে নিশ্চিত মৃত্যুর লৌহ সিংহ দ্বারে। দলিত বিদ্ধস্ত, বিমথিত, তাহাদের মুহূর্তগুলি অব্যক্ত বেদনায় ভারাক্রান্ত হইয়া যেন অনিশ্চিত পথপ্রান্তে ঢলিয়া পড়িয়াছে। মস্কো হইতে প্যারী আর ইয়েনান হইতে ক্যালে ব্যাপি' চলিয়াছে বর্বরতার সাথে সভ্যতার সংগ্রাম। সভ্যতা পিছু হটিয়াছে; কিন্তু গভীর মানবতাবোধ দিয়াছে তাহাকে অপূর্ব প্রাণশক্তি। তাই এই পিছু হটিয়াও রক্তবীজের মত

জন্ম নেয়—সভ্যতার চির অমর শিশুরা—সমুদ্রে, পাহাড়ে, সহরে, গ্রামে, প্রান্তরে প্রান্তরে। মানবতার অপূর্ব প্রাচুর্যে, জীবনের বিনিময়ে তাহারা সংগ্রাম করে, শান্তি ও সভ্যতাকে মৃত্যুর কবল হইতে ফিরাইয়া লইতে।

বর্ষার ভরা খাল। দুইদিকে পাটের ক্ষেত। যতদুর চোখ যায় শুধু পাট। বিশ্বজিৎ মনে মনে প্রমাদ গনে। এতখানি পথের মধ্যে ধান ক্ষেত দুই একটা। নির্বোধ চাষী। পাটের নেশা ছাড়িতে পারে না, বুঝাইলেও বোঝে না। ঘোর দুর্দিন চতুর্দিকে। থমথম করে আবহাওয়া।

পথে চলিতে চলিতে এক পরিচিত চাষীর সঙ্গে দেখা হয়। মাথায় ধানের বস্তা। আগে চলিতেছে—পথপ্রদর্শক, গ্রামেরই এক জোতদার।

"কি সোনামিঞা, ভাল আছ ত?" বিশ্বজিৎ কথা বলিতে চায় আজ তাহার চাষীভাইদের সঙ্গে।

একটু সঙ্কুচিত হইয়া উঠে চাষীটি। এই স্বদেশী বাবুরা নিষেধ করিতেছে ধান বিক্রি করিতে, দিনের পর দিন সভা করিয়া বুঝাইতেছে। কিন্তু কি করিবে সে? নগদমূল্য, আশাতীত মূল্য দিতেছে মহাজনেরা তবুও ত কয়টা দিন ভাল মন্দ একটু খাইয়া বাঁচিবে।

বিশ্বজিৎ লক্ষ্য করে তাহার এই থতমত খাওয়া ভাবটুকু। তাই সে আবার প্রশ্ন করে, "কোথায় চলেছো?"

"ইস্পাহানীর কুঠিতে বাবু। গায়ের ছোট বড় সকলেই বেচতাছে ধান, নাইলে খাইবে কি?"

"কিন্তু দুদিন পরেই যে সবাই মিলেই মরবে।" বিশ্বজিৎ উত্তর দেয়। অগ্রবর্তী পথপ্রদর্শক হাঁক দিয়া ডাকে, "ঐ ব্যাটা, তাড়াতাড়ি হাট্। সাহেব তোর লেইগা বইস্যা থাকবো?"

উচুনীচু রাস্তা ভাঙ্গিয়া জোতদারের পিছু পিছু হাটিয়া যায় চাষীটি।

বিশ্বজিৎ স্তব্ধ হইয়া তাকাইয়া থাকে। সাম্রাজ্যবাদের এ এক নূতন খেলা। চুম্বকের আকর্ষণের মত ছুটিয়া চলিতেছে চাষীরা নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে। ইহার অবশ্যম্ভাবি ফল ভাবিয়া শিহরিয়া উঠে বিশ্বজিৎ। তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে কঙ্কাল মূর্তি সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ, মহামারী। কাতারে কাতারে কঙ্কালসার শিশু, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ ছুটিয়া চলিয়াছে ধানের খোঁজে, ভাতের খোঁজে।

মন শক্ত করে সে। স্থির করিয়া ফেলে, আর দেরি নয়। এমন দিনে দূরে থাকিতে পারে না সে—তাহাতে মৃত জয়ার প্রতিই অসম্মান করা হয়।

শ্রাবণ মাস চলিয়া যায়, বৃষ্টির নাম নাই। আকাশে মেঘ দেখা দেয়, আবার বাতাসে উড়াইয়া লইয়া যায়। দুশ্চিন্তায় কাল হইয়া উঠে চাষীর মন।

বিকালে একটা সভা ডাকা হইয়াছে মসজিদ বাড়ীর মাঠে। বিশ্বজিৎ রওয়ানা হয় সাইকেলে। গৌতম কিছুতেই ছাড়িবে না তাহাকে। সে তাহার সার্টটা শক্ত করিয়া ধরিয়া আবদার ধরে, সেও যাইবে।

কেমন জানি কষ্ট হয় মা-হারা শিশুটির জন্য। ছেলেকে সাইকেলের সামনে বসাইয়া বিশ্বজিৎ খালের ধার দিয়া চলে।

ছোট্ট শিশুটির হালকা চুলগুলি বাতাসে উড়িতে থাকে। দীর্ঘ দিনের ভারাক্রান্ত মনে একটু সোনালী রোদের স্পর্শ লাগে। জয়ার সন্তান! একটা তেঁতুলগাছের তলায় সাইকেল হইতে নামিয়া বিশ্বজিৎ ছেলের কপালে মৃদু চুম্বন করে। মাথার উপরে খণ্ড মেঘে ঢাকা আকাশ।

অদূরে বিস্তৃত মাঠের বুকে অগণিত বিমূঢ় জনতা। হাট ফিরতা চাষীর ভিড়। শঙ্কাবিহ্বল দৃষ্টি—ধানের দাম কমিবে ত? ধান চাই, কম দামে, ন্যায্য দামে ধান চাই।

সব ধান বিক্রী করিয়া বসিয়া আছে তাহারা। স্বদেশী বাবুদের কথা তাহারা শোনে নাই, মহাজনদের প্রলোভনে ভুলিয়াছে।

বৃদ্ধ চাষী হাহাকার করে অনুশোচনায়। চোখেমুখে ভয়-বিহ্বল শঙ্কা।

ধানের দাম ১৪৲ টাকায় উঠিয়াছে!

দূরে সাত সমুদ্রের ওপারে রক্তাক্ত যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। পৃথিবী ভরা একটি মাত্র রব—যুদ্ধ—যুদ্ধ—যুদ্ধ।

আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হয়—যুদ্ধ—যুদ্ধ। মৃতসৈনিকের পচাস্তূপের গলিত গন্ধ চতুর্দিকে। বুভুক্ষু আত্মাগুলি কিলবিল করিয়া উঠিয়াছে যেন—মাটির তলার জমাট অন্ধকার হইতে।

অভিসম্পাৎ ভরা মুহূর্তগুলি।

শান্তিপ্রিয়, অভিজ্ঞচাষী ভীত হইয়া উঠে। সম্মুখের পথ অস্পষ্ট কুয়াসাচ্ছন্ন। আশঙ্কায় কুটিল ভ্রুকুটিভরা ভবিষ্যৎ।

ভয় কম্পিত বক্ষে উর্দ্ধে তাকায় জনতা—করুণ প্রার্থনা—ধান—ধান চাই।

অকল্যাণের ভয়ার্ত দীর্ঘশ্বাস।

বিশ্বজিৎ ছেলের হাত ধরিয়া ভিড় ঠেলিয়া সভার নিকটে যায়।

সকলের চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। আশার গুঞ্জন, "বিশ্ববাবু আইছেন, ওনারই ছাওয়াল না?"

চোখে চোখে খুশির আলো।

আলাবক্স, করিমদ্দি আগাইয়া আসে। "ভাল আছেন বাবু?

আমরা জানতাম—এ দুর্দিনে আপনি আমাদের ছাইড়া দূরে থাকতে পারবেন না।" সরল চাষীর সশ্রদ্ধ আন্তরিকতার ছোঁওয়া লাগে বিশ্বজিতের মনে। কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠে ভিজা মন।

বিশ্বজিৎ অভিভূত হইয়া ভাবে, 'কে বলে জয়া আমাকে নিঃস্ব করে রেখে গিয়েছে। তোমরাই ত আমার অজেয় শক্তি, দুর্দিনের অক্ষয় বান্ধব।'

সভা আরম্ভ হয়। সূর্যের শেষ রশ্মি আসিয়া পড়ে জনতার উপর।

বিশ্বজিৎ ধূমায়িত দিগন্ত ভেদ করিয়া তাকাইয়া দেখে সুদূর প্রসারী দৃষ্টিতে—। বহুদূরে মাটির মানুষের রুদ্র প্রচেষ্টায় প্রাণের বন্যা নামিয়া আসিতেছে শস্যভরা ধরণীতে। কল্যাণীর মূর্ত আশীর্বাদ !

জমায়েত চাষীভাইদেব দিকে তাকাইয়া মনে মনে বলিয়া উঠে, 'বাঁচবো, আবার আমরা বেঁচে উঠবো। বাংলার চাষী মরতে পারে না।' উদাত্ত কণ্ঠে সে বলিতে আবম্ভ করে, "ভাইসব···

২০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৫
যশোহর

শুদ্ধি পত্র

পৃঃ	৩১	ও	৩২ পং	জবেদারী	স্থলে	জাবেদালী	হইবে
”	৩৪	”	৭	কদাচিং নীযং	”	কদাচিন্নায়ং	”
”	”	”	৯	শাশ্বতোয়ং	”	শ্বাশ্বতোঽয়ং	“
”	”	”	১৫	অভুত্থানম্ ধর্ম্মস্থ	”	অভুত্থানমধর্ম্মস্থ	”
”	”	”	”	সৃজাম্যহং	”	সৃজাম্যহম্	”
”	”	”	”	দুস্কৃতাং	”	দুস্কৃতাম্	”
”	৭৫	”	৬	শারটাকস	”	স্পারটাকাস	”